সামনে লড়াই

তপোবিজয় ঘোষ

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৭

প্রকাশক
মজাহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দলপতি
শ্রীসারদা প্রেস
৪।এ বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

এই উপন্যাসের নায়ক তমাল
ও পার্শ্বচরিত্র সাহেবের উদ্দেশে

'সামনে লড়াই' রাজনৈতিক উপন্যাস। রচনাকাল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭০। ঐ বছরই শারদীয় 'নন্দন' পত্রিকায় ছাপা হয়। এখন কিছু নতুন ঘটনা ও চরিত্র যোগ হয়ে বই আকারে বের হ'ল।

উপন্যাসের কালসীমা মোটামুটি ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর এপ্রিল-মে। এই সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও আন্দোলন এতে স্থান লাভ করেছে, তারই প্রখর প্রত্যক্ষ উত্তাপে চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। রাজনীতি-ই এই উপন্যাসের কুললক্ষণ, শিল্পধর্ম ক্ষুন্ন হয়েছে কিনা সে-বিচারের ভার পাঠকের হাতে।

উপন্যাসটির তত্ত্ব ও তথ্য-বিষয়ে উপদেশ, পরামর্শ ও আলোচনার দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছেন শ্রদ্ধেয় সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার এবং অরুণকুমার রায়। প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছেন অরুণ মজুমদার।

উপন্যাসটি 'নন্দনে' ছাপা হওয়ার পর থেকে গণনাট্য সংঘের 'চন্দনপুকুর দিশারী শাখা' নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছেন। 'উত্তরযুগ' পত্রিকায় শতদ্রু চাকী 'রাজনৈতিক উপন্যাস ও তার সাম্প্রতিক নিদর্শন' নামে এর-উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন।

এঁদের সকলকেই সংগ্রামী অভিনন্দন।

সা
ম
নে
ল
ড়া
ই

[জয়শঙ্কর]

হ্যাঁ, তমালকে আমি খুন করেছি। আজই, ঠিক দশটা দশ মিনিটে। কিংবা পনেরোও হতে পারে। ওতে কিছু যায় আসে না।

আমার হাতে আমার বাবা মণিশঙ্কর চৌধুরীর রিভলবার ছিল। ছয় চেম্বারের, ফুল্লি লোডেড্। আমি পরপর তিনটে গুলি করেছি। মাত্র এক হাত দূর থেকে! একটা কপালের ঠিক মাঝখানে, দুটো বুকের বাঁ দিকে হৃদপিণ্ডে। ভাল করে কিছু বোঝার আগেই সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গেছে তমাল, কি রকম একটা শব্দ করেছে, ডান হাতটা বাতাস খামচে ধরতে চেয়েছে, তারপর সামান্য গড়িয়ে বাবলা গাছের ঝোপে ওর শরীরটা আটকে গেছে। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ওর বুক গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে।

ওর হাতে কিছু ছিল কিনা লক্ষ্য করিনি। ঝোলাটায় থাকতে পারে। ধারালো ছুরি-টুরি কিছু কিংবা পাওয়ারফুল বোমা-টোমা। ব্যবহারের সুযোগই পায়নি। যদি আগে থেকে একটুও গন্ধ পেত, খোলা ভোজালি নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। পালিয়ে যাওয়ার ছেলে ও না। নার্ভাস হওয়া ওর কুষ্ঠিতে লেখে নি। আই নো হিম ওয়েল। নেকড়ের মত ধূর্ত আর সাংঘাতিক। একটু অসাবধান হলে কিংবা প্রথম গুলিটা মিস্ করলে ওর হাতে আমিই খুন হতে পারতাম!

কিন্তু থ্যাংকস্ গড, তা হয় নি। আমি নিঃশব্দে, খুব নিপুণ হাতে ওকে শেষ করেছি।

হ্যাঁ, ওর বন্ধুরা খোঁজ পেয়ে গেছে। একটু আগেই ফুলতলির দিকে অনেক মানুষের চিৎকার শুনেছি। এখন মনে হয় হাস-পাতালের দিক থেকে চিৎকারটা ভেসে আসছে। একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়, ওরা কমরেড তমাল রায়ের নামে জিন্দাবাদ দিচ্ছে, হত্যাকারীর মুণ্ডু চাইছে, রক্তের ঋণ রক্ত দিয়ে শোধ করার কথা বলছে। এখানে ওখানে কিছু মশালও জ্বলছে, তার লাল দপদপে শিখা আমাদের তিনতলার ছাদে দাঁড়ালে দেখা যায়। একটু আগেই আমি দেখে এসেছি।

আমিই যে মার্ডারার—কোনো প্রমাণ নেই। সাক্ষী সাবুদ রেখে কাজ করতে আমরা অভ্যস্ত নই। তবু ওই তমালচন্দ্রের পার্টি আমাকেই সন্দেহ করবে। আমাদের বাড়ীটা টারগেট করবে। একটু পরেই হয়ত ওই অশোক, যে কিনা খুনটুনের ব্যাপারে তমালের চেয়েও বেশী ডেঞ্জারাস, দলবল নিয়ে ক্ষেপা কুত্তার মত এ বাড়ীটার দিকে ছুটে আসবে। ওর দাদাকে খতম করার বদলা নিতে চাইবে।

কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। আমরাও তৈরী হয়ে আছি। এ বাড়ীর ভিৎ খুব মজবুৎ, দরজা জানালা খুব শক্ত। চারদিকের উঁচু পাঁচিল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। তাছাড়া একতলায় বাগানের গা ঘেঁষে দেখুন, ভোলা ওর দেশী পাইপগানটা নিয়ে বসে আছে। তার সঙ্গে পালু, গণেশ, বংশী। গণেশ ওর ব্যাগে যে বোমা রেখেছে তার একটাতেই দশটা লিকপিকে কমরেডের বুক ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারে। বাগানের ওদিকটায় দেখুন, আরো পাঁচ ছয়জন ছেলে। আমাদের ছেলে ওরা। কলেজে পড়ে, কিংবা সবে পাশ করেছে। যারা পাশ করেছে আমাদের গ্লাস্ ফ্যাক্টরীতে কাজ পাবে। সেই আণ্ডার স্ট্যাণ্ডিং-এ আমাদের জন্য লড়াই করে,

আমাদের হয়ে সংগঠনের কাজ করে। যারা কলেজে পড়ে আমরা তাদের সমস্ত খরচ দিই। ওই একই শর্ত—আমাদের হয়ে কম্যুনিস্ট হামলা রুখতে হবে, গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে। থার্ড ইয়ারের সুদাম ওদের নেতা।

ঘণ্টাখানেক আগেই ওরা শুনেছে, তমাল খুন হয়েছে, আমাদের বাড়ী আক্রান্ত হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছুটে এসেছে। অবশ্য ওরা না এলেও কোনো ভয় ছিল না। এখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন। চারদিকে কড়া পুলিশী ব্যবস্থা। চট্ করে ল এণ্ড অর্ডার ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা নেই। আমি থানায় ফোন করে দিয়েছি। পুলিশ নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে আছে।

ওরা আসায় আমি অবশ্য খুশি হয়েছি। আমার নিরাপত্তাবোধ আরও বেড়েছে। বাগানের দিকের ঘরগুলো ওদের ছেড়ে দিয়েছি। ওরা তাসটাস খেলছে। ও-পাশটায় মুর্গী রান্না হচ্ছে। তার তেল মশলার ঝাঁঝালো গন্ধ বাতাসে উড়ে উড়ে এই তিনতলা অব্দি ছুটে আসছে। তাছাড়া ভোলা-গণশারা যেখানে যায় সঙ্গে দু'চার বোতল থাকেই। আজ আমি আরো কিছু টাকা দিয়েছি। রাতটা একটা উৎসবের মতো হয়ে উঠেছে।

এখন প্রায় দুটো।

আমার ঘুম আসছে না। নার্ভসের উপর খুব চাপ পড়ছে। হাত পা ঘেমে উঠছে। চোখ জ্বালা করছে। নিস্তব্ধ নৈশ শহরের বুক চিরে মাঝে মাঝে ওদের চিৎকার উঠছে। কেমন যেন একটা গুম গুম শব্দ। অনেকটা টানেলের ভিতর দিয়ে ঝড় ছুটে যাওয়ার মত। ওরা হত্যাকারীর মুণ্ডু চাইছে। তার মানে আমার মুণ্ডু চাইছে। মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই ধ্বনিটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এতক্ষণে বহুলোক জমেছে তাহলে। অজস্র মশালের আলোয় আকাশের দক্ষিণ কোণ যেন লাল হয়ে উঠছে। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি ওদিকটায় তাকাতে পারছি না।

হ্যাঁ, বাগানের ওরাও জেগে আছে।

একটু আগেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। পাইপগান-মাস্টার ভোলা একাই দেড়-দু' কে.জি. মাংস সাবড়াতে পারে। গণশাও কিছু কম যায় না। বোতলের ত মা বাপ নেই। ওদের সামাল দেওয়া মুস্কিল। অথচ ওদের না হলেও চলে না। সাংঘাতিক ধরণের বোমা বানাতে ওদের জুড়ি নেই। কোনো একটা এ্যাকশন এলে ওদের দিয়েই আমাকে বোমা বানিয়ে নিতে হয়। সে বোমা কখনো কখনো কোলকাতাতেও পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে ভোলা-গণশার নাম ডাক আছে।

বাগানের উত্তর দিকটায় ওই যে ফুলের টবগুলো দেখছেন, উপরে ঝুরঝুরে মাটি, যেন নতুন গাছ বসানোর জন্য রেডি করা আছে, আসলে এক একটা মিনি-মার্কা বোমা-ঘর। মাটি সরালেই মাল বেরিয়ে পড়বে। থাকবন্দী করে সব সাজানো আছে। দরকার মতো এখানে ওখানে সাপ্লাই হবে। কম্যুনিস্ট হামলা রুখবার জন্য ওগুলো এখন খুব জরুরী। বলা যেতে পারে, আত্মরক্ষার ফাস্ট এইড্ বক্স।

কিন্তু ওই যে বললাম, ভোলা-গণশাকে সামলে রাখা মুস্কিল। পেটে দু'চার বোতল মাল নামলে বড়ো বেশী তড়বড় সুরু করে। একবার দিন-দুপুরে মদ গিলে আমাদের বাস-সার্ভিসের একটা ইম্পরটেণ্ট কেসে সাক্ষী দিতে গিয়েছিল ভোলা। তমাল আর অশোক ছিল প্রধান আসামী। ছাত্রদের জন্য বাসে কনসেসন-টিকিট চালু করার দাবিতে ওরা ঘোঁট পাকিয়েছিল। কলেজ থেকে কিছু স্টুডেণ্ট ক্ষেপিয়ে এনে বাস চলাচল বন্ধ করার তালে ছিল। তাই নিয়ে গণ্ডগোল। আমরা মামলা সাজিয়েছিলাম—বাসে অগ্নি-সংযোগের চেষ্টা, ড্রাইভারকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জখম করা, কনডাকটরের ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া। পুলিশ-রিপোর্ট থেকে সাক্ষী-সাবুদ সবই তৈরী করেছিলাম। আর একটু হলে দেড় দুই বছরের কন্-

ভিক্‌সন্‌ হয়ে যেত তুই শালার। কিন্তু ওই ভোলাই দিলে সব মাটি করে।

কাঠগড়ায় তমালদের উকিল ওকে ঠেসে ধরতে শেখানো বুলিগুলো সব গেল ভুলে। উল্টো-পাল্টা বকতে শুরু করল। শেষকালটায় নেশার ঝোঁকে ব্যালান্স হারিয়ে কখনো গুম্‌ মেরে বুনো শুয়োরের মত ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলতে লাগল, কখনো রেগেমেগে চেঁচাতে সুরু করল। ব্যস, পাকা ঘুঁটি গেল কেঁচে। উপরন্তু আদালত অবমাননার দায়ে পঁচিশ টাকা ফাইন।

সেই থেকে মণিশঙ্কর চৌধুরী দেখতে পারেন না ওদের। আমিও খুব প্লীজড্‌ নই। কিন্তু আমি এবং আমার বাবা দু'জনেই জানি—ওদের আমরা ছাড়তে পারি না। ওরা অনেকদিন থেকে আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এখন ওরা আমাদের রক্ষা করে এবং আমরা ওদের।

আমি মাঝে মাঝে নীচে নেমে দেখে আসছি।

এরি মধ্যে ছোটোখাটো একটা কেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে ফেলছে গণশা। বাগানের ঝাঁকড়া জামরুল গাছটার তলায় মালীর কোয়ার্টার। মালীর বউটা কমবয়সী, মোটামুটি সুশ্রী। যেখানটায় মুর্গীর মাংস রান্না হচ্ছিল, মালী আর ওর বউটা সেখানে খাটা-খাটুনি করছিল। বউটা জল তুলে দিয়েছে. মশলা বেঁটে দিয়েছে, শালপাতাগুলো ধুয়ে ঠিক করে দিয়েছে। সেই তখন থেকে গণশা ওর পিছনে ঘুরঘুর করছিল। তারপর একটু রাতের দিকে বউটা কলতলায় হাঁড়ি কড়াই মাজতে গেলে গণশা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে ইশারা করে বসে আছে।

বউটা চুপ করে থাকেনি। রেগেমেগে গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়েছে। মালীটা লাঠি হাতে গণশাকে তেড়ে গেছে। পালু আর বংশী মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিচুয়েশনটা সামলে দিয়েছে। সুদাম খুব রেগে গেছে গণেশের উপর। নীচে নেমে আমিও ধমকে এসেছি। চৌধুরীবাড়ীর প্রেষ্টিজের প্রশ্ন। এ ব্যাপারে কড়া না

হয়ে উপায় নেই। তাছাড়া মালীটা আমার পিছন ধরে দরজা বরাবর চলে এসেছিল। আমি কিরকম স্টেপ্ নিচ্ছি—নিজের চোখে দেখার ইচ্ছে। কাজে কাজেই খুব গম্ভীর আর রাগরাগ মুখ করে আমাকে বিচারকের ভূমিকা নিতে হ'ল! আমি ঘরে ঢুকে চোখ মুখ লাল করে চেঁচিয়ে বললাম, 'এই রাস্কেল, কি করেছিস তুই!'

গণশা সামান্য ভয় পেয়ে একবার আমার আরেকবার মালীর মুখ দেখল। তারপর হাত তুলে ঘাড় চুলকে মাড়ি বের করে লাজুক হাসল, 'মাইরি, তুমি বিশ্বাস কর জয়দা, আমি শালা পেচ্ছাপ করতে গেছলাম—'

মালীটা তেড়ে এল, 'না বাবু, হারামির বাচ্চা ঝুট বলছে।'

বংশী তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর হাত ধরে টানল, 'আঃ, তুমি আবার এখানে কেন। তুমি যাও দিকি—'

আমি বললাম, 'গণশা, আফটার অল্ তুই একটা ভদ্দরলোকের ছেলে। তোর এই কাণ্ড!'

গণশা তবু বলল, 'মাইরি, তুমি বিশ্বাস কর জয়দা—'

আমি এবার ঘর ফাটিয়ে ধমকে উঠলাম, 'রাস্কেল, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। কালই তুই মালীর বউয়ের কাছে ক্ষমা চাইবি।'

ও-পাশ থেকে ভোলা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, পা ধরে!'

বলে হ্যা হ্যা করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল।

গণশাকে ফাঁদে পড়তে দেখে ও খুব খুশী হয়েছে। ওর মুখ-চোখের জুলজুলে ভঙ্গি আর হাসির শব্দ থেকে সেটা অনুমান করা চলে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বেঁটেখাটো শরীরটা নাচিয়ে দিব্যি খোশ-মেজাজে হেসে যাচ্ছে ও।

দেখেশুনে গণশাও মুহূর্তে তেতে উঠল। শূন্যে থাবা ছড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'এই ভো-লা! হাসছিস কেন তুই? তোর হাসির কি হ'ল? এক চড়ে দাঁত-কপাটি লাগিয়ে দেব।'

ভোলা কিছু বলল না। ভুরু কুঁচকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আরো জোরে হেসে উঠল।

গণেশকে বেকায়দায় পড়তে দেখলে ভোলা আজকাল খুব মজা পায়। গণশাও তেমনি। কেননা বছর দুই ধরে ওদের মধ্যে বেশ সিরিয়াস ধরণের একটা ঝগড়া চলছে। মাঝে মাঝে সেটা হাতাহাতির রূপ নেয়। আমাকেই তখন মধ্যস্থ হতে হয়।

না, মেয়েমানুষ না, একটা ট্রাক নিয়ে ব্যাপারটা!

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে বাগমারি জলা জায়গার কাছাকাছি ওয়াগন ব্রেকারদের জমজমাট আড্ডা। কোন মালগাড়ীর বাবারও সাধ্যি নেই এক আধটু চোট না খেয়ে ওই স্থানটুকু পার হয়। অবশ্যি ড্রাইভার গার্ড আর পুলিশের সঙ্গে পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা আছে! মাল পাচারের কাজ খুব মসৃণ আর নিখুঁতভাবে চলে। এ ব্যাপারে ভোলার সাংগঠনিক ক্ষমতার আমি খুব প্রশংসা করি। ওই-ই হ'ল দলের রিংমাস্টার। গণেশ ছিল ওর ডান হাত। বছর কয়েক আগে একটা পুরনো ট্রাক একরকম লোহা-লক্কড়ের দরে ওদের পাইয়ে দিয়েছিলেন বাবা। সরকারী ট্রাক। মণিশঙ্কর চৌধুরীর তখন অনেক কিছু করার ক্ষমতা ছিল। এক কলমের খোঁচায় সরকারের কোন এক ডিপার্টমেণ্ট থেকে ট্রাকটা ভোলাদের হাতে এসে গিয়েছিল।

সেটা সারিয়ে-সুরিয়ে নিতে হাজার দেড়েক টাকা খরচ হয়েছে। ভোলা কিছু বেশী দিয়েছিল, গণশা শ' পাঁচেকের মতো। তাতে ওয়াগন-ভাঙ্গা মাল পাচার হত। পয়সার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল দেখা দিতে গণশা লাইন পাল্টে চালের বিজনেসে ঢুকল। প্রথম যুক্তফ্রণ্টের কল্যানে কোলকাতায় তখন চালের জন্য হাহাকার। কিলো ছুঁয়েছে পাঁচে। গণশা আরো কয়েকজনকে নিয়ে চাল পাচারে লেগে গেল। সেই তখন থেকে ট্রাকটার মালিকানা নিয়ে গণ্ডগোল।

ভোলা সেয়ানা পার্টি। বলে, 'ট্রাকে আমি বেশী পয়সা ঢেলেছি। ওটা আমার।'

গণশা বলে, 'পয়সার যা কমতি ছিল, গতরে খেটে উশুল দিয়েছি। এখন তোর কাছেই আমার পাওনা দাঁড়িয়েছে বারোশ। তার বদলে ট্রাকটা দিয়ে দে।'

ভোলা ভেংচে ওঠে, 'এ্যাঁ, দিতে হবে! মামদোবাজি! একটা টায়ার কেনার মুরোদ নেই তোর—'

'সে আমি বুঝব। তুই গাড়ী কোথায় রেখেছিস বল।'

'বলব না। গরুর গাড়ী কিনে ব্যবসা করগে।'

'তুই গাধার পিঠে মাল চালান দে। আমি বিকেলেই ট্রাক উঠিয়ে নেব।'

'আসিস। মেয়ে না মদ্দ বুঝে দেখব!'

গণশা আমাকে এসে ধরল। আমি ভোলাকে ডেকে পাঠালাম। সে গণ্ডগোল বুঝে ট্রাকটা কোথাও সরিয়ে ফেলেছে। আমাকে বলল, 'এ্যাকসিডেন্ট হয়ে কারখানায় পড়ে আছে, জয়দা। সারাই হয়ে আসুক, তখন যা হয় ব্যবস্থা করবে।'

গণেশ বলল, 'গুল্ মারছে শালা। ট্রাক কোলকাতায় আছে।'

ভোলা বলল, 'কোলকাতা কি ওর শ্বশুরবাড়ী যে হাওয়া খেতে গেছে?'

আমার সামনেই গণেশ ভোলার দিকে তেড়ে গেল, 'বাজে বুকনি রাখ। শীগ্‌গির বল ট্রাক কোথায় আছে?'

আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, 'উঁহুঁ, বোকার মতো নিজেদের ইউনিটি ভাঙ্গিস না। এখন সময় খারাপ যাচ্ছে। সামলে সুমলে চল।'

ভোলাকে বললাম, 'গাড়ীটা আগে এখানে নিয়ে আয়। তারপর ফয়সালা হবে।'

ঘাড় কাৎ করে ভোলা সায় দিল।

কিন্তু ট্রাকটার আর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। গণেশ সন্দেহ করল, ভোলা ওটা বিক্রি করে টাকা-পয়সা ট্যাঁকে ভরেছে। এই নিয়ে চরম শত্রুতা। তার ফলে মারামারির উপক্রম। গণশা ফোঁস করে ছুরি বের করে। ভোলা বারুদ-ঠাসা পাইপগানটা তুলে গণশার মাথা তাক করে। পাড়ার মেয়েমদ্দ হাউ মাউ করে চেঁচাতে থাকে। কেউ ছুটে এসে আমাকে খবর দেয়। ওদের ঠাণ্ডা করতে আমাকে ছুটে যেতে হয়। ইদানীং এইরকমই চলছে।

তা ওরা নিজেরা যা করছে করুক, আমার খুব একটা দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু আমার বাড়ীতে এসে ওসব মেয়েছেলে নিয়ে ঝামেলা কেন। চৌধুরী বংশের একটা সুনাম আছে, আভিজাত্য আছে। আমার বাবাকে এক ডাকে এই অঞ্চলের সবাই চেনে, রেসপেক্ট করে। ওই কম্যুনিষ্ট গুণ্ডাগুলো যা-ই রটাক না কেন, এ কথা কেউ বলতে পারবে না, মণিশঙ্কর চৌধুরীর মেয়েদের ব্যাপারে কোনো দুর্বলতা আছে বা মেয়েদের সম্মান দিতে জানে না। এ বিষয়ে আমার বাবা প্রায় জিতেন্দ্রিয় মানুষ। সেই কবে আমার মা মারা গেছেন, প্রায় এক যুগ হতে চলল। তারপর থেকে মণিশঙ্কর বাড়ীতে বা পার্টিতে 'ড্রিঙ্ক' একটু বেশী করছেন ঠিকই, কিন্তু কোনো মেয়ে-টেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বলে আমি অন্তত রিপোর্ট পাই নি।

অথচ আমি শুনেছি, আমার ঠাকুর্দা ত্রিদিবশঙ্কর চৌধুরী ঠাকুমা বেঁচে থাকতেই কোলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে চারজন মেয়েমানুষ পুষেছিলেন! তার মধ্যে আবার একটা নাকি ছিল ট্যাঁশ ফিরিঙ্গী! নাচ গান জানত, কি একটা সিনেমাতেও 'সাইড রোলে' অভিনয় করেছিল! অনেকদিন তার ছবি ছিল আমাদের ঘরে। ঠাকুর্দা মারা গেলে বাবা ওটা সরিয়ে ফেলেন।

ঠাকুর্দা অবশ্য কখনো রাজনীতি করেন নি। জমিদারি নিয়েই থাকতেন। রাজনীতিটা বাবার আমল থেকে সুরু।

দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে মণিশঙ্কর বুঝেছেন, রাজনীতিতে সাফল্য লাভ করতে হলে দু'একটা নিয়ম খুব কড়াকড়ি ভাবে মানতে হয়। তার মধ্যে প্রধান যেটা, তা হ'ল, বাইরের মেয়েমানুষ নিয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা বা ঘোরাঘুরি না করা। কেননা এই সতী সাবিত্রীর দেশে মেয়েদের ব্যাপারটা দারুণ রকমের সেন্টিমেন্টাল! চট করে লোকের চোখে লাগে, মনে খোঁচা দেয়! তাই নিয়ে নির্বাচনের সময় শত্রুরা ঘোঁট পাকায়, তিল তাল হয়ে ওঠে। যারা ঝানু পলিটিশিয়ান, তারা কখনো মেয়েমানুষ নিয়ে দহরম মহরম করে না। অন্ততঃ নিজের নির্বাচনী এলাকা বা তার চতুষ্পার্শ্বে তো কখনোই না। আর তার দরকারই বা কি। তোমার পার্সের জোর থাকলে তুমি দিল্লী যেতে পার, বোম্বে যেতে পার। প্যারিস বা ওয়াশিংটনেও চলে যেতে পার। সে সব দেশে আজকাল লাইন বেঁধে ন্যুড্ কলোনী গজিয়ে উঠেছে। মেয়েরা টপলেস হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিনেমার পর্দায় ভিভিড্লি ইন্টার কোর্সের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে! যত খুশি দেখ, আর প্রাণভরে ফূর্তি কর। তোমাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য সেখানে কেউ ওৎ পেতে বসে নেই।

কিন্তু নিজের বাড়ী বা এলাকায় ও-ব্যাপারে একদম মুনি ঋষি হবে। মেয়েদের সম্পর্কে এমন ভাবে কথাবার্তা বলবে বা আচরণ করবে এজ ইফ্ তারা সব সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ!

এ বিষয়ে প্রায়ই বিভূতির বাবার এক্সাম্পল দেন মণিশঙ্কর।

লোকটার এত নামডাক, প্রভাব প্রতিপত্তি, ফি বছর পঁচিশ-পঞ্চাশ হাজার ভোটে জিতে এম. পি. হওয়া—সবই এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। তারপর কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলেও অবস্থার আর পরিবর্তন ঘটল না। কেন? না, দেশভাগের পর রিফ্যুজি মেয়ে জুটিয়ে বেনামীতে একটা ম্যাসাজ ক্লিনিক চালু করেছিলেন উনি। পয়সার জন্য ততটা না, আসলে ওর মাধ্যমে দিল্লীর বড়ো বড়ো

কর্তাদের একটু নার্স করে প্রভাব প্রতিপত্তির পরিধিটা আরো বাড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ব্যবসা জমে উঠেছিল ভালই। দিল্লীতে বিভূতির বাবার খাতিরও বাড়ছিল। কিন্তু খবরটা গোপন থাকল না।

বছর দুই না ঘুরতেই কয়েকটা নষ্ট-চরিত্রের মেয়ে ক্লিনিক থেকে শ্লিপ করে বেরিয়ে গিয়ে স্টেটমেণ্ট দিল। কম্যুনিস্টদের কাগজটা তা ছাপিয়ে খুব হৈ চৈ করল। পার্লামেণ্টে ওদের লোক কোশ্চেন করল, তদন্ত চাইল। বিধান-সভায় এ-পক্ষে ও-পক্ষে প্রায় হাতাহাতি হয়ে গেল। তারপর তদন্ত-টদন্তের ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ল বটে কিন্তু বিভূতির বাবার পলিটিক্যাল ক্যারিয়র একেবারে খতম হয়ে গেল। নেকস্ট ইলেকশনে প্রায় ষাট হাজার ভোটে হেরে বসে থাকলেন। পার্লামেণ্ট ছেড়ে বিধানসভার দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু ভাঙ্গা কোমর নিয়ে তাতেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না।

'দি পুওর ফেলো!' মণিশঙ্কর চুরুটে কামড় দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন, 'আমি আগেই ওঁকে বলেছিলাম!' তারপর অভ্যাস মত একটু ঝুঁকে ঠোঁটের একপাশ সামান্য বেঁকিয়ে আমাকে পরামর্শ দেন, 'মেয়েদের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে, জয়। প্রয়োজন মত ওদের ব্যবহার করবে কিন্তু ওরা যেন তোমাকে কখনো ব্যবহারের সুযোগ না পায়। তাহলে তোমার অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলবে!'

এসব কথা মনে রেখে আমি মালীর উপস্থিতিতে গণেশকে আরো এক দফা বকলাম। তারপর 'সকালে ব্যবস্থা হবে' এইরকম আশ্বাস দিয়ে মালীটাকে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিলাম।

গণেশ পিট পিট করে ওর যাওয়া দেখল। তারপর খুব অপ্রসন্ন মুখে একটা বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে মালীর বউটার সতীত্ব বিষয়ে অনেক কথা বলল। বোতল থেকে ঢকঢকিয়ে খানিকটা গলায় ঢেলে একটু পরেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোলার চোখে মুখে নিঃশব্দ হাসিটা তখনো নাচছিল। মনে হ'ল ওরও নেশা ধরে গেছে। ও গণেশের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'আহা, দোস্ত্, রজনীটা উপোসে গেল!'

গণেশ তৎক্ষণাৎ পা ছুঁড়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'তোর বউকে নিয়ে আয় শালা।'

ভোলা গুম্ হয়ে বলল, 'সামলাতে পারবি? মুরোদ আছে?'

'আছে কি নেই—এনে দেখ।'

লালচে চোখ মেলে ভোলা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, 'বোঝা আছে! ওই শুঁটকি মেয়েটা এক চড়ে তো তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল!'

শুনে গণেশ হঠাৎ টানটান হয়ে বসল। একটু লম্বাটে রোগা গোছের শরীর ওর। মুখটা তেকোণা। কানের ছু'পাশে লম্বা জুলপি। চোখছুটো এখন জবাফুলের মতো টকটকে। ভোলার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'কোন্ মেয়েটা?'

ভোলা দাঁত বের করে হাসল, 'তমাল মরে যে বেধবা হ'ল!'

'কে বেধবা হ'ল?'

'ওই যে রেফুজি পাড়ার শিখারাণী; ভুলে মেরে দিয়েছিস শালা!'

গণেশের মুখ কালো হয়ে গেল। যেন সেকেণ্ডটাইম চড় খেল হতভাগা। কয়েক সেকেণ্ড চকচকে চোখে তাকিয়ে থাকল। ওর চোয়াল শক্ত হ'ল। বুকের খাঁচা শ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করতে লাগল। হাতের আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মতো বেঁকে গেল।

এখুনি ভোলা বনাম গণশার একটা ফ্রি স্টাইল কুস্তি সুরু হয়ে যায় আশঙ্কায় আমি উপরে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠলাম, 'এই ভোলা কি হচ্ছে, এই গ-ণ-শা—'

গণেশ ফোঁস ফোঁস করে উঠল, 'তুমি দেখলে জয়দা, শালা কলজেটায় কেমন হাতুড়ি ঠুকে দিল।'

ভোলা বলল, 'আহা, দোস্ত্! এসো একটু মলম দিয়ে দিই।'

আমি খুব গম্ভীর ভারি গলায় বললাম, 'আজ ঠাট্টা ইয়ার্কির দিন না। ওই শোন, সারা শহর ওরা তোলপাড় করছে। কানে ঢুকছে কিছু? বি সিরিয়াস।'

গণশা একটু চুপ করে কান পাতল। ওর নেশাচ্ছন্ন মগজে বাইরের গোলমালটা তেমন ধাক্কা দিচ্ছে বলে মনে হ'ল না। ঘাড় নেড়ে বলল, 'কিচ্ছু ভাবনা নেই জয়দা, তুমি ঘুমুতে যাও, আসুক না কোন্ শালা আসবে। আমরা রেডি—'

'হ্যাঁ।' ভোলা ওর পাইপগানটা হাতের কাছে টেনে আনল, 'বড় বাঘটা গেছে, এবার খুচরোগুলোকে পটাপট সাবাড় করব। আসুক না একবার।'

'না, অত সোজা না।' ওদের নেশা কাটিয়ে সজাগ রাখার জন্য আমি ইচ্ছে করেই ভয় দেখাতে সুরু করলাম, 'তমালের ভাই অশোক আছে। ওটা আরো ডেঞ্জারাস।'

'হ্যাঁ, একটা খেঁকশেয়াল!'

'অনেক লোক ওদের দলে। হাজার হাজার।'

'সব নেড়িকুত্তা! একটা বোম ফাটালেই চোঁ চাঁ যা দৌড়ায় মাইরি!' গণেশ হেসে উঠল খিক খিক করে। ভোলাও হাসল।

গণেশ আবার টান হয়ে শুয়ে পড়ল। পালু, বংশী শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। সেদিকে একপলক তাকিয়ে ভোলার হাঁটুতে পা দিয়ে একটা খোঁচা মেরে গণেশ বলল, 'সেই চড়টা, বুঝলি শালা, আমি ভুলি নি।'

'কি করে ভুলবি!' হাঁটু দিয়ে গুঁতিয়ে গণশার পা সরিয়ে দিল ভোলা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে আলগা হয়ে বসল, 'একে মেয়েমানুষের চড়, তায় পাঁচ আঙুল বসে গিয়েছিল। ভোলা কি সহজ রে শালা।'

গণেশ বলল, 'নেশাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল তাই—'

'নইলে ছুঁড়িটাকে সেই রাতেই বুঝি বে করতিস?'

'লাইনের ধারে উঠিয়ে নিয়ে যেতাম।'

'হুঁ। মরদ কত!' ভোলা ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। ঘরময় ধোঁয়া ছড়িয়ে আঙুল তুলে বলল, 'আসলে তুই, বুঝলি গণশা, তুই একটা মাদী বেড়াল—'

'এই-ই ভোলা!' শোয়া থেকে আবার চট করে উঠে বসল গণশা, 'মুখ সামলে কথা বলবি।'

ভোলা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে ঘাড় কাৎ করল, 'বলব!'

'সেই চড়ের শোধ আমি একদিন নেব!'

'নিবি?' ভোলা আধশোয়া হ'ল, 'নিস!'

ভোলার এরকম ঠাণ্ডা উত্তরে গণেশ আরো তেতে গেল। আবার একটা পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তুই আমার ট্রাকটা ফেরৎ দে, ভোলা।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই ট্রাকের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় ভোলাও বিরক্ত হয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'ট্রাক তোর বাবার?'

'তোর বাবার?'

'আলবৎ! একশ বার! এই জয়দা—'

আমি হঠাৎ খুব রেগে জুতো সমেত পা দিয়ে গণেশের পাছায় একটা খোঁচা মেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কি করতে এসেছিস তোরা? দিল্লাগী করতে? জানোয়ার সব! ওরা দল বেঁধে বর্শা হাতে আমার মুণ্ডু নেবার জন্য ছুটে আসছে—আর তোরা ট্রাকের কথা ভাবছিস!'

'ছুটে আসছে! কারা ছুটে আসছে। কই?'

যেন একটু ভয় পেয়ে সজাগ আর সতর্ক হয়ে ছটফট করে উঠল ওরা। গণেশ পালু বংশীর গায়ে ধাক্কা দিল, 'এই, এই, ওঠ্ শীগগির—'

ভোলা একবার আমার মুখ দেখে পাইপগানটা বগলে নিয়ে বাগানের দিকে ছুটে গেল। ও-ঘরে সুদামরা তাদের আসর বসিয়েছিল। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'কে যায় বাগানে? কি হ'ল রে গণশা!'

কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে পালু আর বংশী পিট পিট করে তাকাল।

একটু পরেই ফিরে এল ভোলা, 'ধুৎ, যত্ত সব। কেউ কোত্থাও নেই। শুধু একটা পুলিশের গাড়ী—'

'এসে গেছে? যাক্ বাবা!'

বিড় বিড় করে পালু আর বংশী আবার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

'ভোলা!' আমি কড়া গলায় বললাম, 'তুই আর গণেশ সারারাত জেগে থাকবি।'

'আচ্ছা।'

'আমি একবার উপরে যাচ্ছি।'

'যাও।'

ওদের নেশা ছুটিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমি দরজার দিকে পা রাখলাম। এমন সময় সুদাম এসে ঢুকল ঘরে।

'কি হয়েছে জয়দা?'

'কিছু না, একটা পুলিশের গাড়ী এল।'

'তুমি ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

সুদাম এবার পালু বংশীদের দিকে তাকাল। ততক্ষণে দুজনেই আবার ঘুমিয়ে গেছে। সুদাম ভুরু কুঁচকে বলল, 'সব শালা মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে আছে। কেন যে আসে।'

ভোলা বেশ স্পষ্ট গলায় প্রতিবাদ করল, 'কে বললে বেহুঁস হয়েছি? আমরা চিরকাল মদ খাই, মদ আমাদের কোনোদিন খায় না। জয়দা জানে।'

'তাই নাকি!' ঠোঁট বাঁকা করে অল্প হাসল সুদাম। ওর ফর্সা গোলগাল মুখে কয়েকটা দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। জামার হাতা গুটিয়ে নিতে নিতে বলল, 'বাইরে বড়ো বেশী চিৎকার হচ্ছে, জয়দা!'

'হ্যাঁ, ওরা শ্লোগান ঝাড়ছে। ডেড্‌বডির খোঁজ পেয়ে গেছে মনে হয়।'

'একবার চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুরে আসব?'

'না, না! ধরতে পারলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শেষ করে দেবে। ওরা কিছু কম খুনী না।'

'ঠিক আছে। আমরা কেউ ঘুমুচ্ছি না আজ।'

'হ্যাঁ, সবাই একটু এলার্ট থাকবে। আমি উপরে যাচ্ছি।'

'যাও।'

আমি চলে আসছিলাম। কি মনে করে সুদাম আবার ডাকল, 'জয়দা—'

'কি?'

'একটা কথা—'

'বল।'

'আমরা এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না তমালকে কে খুন করল?'

'যে-ই করুক, ওরা আমাদের সন্দেহ করবে।'

'তা হলে বলছ আমাদের কেউ করে নি?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'কিন্তু জয়দা!' সুদামকে খুব ভাবিত মনে হল, 'আমাদের কেউ যদি এ কাজ না করে থাকে তাহলে কারা করতে পারে? ওই পাল্টা লালঝাণ্ডাওলারা?'

'অসম্ভব না। তমালদের উপর ওদের রাগ আছে।'

'কিন্তু জয়দা, এ অঞ্চলে ওদের অর্গানাইজেসন বলতে কিছু নেই। ওরা কি তমালকে মার্ডার করার সাহস পাবে? আমাদের সাহায্য ছাড়া?'

'বাইরে থেকে লোক আনতে পারে।'

'তা পারে। কিংবা ওয়াগন-ব্রেকারের একটা দলকেও কাজে লাগাতে পারে। ক'দিন মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে খুব জুলুম করছিল ওরা।'

ভোলা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, জয়দা, ওই তমালরাই সব নামের লিস্ট পাঠাত। আমার পিছনেও পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল।'

গণেশ বলল, 'আমার পিছনেও। একমাস গা ঢাকা দিয়েছিলাম। চাল পাচার বন্ধ। শালা ফূর্তি করার পয়সা উঠত না।'

ভোলা আচমকা বলে উঠল, 'এই গণশাই তমলাকে খুন করেছে। ওই মেয়েটার জন্য।'

গণেশ ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করল, 'না, আমি কেন! তমালকে খুন করার কথা তো তোরই ছিল।'

'আমার? না, আমি ওসব ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না।'

'চুপ্ মার শালা! তমালদের ভয়ে তুই পেচ্ছাপ করিস, জানি না আমি!'

'তোর মুখে করি। তুই-ই খুন করেছিস।'

'তুই জানিস?'

'সব জানি! সেদিন বংশীকে তুই বলছিলি—'

'কি বলছিলাম?'

'অশোক আর তমালের জন্য তোর ব্যবসা বন্ধ। পকেট গড়ের মাঠ। তোর পীরিতের মেয়েমানুষ পয়সার জন্য খিচ খিচ করছে। বাগে পেলে দুই শালারই তলপেট ফাঁসিয়ে দিবি তুই—'

'বেশ বাবা, করেছি বেশ করেছি!' উত্তেজিত হয়ে আবার উঠে বসল গণেশ। শব্দ করে বুকে একটা থাবা মেরে বলল, 'আমার হিম্মৎ আছে তাই বাঘ শিকার করেছি। তোর মত নেংটি ইঁদুর নাকি আমি, খুন খারাপিতে ভয় পাই?'

'আমি পাই? এই শা-লা!'

'পাস না? পাইপগান নিয়ে ঘুরে বেড়াস, কোনোদিন একটা বেড়াল মেরেছিস তুই? সব জানি—'

'জানিস? এই দেখ, এখুনি তোর বুক ঝাঁঝরা করতে পারি!'

ভোলা খুব রেগে গিয়ে পাইপগানটা সত্যি সত্যি উঁচু করে

তুলে ধরল। গণেশ কিছু না বলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঠোঁট ওল্টাল। ওদের ঝগড়া দেখে সুদাম হেসে ফেলল। আমি আবার ধমকে উঠে বললাম, 'এই গণশা, চুপ করবি কি না? নইলে দুটোকেই বড়ো-রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসব। ওরা লাঠি বল্লম নিয়ে তৈরী আছে।'

'কারা?'

'শুনতে পাচ্ছিস না কারা চেঁচাচ্ছে? হাতের নাগালে পেলে মুণ্ডু ছেঁচে দেবে।'

'ধুৎ!'

গণেশ এদিক ওদিক তাকিয়ে বোতল খুঁজল। কিন্তু আর কিছু অবশিষ্ট নেই দেখে রাগ করে কোণার দিকে বোতলটা ঠেলে দিয়ে আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'আমার বুকের পাটা আছে তাই তমালকে সাবড়ে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে সব ক'টাকেই সাবাড় করতে পারি। এক হপ্তার মধ্যে ট্রাক ফেরৎ না দিলে তোকেও শালা নিকেশ করব!'

আমি হঠাৎ কি ভেবে বললাম, 'শুনলে তো সুদাম, গণেশ বলছে ওই-ই তমালকে খুন করেছে।'

ভোলার দিকে কটমটে চোখে তাকিয়ে গণেশ আবার বলল, 'আলবৎ করেছি।'

আমি খুব সিরিয়াস হয়ে নীচু গলায় বললাম, 'চুপ কর গণেশ, এসব কথা ওভাবে বলতে নেই। নেশা করলে তোর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

গণেশ তবু বলল, 'নিজেদের মধ্যে বলব, ভয় কি? এটা কি থানা না আদালত, এ্যা? তুমি ওই ভোলাকে বলে দাও জয়দা, ওকেও আমি খুন করব।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। এখন চুপ কর। চল সুদাম—'

আমি সুদামকে নিয়ে বাইরে এলাম।

সামনে আমাদের ফুলের বাগান। দেয়াল ঘেঁষে পাম আর ইউকালিপটাসের গাছ। অন্ধকারে গাছের পাতায় সর সর শব্দ উঠছে। ঝাউয়ের ফাঁকে জোনাকী জ্বলছে নিভছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা একটানা ডেকে চলেছে।

বারান্দা ধরে একটু এগিয়ে যেতে মনে হ'ল, মালীর ঘরে কেউ কাঁদছে।

কে কাঁদছে? আমি অবাক হয়ে সুদামের দিকে তাকালাম। সুদামও কান পেতে কান্নাটা শুনল। তারপর হিসেব করে বলল, 'মালার বউটা। নিশ্চয়ই মালীটা খুব ঠেঙিয়েছে ওকে।'

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সুদাম বলল, 'হয়ত বউটাকে সন্দেহ করছে ও।....তা আপনি যাই বলুন জয়দা, ওই বউটাও কিছু সতী সাবিত্রী না। মসলা বাঁটতে বাঁটতে গণশার দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে এমন হাসছিল যে তাইতেই গণেশটা তেতে উঠল! আমি মার্ক করেছি।'

'ও সব কথা যাক।'

আমি লাইটার জ্বালিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার হাত অল্প অল্প কাঁপছিল। এখন মে'র মাঝামাঝি। গরম পড়ে গেছে। কিন্তু আমার হাত পা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল।

দূরের এলোমেলো চিৎকারগুলো এখন কেমন ঘন হয়ে উঠছে। যেন অনেকগুলো ঘূর্ণিঝড় নানা জায়গা থেকে ছুটে এসে একটা বৃত্তের মধ্যে জমাট বাঁধছে। সমস্ত শহর এতক্ষণে জেগে উঠেছে। সবাই হয়ত ছুটোছুটি শুরু করেছে।

আমি আকাশের একটা জ্বলজ্বলে তারার দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে অথচ শব্দগুলোর উপর বেশ জোর দিয়ে বললাম, 'সাবধান, সুদাম। গণেশ যা বলেছে তার একটা কথাও যেন কেউ জানতে না পারে। এখন সময় খুব খারাপ, আমরা একটা সরু তারের উপর দিয়ে হাঁটছি।'

'আচ্ছা।'

'বাইরের উত্তেজনা একটু কমে এলে আমিই তোমাকে সব খুলে বলতাম। এখন গণেশের মুখ থেকেই শুনলে!'

'কিন্তু জয়দা, ওকি সত্যি বলেছে?'

'ও, সিউর! হাণ্ড্রেড্‌ পার্সেণ্ট সত্যি! তবে নেশার ঝোঁকে বলা তো—'

'এভাবে সব ফাঁস করলে—'

'না। গণেশ অত কাঁচা না। এখানে নিজেদের মধ্যে বলে ফেলেছে। কিন্তু বাইরে ও কিছুতেই মুখ খুলবে না।'

'আপনি ওকে ওয়ার্ণিং দেবেন!'

'নিশ্চয়ই।'

আমি বারান্দার আলোতে খুব তীক্ষ্ণচোখে সুদামের মুখ দেখলাম। মনে হ'ল, এতক্ষণে গণেশকে খুনী বলে ওর বিশ্বাস জন্মেছে। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি ফেলে ও গণেশের শরীর দেখার চেষ্টা করছে। ওর চোখে কেমন যেন একটা আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠেছে।

আসলে সুদামের বয়সটা এখনো তেমন বেশী না। রাজনীতির জ্ঞানও কাঁচা। আমরা যেমন বোঝাই তেমন বোঝে। কি? সুযোগ সুবিধা পায় তাই আমাদের হয়ে কাজ করে। কিন্তু প্রসাদ তিলক বা বিভূতি কাশীনাথের মতো ওর কোন সাংগঠনিক ক্ষমতাই নেই। একটু ভাল বক্তৃতা পর্যন্ত ওর আসে না। অথচ উপযুক্ত কর্মীর অভাবে ওর হাতেই এখন কলেজটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। ফলে স্টুডেণ্ট ফ্রণ্টে আমাদের চরম দুরবস্থা। গত বৎসর ইউনিয়নে একটা আসনও পাই নি। এ বছর সব আসনে ক্যাণ্ডিডেট পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এসব কারণে সুদামের উপর আমাদের আস্থা নেই। ছাত্র সংগঠনের জন্য উপযুক্ত ভাল কর্মী আমাদের বাইরে থেকে আনতে

হবে। আস্তিন গুটিয়ে বোমাবাজি করার জন্য সুদামকে রাখা যেতে পারে—কিন্তু তার বেশী ওকে দিয়ে কিছু হবে না।

গণেশকে ওর কাছে পুরোপুরি একটা খুনী হিসাবে দাঁড় করিয়ে আমি এবার উপরে উঠতে শুরু করলাম। সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আমার মনে হ'ল এটা খুব চমৎকার হয়েছে। এ ভেরি নাইস্ ট্রিকস্। সুদাম আর ভোলা জানল গণেশই খুনী। একটু পরেই সুদামের বন্ধুরা তা জেনে ফেলবে। তারপর হাজার গোপনতা সত্ত্বেও কানাঘুষোয় দলের সবাই এটা শুনবে। ক্রমে মিথ্যেটা চমৎকার একটা সত্যি হয়ে দাঁড়াবে।

একদিন জানাজানি হয়ে শত্রুপক্ষ ও পুলিশের কানেও কথাটা উঠবে। এখন রাষ্ট্রপতির শাসনে পুলিশ না হয় আমাদের কথা শুনছে, কিন্তু আবার ভোটে জিতে ওরা দখল নিতে পারে। তখন টানাটানি হয় ত গণেশকে নিয়েই হবে। আবার ও-পক্ষ যদি সত্যি মুণ্ডুটুণ্ডু কাটতে চায়—তাহলে প্রথম কোপটা গণশার উপর দিয়েই যাক! ও মরতে মরতে আমি সামলে নেবার সুযোগ পাব। গণেশটা একটু বোকা। বোকারা পৃথিবীতে চিরকাল আগেই মরে।

বেইমানি?

আরে ধুৎ, গুলি মারো! রাজনীতিতে আবার বেইমানি বলে কোনো কথা আছে নাকি? আগাপাস্তলা সবটাই শয়তানি। ওইটে শুদ্ধ ভাষায় বললে দাঁড়ায় কৌশল, স্ট্র্যাটেজি। রাজনীতির ময়দানে যে যে যত ধড়িবাজ সেই তত বড় খেলোয়াড়। যার মাথায় যত জিলিপির প্যাঁচ তার সমৃদ্ধির সিঁড়িটিও তত পাকাপোক্ত। ওসব অনেস্টি আর মর্যালিটি হল সাধু সন্ন্যাসীদের ব্যাপার, যারা কিনা সংসারত্যাগী, কৌপিনসম্বল, শাকাহারী। রাজনীতির কারবারটা তো ত্যাগের না, ভোগের। টাকাপয়সা, জমিজমা, কলকারখানা আর তক্তাতাউস নিয়ে কারবার। এখানে সরল সাদাসিধে মানুষের জন্য এক ইঞ্চি জায়গাও থাকতে পারে না। এ ঘাটে জল ভরতে

এলে দিনে সাতবার শাড়ী বদলে রং পাল্টে আসতে হবে। এই সোজা কথাটা আমি খুব সহজ ভাবেই বুঝি।

এই যে রাজনীতির খেলায় গোটা দেশটা ভেঙ্গে ছ'টুকরো হয়ে গেল এর মধ্যে ইমান কোথায় আছে? এর ষোলআনাই তো বেইমানি। যাওয়ার সময় ইংরেজরা শয়তানি করল, আমাদের দেশভক্ত নেতারাও ওমনি তার পোঁ ধরল। কয়েক কোটি মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম না দিয়ে যেন পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করছে এমন একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে দেশটা দু'টুকরো করে গদীতে উঠে বসল। ব্যস, দেশটা স্বাধীন হয়ে রাজা বদলে গেল।

তারপর থেকে, আজ তেইশ বছর ধরে, দেশের মানুষের সঙ্গে বেইমানির খেলা তো পুরোদমেই চলছে। একটু আধটু ছিটে ফোঁটা সুখ সুবিধা ছড়িয়ে দিয়ে বাকি সব সুখের সিন্দুকে চাবি মেরে আমরা দিব্যি আসর জাঁকিয়ে বসে আছি। তোমরা, মানে দেশের সব কমন-ম্যানরা, কাঙালের মত বাইরে থাক, চাকরি না পেয়ে ফ্যা ফ্যা কর, না খেয়ে শুকিয়ে যাও—কিন্তু ব্রাদার, আমাদের সুখের ঘরের চাবির রিং ছুঁতে এসো না। নেভার ট্রাই টু টাচ্ ইট। তাহলেই আমরা পুলিশ ছেড়ে দেব, লাঠি চালাতে, গুলি ছুঁড়তে বলব। তোমরা দলে দলে শহীদ বনে যাবে। আর তাতেও যদি না থামো, আমরা তাহলে মিলিটারি নামিয়ে দেব।

হ্যাঁ, এসব আমি জানি। আমার কিছু পড়াশুনা আছে। নিজের চরিত্র বুঝতে আমার অন্তত কষ্ট হয় না। মনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এসব ভাববার মত সৎসাহসও আমি রাখি।

আমি জানি, আমাদের নেতা একদিন যাদের নিয়ারেস্ট ল্যাম্প পোস্টে ঝোলাবেন বলেছিলেন তারাই এখন আমাদের ওয়ার্কিং পার্টনার। যত চোর-জোচ্চোর, চোরাকারবারী আর স্মাগলারের দল। ওদের পিঠের উপর পা রেখেই আমরা দশভুজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের অস্তিত্বের স্ট্রংরুমের ওরাই হচ্ছে কোলাপ্সেবল গেট!

এর মধ্যে সদাশিব ডাক্তারের মত দু'একজন অনেষ্টম্যান কখনো ছিটকে এসে পড়েন। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম। এণ্ড দি ভেরিয়েশন্ অলওয়েজ প্রুভস্ দি ল। ওঁরা যেমন আসেন, তেমনি চলেও যান। বেশীদিন ধরে রাখা যায় না। কিন্তু আমরা চিরকাল আছি— চিরকাল থাকব। উই গো ফর এভার।

না মশাই, আমরা ওসব ইমান টিমান বুঝি না। ওসব ফালতু কথা। আমরা নিজেদের ষোলআনা স্বার্থটা বুঝি। আমরা বাড়ী চাই, গাড়ী চাই, মদ চাই, মেয়েমানুষ চাই। জীবনের ভোগের নেশার যাবতীয় উপকরণ দু'হাতে খাবলে নিতে চাই। এরই জন্য আমরা নির্বাচনে লড়ি, রাজত্ব আঁকড়ে থাকি। এটাই আমাদের রাজনীতি, আমাদের জীবননীতি!

আর রাজনীতিতে বেইমানি কে করে না?

ওই যে তমালচন্দ্রের পার্টি, ওরা কি কিছু কম বেইমান! যা কিছু করি না কেন আমাদের টিকিটা তবু দেশের মাটিতে বাঁধা। মাদারল্যাণ্ডের উপর আমাদের একটা নাড়ীর টান আছে। কিন্তু ওদের? পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত চীন-রাশিয়ার কাছে বিকানো। ওদেশে বৃষ্টি হলে এদেশে ওরা ছাতা ফোটায়। ওদেশে ছেলে জন্মালে এদেশে অন্নপ্রাশনের সামিয়ানা খাটায়। ওদের বেইমানি শুধু কি মানুষের সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গেও। ওরা তো ডবল বেইমান।

কিন্তু মুখে দেখ, তপ্ত বালুর উপর অষ্টপ্রহর যেন খই ফুটছে। হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, তাবৎ গরীব লোককে রাজা বানায়েঙ্গা। যেন রাতারাতি এক ফুঁয়ে দুঃখ কষ্ট উড়িয়ে দিয়ে তামাম দেশটা সোনার পাতে মুড়ে ফেলবে! সবাইকে সিংহাসনে বসিয়ে লুচি পোলাও খাওয়াবে!

আসলে বেবাক ধাপ্পা। নির্ভেজাল গুলতাপ্পি।

খোঁজ নিয়ে দেখুন, নেতারা সব তলে তলে আখের গোছাচ্ছে।

যা-হোক একটা গোলমাল পাকিয়ে, হরতাল-ধর্মঘট ডেকে, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে, কচি-কাঁচা ছেলেগুলোকে পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর নেতারা দিব্যি গাড়ী হাঁকিয়ে সাহেবী-হোটেলে খানাপিনা, পার্ক স্ট্রীটে ঢুকু ঢুকু চালিয়ে যাচ্ছে! দেশের একপাল মুখ্যু মানুষকে শহীদ বানিয়ে মালা পরিয়ে লীডাররা মন্ত্রী উপমন্ত্রী হয়ে দিব্যি গোঁফে তা দিয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বিড়লা-বাড়ীর পর্দার আড়ালে বসে গুজগুজ ফুসফাস করে শ্রমিকের বেতন কেটে বউয়ের নামে বালিগঞ্জে জমি কিনছে! আরে বাবা, এসব কথা কি গোপন থাকে?

আবার বলে, আমরা নাকি গুণ্ডা পুষি। ভাড়াকরা গুণ্ডা লাগিয়ে শ্রমিকদের ইউনিয়ন ভাঙ্গি, ব্যালট বাক্স সরাই, ভোটারদের ভয় দেখাই। আর ওরা সব সাধুসন্ত পোষে। তারা আঁচড়ায় না, কামড়ায় না, কাওকে যে কাটে না। শুধু গলায় লালরুমাল বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে কীর্তন গেয়ে বেড়ায়! এই ক'মাসে রাজ্য জুড়ে যত ধানলুঠ, জমিলুঠ, ভেড়ীলুঠ হ'ল সে সব বুঝি আমাদের লোকেরা করেছে? কলে-কারখানায় মালিককে ঘেরাও করে মারধোর করা বুঝি আমাদের কাজ? নারীর মানইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি, স্কুলের হেড্‌মাষ্টারকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা, বর্ধমানের ওই বীভৎস কাণ্ড—এ সব কিছুর জন্ত আমাদের গুণ্ডারাই বুঝি দায়ী?

মণিশঙ্কর চৌধুরী ঠিকই বলেন, "কম্যুনিজমের অর্থই হল হুলিগানিজম্। একটা কমপ্লিট্ অরাজকতা। রাশিয়ায় দেখ, কবর থেকে স্টালিনকে তুলে রামধোলাই দিচ্ছে! লুক এট্ টু চীন, কালচারাল রেভ্যুলেশনের নামে মেকং নদী দিয়ে হাজার হাজার মানুষের ডেডবডি ভেসে যাচ্ছে। এই ভারতবর্ষেও ওরা একটা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। কলকারখানায় প্রোডাকসন্ বন্ধ করে, স্কুলকলেজ উড়িয়ে দিয়ে, জমিজমা, ধান মাছ লুঠ করে একটা কমপ্লিট ল'লেসনেসের অবস্থা আনতে চায়। আর এটাকে ক্যাপিটাল করেই ওরা পপুলারিটির ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়ায়, তার উপর চেক্ কেটে ভোটে দাঁড়ায়। গদী

নিয়ে কামড়াকামড়ি করে, সরকারী টাকাপয়সা পার্টিফাণ্ডে উঠিয়ে নেয়।....দু'দুবার তো ওরা মন্ত্রীসভায় গেল, দেখলে না কি রেজাল্ট? মিঃ মুখুজ্জের মতো ঝানু লোকও ওদের ট্যাকল করতে ঘোল খেয়ে গেল। শেষকালটায় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে ওদের সঙ্গে?'

হ্যাঁ, আমার বাবা খুব প্র্যাকটিকাল মানুষ। অনেক দেখে শুনে চুল পাকিয়েছেন। তাঁর কাছেই আমার রাজনীতির হাতেখড়ি। শৈশবকাল থেকে অনেক যত্নে অনেককিছু শিখিয়েছেন আমাকে। সঙ্গে রেখে হাতেকলমে অভিজ্ঞ করে তুলেছেন। কলে-কারখানায় শ্রমিকদের রকমারি আবদারগুলো মোকাবেলা করার ট্রিকস্ বুঝিয়েছেন, হিসাবের খাতাপত্র ঠিক আছে কিনা বোঝার জন্য কমার্স পড়িয়েছেন, আইন পাশ করিয়েছেন।

আমি অনেকবার তাঁর কাছে শুনেছি, 'নিজের অধিকার সযত্নে রক্ষা করবে। সমাজের যে স্তরে যে শ্রেণীতে তোমার অবস্থান, তার থেকে কোনো কারণেই নীচের দিকে নামবে না। কেননা একবার নামতে শুরু করলে লাস্ট্ শেলটার দাঁড়াবে ফুটপাথে।'

আর সেইসঙ্গে এই কথাও, 'মনে রাখবে, তুমি সবসময়ই কারো না কারো আক্রমণের লক্ষ্য। অতএব নিজের ধন-সম্পত্তি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে-কোনো কাজকেই মহৎ বলে গণ্য করবে। এমন কি নারীহত্যাও!'

অবশ্য আমাদের বাড়ী-গাড়ী কল-কারখানার জন্য বাবা কোনোদিন নারীহত্যা করেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। তবে নিজের হাতে বন্দুক ছুঁড়ে দুটো চাষাকে তিনি শেষ করেছিলেন। সে ঘটনা আমি কিছু কিছু জানি।

সেটা '৪৫-'৪৬ সালের কথা। ফসলের শেয়ার নিয়ে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে খুব গোলমাল হচ্ছিল তখন। মূলে ছিল ওই কম্যুনিস্টরা। চাষাভূষোদের ক্ষেপিয়ে দলবেঁধে কাছারি আক্রমণ করছিল, ফসলের

গোলায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল, নায়েব-জমিদারদের হাতের নাগালে পেলে গলা কেটে নিচ্ছিল। আমি তখন ছোট। আমার ঠাকুর্দা ত্রিদিবশঙ্কর চৌধুরী তখন জীবিত। ঠাকুর্দার উইলে বাবা তখন ছ'আনা অংশের জমিদার।

সেইসময় একদল মারমুখী চাষা আমাদের বড়ো দালানের কাছে এসে বর্শা বল্লম উঁচিয়ে চিৎকার করছিল। তা শুনে আমার ঠাকুর্দা আফিঙের নেশায় ঝিমুতে ঝিমুতে কাঁপাগলায় বলেছিলেন, 'ওরা এত চেঁচাচ্ছে কেন। আমার ঘুম আসছে না। তুই একটু দেখ তো মণি—'

আমার বাবা মণিশঙ্কর চৌধুরী তখন দোনলা বন্দুক হাতে ছাদের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রেলিঙের ফাঁকে নল রেখে পরপর দু'বার ট্রিগার টেনেছিলেন। আর গুলি ভরার দরকার হয় নি। কয়েক-মিনিটের মধ্যে দুটো লাশ কাঁধে ফেলে ওরা নাকি হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর ইংরেজ সরকারের পুলিশ এসে একমাস ধরে আমাদের বাড়ী পাহারা দিয়েছিল।

সেই সময় ঠাকুর্দাকে কি একটা টাইটেলও ওরা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা অমত করলেন। অসম্ভব দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজের আয়ু ফুরিয়েছে। খুব শীঘ্রি ওরা সাগর পার হবে। তখন স্বাধীনদেশে ওদের টাইটেলটা বংশের পক্ষে ভূষণ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

তখন থেকেই পলিটিকসের দিকে একটু ঝুঁকেছিলেন বাবা। মাস কয়েক পর জমিজমার গোলমালটা মিটে যেতে গাঁয়ের সব মানুষগুলোকে ডেকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ছাদের উপর থেকে গুলি চালিয়েছিল মহেন্দ্র সিং—আমাদের দারোয়ানটা। আর চালিয়েছিল বাবার হুকুমে। তা তিনি তো এখন গত হয়েছেন। শ্রাদ্ধশান্তিও চুকে গেছে। মরামানুষের উপর তোমরা আর রাগ পুষে রেখো না। সেটা অধর্মের কাজ হবে। আমি মহেন্দ্র সিংকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

তোমাদের যে দুটো লোক মরেছে তাদের বিধবা বৌ-কে দু'শ করে টাকা দিচ্ছি। গাঁয়ের বড়ো পুকুরটার সংস্কার করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা বিপদে আপদে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। ওই জগৎবল্লভটা তো ভিন্ গাঁয়ের লোক। এ গাঁয়ে নাক গলিয়ে নিজের মতলব হাঁসিল করার তালে আছে। আমরা এক গাঁয়ের মানুষ—ভাই ভাই। মিলে-মিশেই তো থাকতে হবে, কি বলিস রে অক্রূর?'

তা অক্রূরদের অনেকেই বাবার দলে এসে গিয়েছিল। প্রথম নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হয়ে বাবা ওই অঞ্চল থেকেই দাঁড়িয়েছিলেন। তমালদের জগৎবল্লভ ছিল তাঁর বিপক্ষে। শুনেছি তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

তারপর থেকে, এই দীর্ঘকাল ধরে, মণিশঙ্কর চৌধুরী এই অঞ্চলের একটা রিমার্কেবল্ পার্সোন্যালিটি। একটা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন তাঁর দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহের জ্যোতিতে, উন্নত ললাট আর তীক্ষ্ণ চক্ষুতে, তাঁর কথা-বার্তায় ও কাজে-কর্মে।

এই অসম্ভব ব্যক্তিত্বের জন্যই গাঁয়ের বড়ো বড়ো খিলানওলা পুরনো বনেদীবাড়ীর গণ্ডীতে তাঁর মন টিকল না। তাঁর মনে হ'ল, এখানে বেশীদিন থাকলে ওই ধানজমি আর মেছোঘেরির মতো তাঁর ফার্টালিটিও দিন দিন নষ্ট হয়ে যাবে—ধূলোর আস্তর জমে মলিন হয়ে উঠবে। তিনি জমিজমা বিক্রী করতে শুরু করলেন। গ্রাম ছেড়ে এই শহরে এসে বাড়ী করলেন। গ্লাস ফ্যাক্টরি স্টার্ট করলেন। ফ্লাওয়ার মিল বানালেন। পারমিট বের করে বাস চালু করলেন। একটু একটু করে শহর বাড়তে লাগল—তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাবাও বাড়তে লাগলেন। মণিশঙ্করের তখন ফুল ফর্ম। যারা দেখেছে তারাই বলতে বাধ্য হয়েছে, হ্যাঁ, এ ম্যান অব এ্যাকশন্, এ ম্যান অব স্পীড্!

এমন কি, ওই যে ঢাল-তরোয়াল-বিহীন নিধিরাম-সর্দার জগৎবল্লভ, বাবার সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যই যার জন্ম, তাকেও কোনো কোনো

মিটিঙে আমি বলতে শুনেছি, 'মণিশঙ্করবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি এই অঞ্চলকে গ্রাম থেকে শহরে পরিণত করেছেন। অনেক কল-কারখানা বসিয়েছেন, ত্রিশখানা বাস চালু করেছেন, ইউনিয়ন বোর্ড ভেঙে মিউনিসিপ্যালিটি করেছেন, কলেজ করেছেন। আর এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অজান্তেই কম্যুনিজমকে ডেকে এনেছেন। শোষক-শ্রেণী তাদের শোষণকে বিস্তৃত করার জন্যই এসব বাড়িয়ে চলে, আবার এসব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়........ইত্যাদি।'

তা জগৎবল্লভের আবোল-তাবোল অংশ বাদ দিলে এটা তো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে আমার বাবার জন্যই এই অঞ্চল গ্রাম থেকে আজ একটা ইম্পরটেন্ট মহকুমা শহরে পরিণত।

বাবার এই অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও শার্প পার্সোনালিটির জন্যই আমি তাঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। ওই কম্যুনিস্ট বাঁদরগুলো ছাড়া এই অঞ্চলের সবাই করে। অনেক বাঘা বাঘা লোককে দেখেছি বাবার সামনে এসে ভিজে বেড়ালের মতো মিউ মিউ করছে। ওই যে তমালচন্দ্র, যাকে আজ ঠিক দশটা দশে আমি নিজের হাতে মার্ডার করেছি, সভা-সমিতিতে বাবার কুৎসা রটাতে পঞ্চমুখ, যেন আগুন ঝরছে গলা বেয়ে, কিন্তু কোনো ইউনিয়নের হয়ে বাবার সঙ্গে আপোষ-আলোচনার জন্য যেই বড়ো ঘরটায় এসে চেয়ার নিল, ওমনি সিংহের সামনে যেন খরগোশ, মুখখানা চুপসে ব্লুটিং পেপার। মিন মিন করে বলছে, 'ফ্লাওয়ার মিলের শ্রমিকেরাও মানুষ। ওদেরও স্ত্রী পুত্র আছে। ছাঁটাই করার সময় মানবতার খাতিরে এ কথাটা আপনার মনে রাখা দরকার।'

বাবা চেয়ারে হেলান দিয়ে গমগমিয়ে উঠছেন, 'মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান, মানবতার কি কোনো নির্দিষ্ট ডেফিনেশন্ আছে? লাইক ইন[illegible] হিউম্যানিটি অলসো ফলোজ্ নেসিসিটি। ওই প্রয়োজনটাই হ'ল বড়ো কথা। শ্রমিকের প্রয়োজনে শ্রমিক কাজ করে, মালিকের প্রয়োজনে মালিক কাজ করায়। ওই প্রয়োজনের তাগিদেই কল-

কারখানার উৎপাদন কখনো বাড়াতে হয়, কখনো কমাতে হয়। তার সঙ্গে তাল রেখে নতুন লোক নেওয়া হয় বা পুরনো লোক ছাঁটাই করতে হয়। এটা উৎপাদন-ব্যবস্থারই একটা নিয়ম। নিয়ম না মানলেই বিশৃঙ্খলা, উৎপাদন বন্ধ।........ ডু ইউ এডমিট্ ইট?'

বলা শেষ করে বাবা তীক্ষ্ণ চোখে তমালের মুখ দেখেন। ইঙ্গিতে চাকরটাকে বলেন ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিতে। হু হু করে পাখা ঘুরতে থাকে। বাবা তার মধ্যেই কায়দা করে চুরুট ধরিয়ে নেন। তমালের দল ততক্ষণ উত্তর হাতড়ে বেড়ায়।

একবারের কথা মনে পড়ছে।

চীনাগুলো তখন ভারত আক্রমণ করেছে। হিমালয়ের কোল ঘেঁষে জোর লড়াই চলছে। চীন-রাশিয়ার বাচ্চাগুলো এদেশে সাবোটেজ করার কাজে মেতে উঠেছে। ভারতরক্ষা আইনে ওদের দলে দলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কম্যুনিস্ট বলে সন্দেহ হলেই কল-কারখানা অফিস-আদালত থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। দেশের তাবৎ মানুষ দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ফেটে পড়ছে। এমন কি জেলখানায় ওদের খাবার পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করছে ওয়ার্ডাররা, এমন ঘৃণা!

সেই সময় কলেজের একজন লেক্‌চারারের চাকরি খতম করলেন মণিশঙ্কর। করতে বাধ্য হলেন। কারণ লোকটা মাইনে থেকে ডিফেন্স ফাণ্ডে একদিনের বেতন দিতে অস্বীকার করেছিল। তাই নিয়ে হৈ চৈ, বাদ-প্রতিবাদ। বাবার কানে কথাটা আসতে তিনি কালবিলম্ব না করে গভর্ণিং বডির জরুরী মিটিং ডাকলেন। আমাদের বাড়ীতেই সভা বসল।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর হরেণ চৌধুরী বললেন, 'মোহিতবাবু খুব পপুলার টীচার। ইয়ং এণ্ড এনারজিটিক—'

বাবা বললেন, 'ওতে কিছু আসে যায় না। হি ইজ্ এ কম্যুনিস্ট!'

ডঃ চোধুরী বললেন, 'তার তো কোনো এভিডেন্স নেই!'

বাবা বললেন, 'আর কি এভিডেন্সের দরকার? উনি ডিফেন্স ফাণ্ডে চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছেন—'

ডঃ চৌধুরী বললেন, 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, মোহিতবাবু বললেন, কারণটা তাঁর ব্যক্তিগত—'

'দেশ যেখানে বিপন্ন সেখানে ওসব ব্যক্তিগত কারণ-টারণ গ্রাহ্য হতে পারে না।' বাবা গম্ভীর মুখে ডঃ চৌধুরীকে প্রায় ধমকে উঠলেন, 'এটা এক ধরণের বেইমানি, দেশদ্রোহিতা। আপনি কি বলেন ডাক্তারদা?'

আধপাগলা ডাক্তার সদাশিব এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর প্রবল বেগে ঘাড় মাথা দুলিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, যে বেটা মায়ের পূজোয় দক্ষিণা দেয় না, কি হবে তাকে রেখে! দাও তাড়িয়ে।'

ভাল ক্যারিয়ারের কেমিস্ট্রির টীচার পাওয়া যায় না বলে প্রিন্সিপ্যাল চৌধুরী তবু একটু আপত্তি করলেন। কিন্তু বাবার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে টিকে থাকার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। একটু পরেই বাবার নির্দেশ মত তিনি চিঠি ড্রাফট করলেন। তিন মাসের বেতন ও ছুটিসহ মোহিতবাবুর চাকরি চলে গেল।

গভর্ণিং বডির মিটিং শেষ করে উপরে উঠে আসার পর বাবাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনতলার বারান্দায় প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলে দিয়ে শরীরে শীতের রৌদ্রের উত্তাপ নিতে নিতে মৃদুহাস্যে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আজকের ইন্‌সিডেণ্ট থেকে ইউ মাস্ট টেক্ এ লেসন। কি বল তো জয়?'

আমি তখন বারান্দার অন্য কোণে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে। বাগানের বড় পামগাছগুলোর পাতা ছুঁয়ে উড়ে উড়ে খেলা করছে ক'টা বালি হাঁস। তাদের কোনো একটাকে টারগেট করার ইচ্ছা। বাবার কথায় একটুও না ভেবে বললাম, 'শত্রুকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত।'

'ইয়েস, তুমি ঠিক ধরেছ জয়!' আমার উত্তরে খুব খুশী হয়ে

শব্দ করে হেসে উঠলেন মণিশঙ্কর। তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। এরপর বিষয় সম্পত্তি সবই তোমাকে দেখতে হবে। রাজনীতিতেও অংশ নিতে হবে। কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখবে জয়, সম্পদ ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুর দলও ওৎ পেতে থাকে, মাংসের দোকানের কাছে যেমন থাকে কুকুরগুলো। ঠিকসময় ঠিকভাবে তার আক্রমণ ঠেকাতে না পারলে শেষে অস্তিত্বের শিকড় ধরে টানাটানি পড়ে। সুতরাং যে-কোন উপায়ে নিজের অর্জিত অধিকার রক্ষা করবে। ইতস্তত: করবে না, ভয় করবে না, করুণা করবে না।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'আজ এই প্রফেসারটাকে আমি যদি না তাড়াতাম তাহ'লে দু'দিন পরে অনুকূল বাতাস পেয়েও দপ্ করে জ্বলে উঠত। স্টুডেন্টদের মধ্যে কম্যুনিজমের বিষ ছড়াত। টিচার্স কাউন্সিলে বিভেদ সৃষ্টি করত। তারপর কলেজের এ্যাকাউণ্টস্ ধরে টান দিত! আমরা নিশ্চয়ই বোকার মত ওকে সেই সুযোগ দিতে পারি না।···দাও দেখি বন্দুকটা, আমি একটা হাঁস মারতে পারি কিনা দেখি।'

হ্যাঁ, আমি আমার বাবার মন্ত্র নিয়েছি।

কোন কিছুর বিনিময়েই আমরা আমাদের অধিকার হারাতে চাই না। অথবা তার এককণাও নষ্ট করতে চাই না। তার জন্য যা কিছু করনীয় আমাকে করতে হবে। আমার সম্পদ ও সমৃদ্ধির অধিকার রক্ষার জন্য অথবা আমার অস্তিত্বের নিরাপত্তার জন্য কিছু তমাল যদি নিহত হয় বা কিছু গণেশ যদি জেল খাটে কি দ্বীপান্তরে যায়, আমার তাহলে কিছু করার নেই। এ ব্যাপারে আমি বাবা অন্ধ নাচার!

না, গণেশ না। তমালকে আমিই খুন করেছি। এ খবর ওরা কেউ জানে না। এমন কি ভোলাও না। অথচ একদিন আমি ভোলাকেই দায়িত্ব দিয়েছিলাম। ও ফেল করেছে। কাওয়ার্ড একটা।

অথবা ধড়িবাজ। চারদিকে তমালদের বাড়বাড়ন্ত দেখে ঝুঁকি নিতে রাজী হয় নি। তার উপর খুবসুরত একটা মেয়েছেলে ঘরে এনে জীবনের উপর বোধ হয় মায়া বসে গেছে। ওয়াগন ভাঙ্গা ছেড়ে এখন ও সাধুসন্ত না হয়ে যায়! খুব সাহসী, স্মার্ট এবং পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য কাউকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আমার নিজের হাতেই তুলে নিতে হ'ল। কেননা এটা খুব জরুরী ছিল। এখন সময় আমাদের ফেভারে। পুলিশ পেয়াদা আমাদের কথা শুনবে। প্রশাসন থেকে সবরকম সাহায্য পাওয়া যাবে। আরো ক'মাস পরে বাতাস অন্যমুখী হতে পারে। তখন দল বেঁধে ওরাই হয়ত আমাকে খুন করতে ছুটে আসবে। সুতরাং নাউ অর নেভার। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, প্রেসিডেন্ট রুল চালু থাকতে থাকতে কাজটা সেরে ফেলতে হবে। আমি তমালকে খুন করব। আমিই।

সমস্ত শহর কাঁপিয়ে এই সময় ওরা চেঁচিয়ে উঠল। অনেকটা ডাকাত পড়ার মতো রে রে শব্দ। ভয়ঙ্কর রকমের কর্কশ, কুৎসিৎ। আমি বারান্দার ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসেছিলাম। চিৎকারটা প্রবল বেগে ছুটে এসে আমার কানের পর্দায় ফেটে পড়ল। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি পায়ের পাতায় নেমে এল। মস্তিষ্কের কোষগুলো কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। সিগারেট ধরাব বলে হাতে প্যাকেটটা রেখেছিলাম, ঠক্ করে মেঝেয় পড়ে গেল। আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম।

রেলিঙ ধরে ঝুঁকে দেখলাম, ভোলা আর গণেশ বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, তার পিছনে সুদাম। মৃদু চাঁদের আলোয়, গাছপালার ছায়ায় ওদের শরীরগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে। রাস্তায় পুলিশের কালো গাড়ী দাঁড়িয়ে, গাড়ীর উপর এরিয়ালের সরুফলা চিক চিক করছে। ওরা কেউ ঘুমিয়ে নেই এবং পুলিশও যথাস্থানে সজাগ আছে দেখে আমি মুহূর্তেই শক্তি ফিরে পেলাম। বারান্দার আলমারিতে হাতের

নাগালে আমাদের বন্দুকটা শোয়ানো আছে, আমি তাতে গুলি ভরে রেখেছি—মনে পড়ল। ভয় কেটে গিয়ে দারুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার মনটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সেই অদৃশ্য প্রবল গর্জনের দিকে কান রেখে আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম। আমার মনে হ'ল, ওই তমালকে খুন করে আমি জীবনের একটা সৎকাজ করেছি—একটা পবিত্র কাজ। এবার অশোকের পালা। তারপর ওই সুব্রত, অলকেশ, হিমানীশ—ক্রমে ওই সম্মিলিত সমুদ্রগর্জনটাকেই আমি খুন করতে চাই।

হ্যাঁ, ওরা আমার অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান দিয়েছে। আমাদের বংশের সুনাম খুঁড়ে কলঙ্কের হাড়কঙ্কাল বের করতে চাইছে। সমস্ত অঞ্চলে আমাদের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ওই মুচি মেথর মুদ্দাফরাশের দল। জগৎবল্লভ যার মাথা, তমাল আর অশোক যার দুই হাত। বুড়ো মাথাটা নিয়ে আমাদের তেমন দুর্ভাবনা নেই, ডালপালা ছাঁটলে আপনি সে শুকিয়ে উঠবে। যারা এ্যাকশনে আছে আগে তাদের সরানো দরকার। সে হিসেবে তমাল এক নম্বর।

বুড়ো বয়সে আমার বাবা ওরই জন্য দারুণ শক্‌ড্‌। একে একে সমস্ত ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়ে যেন যাদুঘরের মানুষ। সেই প্রবল ব্যক্তিত্বের উপর একটা ভারি পর্দা নেমে এসেছে। টকটকে গায়ের রং তামাটে হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল চোখে ক্লান্তির ফ্যাকাশে ছায়া পড়েছে। যিনি জীবনে কখনো ভাঙেন নি, মচকান নি, হারেন নি, তিনি এখন কম্প্লিট্‌লি ডিফিটেড্‌। চারদিকে এত আঁট-ঘাট বেঁধে এত সতর্ক সাবধানী পা ফেলেও এই পরাজয়ের গ্লানি তিনি এড়াতে পারলেন না। আর এই সব কিছুই ঘটল ওই জগৎবল্লভের নির্দেশে, তমালের নেতৃত্বে। মাত্র ক'বছরের মধ্যে হাতে পায়ে অসম্ভব বল সঞ্চয় করে যেন অতিকায় একটা চীনা ড্রাগনের মতো ওরা হা হা করে ছুটে এল। লম্বা লম্বা শুঁড় দিয়ে ঘিরে ফেলল আমাদের।

তারপর রক্ত চুষতে শুরু করল। মণিশঙ্কর চৌধুরীর মত আমরা সবাই কেমন অসহায় বোধ করতে শুরু করলাম!

শুধু এই অঞ্চলে না, ছেষট্টি সালের সেই ফুড্ মুভ্মেণ্টটার পর থেকে সারা বাংলাদেশ জুড়েই কি একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। সাধারণ মানুষ আর আমাদের কথা শুনতে চাইল না। অজয় মুখুজ্জেরা ছিটকে গিয়ে একটা নতুন পার্টি করে বসল। বাবাকে গোড়ার দিকে টানাটানি করল ওরা। তারপর হাল ছেড়ে সদাশিব ডাক্তারের পেছনে ঘুরতে লাগল। সদাশিব ওদের খাতায় নাম লেখালেন না বটে কিন্তু ইন্‌এ্যাকটিভ্ হয়ে গেলেন। আমাদের মস্ত-বড়ো একটা খুঁটি ভেঙ্গে পড়ল। পরের বছর নির্বাচনে তমালের কাছে বাবা জীবনে যে প্রথম হারলেন তার একটা কারণ এই ফুড্-মুভ্মেণ্ট, আরেকটা সদাশিব ডাক্তার। ডাক্তারটা ঠিক থাকলে ফুড্ মুভ্মেণ্টের ধাক্কাটা আমরা হয়ত সামলে উঠতে পারতাম। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই বাগ মানানো গেল না। ওই হাফ্-ম্যাড্ লোকটা আমাদের পুরোপুরি বিট্রে করল!

অথচ লোকটা আজীবন গান্ধীবাদী। একদিন মেডিক্যাল কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন। এম-বি-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট গোল্ড-মেডালিস্ট। ফারদার রিসার্চের জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে বিলেত পাঠাতে চেয়েছিল, মোটা বেতনের চাকরীও দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীর শিষ্য হয়ে সদাশিব সব ছাড়লেন। গলায় স্টেথিস্‌কোপ আর হাতে ওষুধের ব্যাগ ঝুলিয়ে তিনি সত্যাগ্রহ আর আইনঅমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। বছর সাতেক জেল হ'ল। বেরিয়ে এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করলেন। তারপর এই অঞ্চলে এসে স্থিতি। এখন দিব্যি গুছিয়ে বসেছেন।

মণিশঙ্করের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো। মাথার খোঁচা খোঁচা চুল সাদা হয়ে এসেছে। মোটা থলথলে শরীর। ফর্সা রঙ। মোটা জামা কাপড়।

এই অঞ্চলে অসম্ভব পপুলার। বিশেষ করে গরীব মানুষগুলোর

কাছে। ওদের কাছ থেকে ভিজিট নেন না। রাত-বিরাতে ডাকলেও ঠিক গিয়ে হাজির হ'ন। কমদামের ওষুধ দেন, তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে খুবই রেসপেক্ট করে, ভালবাসে।

উনি দীর্ঘকাল ধরে আমাদেরও হাউস ফিজিশিয়ান। বাবার সঙ্গে হৃদ্যতাও খুব। বাবার অনুরোধে ইলেকশনের সময় আমাদের হয়ে কাজ করতেন। সভা-সমিতিতে দাঁড়িয়ে পাঁচসাত মিনিট ঝড়ের বেগে কিছু একটা বলে রোগী দেখতে চলে যেতেন। জিভের একাংশে জড়তা থাকায় তাঁর কথা কেউ বুঝত না। কিন্তু না বুঝলেও কাজ হ'ত। তাছাড়া রোগীর বাড়ীতে বসেও উনি পাবলিসিটি করতেন। আমাদের কর্মীরা শুনেছে সে সব। প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে আধ-পাগল বুড়ো সদাশিব বলছেন, 'এসে গেল, এসে গেল ভোটের বাজি! তা কাকে ভোট দেবে গো তোমরা ?....দিও, আমাকে একটা দিও। মানে ওই চৌধুরীমশাইকে।'

এই সময় মণিশঙ্করের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে সদাশিব ঘনঘন ঘাড় মাথা দুলিয়ে বলে উঠতেন, 'ঠিক বলেছিস বাবা, ঠিক। মহা ত্যাঁদোড় ওটা, মহা পাজী! তা কি করবি বল, কাজের লোকই তো পাজী হয় রে। দেখিস্ না, মহাদেবের কোনো কাজ নেই, ভালমানুষটি বসে বসে তাই ছাই ওড়ান! কিন্তু বিশ্বকর্মা ? তাকে তো শিবও গড়তে হয়, বাঁদরও গড়তে হয়! তা এই টাউনে মণিশঙ্কর তো অনেক কাজ করেছে বাপু, তার হিসাবটাও ধরিস!'

সদাশিব ডাক্তারের কথা নীচুপট্টির মানুষ বা মধ্যবিত্তের মনে মন্ত্রের মতো কাজ করত। এক একটা পাড়ায় গিয়ে আমরা শুনেছি, মানুষ দলবেঁধে এসে বলেছে, 'এখানে আর বলা-কওয়ার কিছু নেই বাবু। যা বলার ডাক্তারবাবু বলে গেছেন। আমরা তাঁর বাক্যি অমান্যি করব না। আপনারা বরং অন্য পাড়ায় যান—'

সাতষট্টি সালে সেই ডাক্তারবাবু বদমেজাজি ঘোড়ার মতো একেবারে বেঁকে বসলেন।

শুরুতে আমাদের কর্মীরা গেল। তারপর আমি গেলাম। শেষ পর্যন্ত মণিশঙ্কর অসুস্থতার ভান করে সদাশিবকে ডেকে পাঠালেন। বাট্ দ্যাট ওল্ড হাফ-ম্যাড্ ম্যান বাঁকাঘাড় কিছুতেই সোজা করলেন না। বাবা খুব অফেণ্ডেড্ হলেন। তাঁর গৌরবর্ণ মুখে অপমানের ক্রুদ্ধ লালআভা ঝিকিয়ে উঠল। তবু সংযত কণ্ঠে বললেন, 'এমন ধনুকভাঙা পণ করলেন যে ডাক্তারদা?'

সদাশিব ডাক্তার অভ্যাস মত দুলে দুলে হাসলেন, তারপর হড়বড় করে বললেন, 'চৌধুরীমশাই, তুমি জেল খাটোনি, আমি খেটেছি। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে শুয়ে সত্যাগ্রহ করেছি। তখন ইংরেজের পুলিশ লাঠি গুলি চালাত, আমরা হাত পা ভেঙ্গে পড়ে থাকতাম। কিন্তু এখন কেন লাঠি চলে, গুলি চলে, বল দেখি? গত বছর কোর্টের সামনে পুলিশ লাঠি চালাল, দশ-বারোটা লোক জখম হ'ল। তার মধ্যে একটা বাচ্চা আর একটা মেয়েমানুষ ছিল। বাচ্চাটা তো মরেই গেল—'

মণিশঙ্কর বললেন, 'ওরা কোর্ট-কাছারীর উপর হামলা করতে গিয়েছিল!'

সদাশিব বললেন, 'না, চৌধুরীমশাই! চালের দর পঞ্চাশ, সরষের তেল, কেরোসিন তেল খুঁজে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের মানুষ শাঁপলা তুলে সেদ্ধ করে খাচ্ছে। আমি তো যাই রোগী দেখতে, কিছু কিছু জানি চৌধুরীমশাই। ওরা কোর্টে এসেছিল এস-ডি-ও সাহেবের কাছে, খাবার চাইতে—'

অল্পকাল চুপ করে থেকে মণিশঙ্কর বললেন, 'আপনি কি আমার বিরুদ্ধে ওই কম্যুনিস্টগুলোর হয়ে কাজ করবেন ডাক্তারদা?'

সদাশিব জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন, 'কম্যুনিস্ট? ওরে বাবা! আমি আর কারো দলে-টলে নেই চৌধুরীমশাই। তোমরা যেমন পার হালে ষাঁড়-বলদ জুড়ে ওদের কাস্তে-করাতের সঙ্গে লড়ে নাও গে। আমি ডাক্তার মানুষ, রোগী দেখে বেড়াই।'

বলতে বলতে ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রটা গুছিয়ে তুলতে লাগলেন সদাশিব। বাক্স বন্ধ করে মোটা গলায় গেয়ে উঠলেন, 'আমি বাবা মুক্ত পুরুষ সদানন্দ, চাই না ভাল চাই না মন্দ, ডাক এলেই চলে যাব ড্যাঙড্যাঙিয়ে!....আমি যাচ্ছি চোধুরীমশাই। তোমার প্রেসারটা দেখলাম বেড়েছে। একটু বিশ্রাম নিও।'

সদাশিব চলে যেতে আমি ঠোঁট কামড়ে বলে উঠলাম, 'একটা ক্লাউন! আমরাই মাথায় তুলেছি ওকে।'

মণিশঙ্কর বললেন, 'নামাতেও বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু এখন নয়, ইলেকশনটা পার হোক্! বোঝা যাচ্ছে, এবার তোমাদের খুব খাটতে হবে। খরচপত্রও কিছু বেশী হবে। তা হোক, ওই হামবাগ্ ডাক্তারটাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার আমাদের প্রতিষ্ঠা ওর মর্জির উপর নির্ভর করে না।'

ইলেকশনে আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলাম। সরকারী মেসিনারিজও আমাদের সঙ্গে ছিল। অনেক রথী-মহারথী এনে মিটিং করেছিলাম। মণিশঙ্কর নিজে রিক্সায় করে ভোটারদের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছিলেন। যেখানে যা দরকার টাকা ঢেলেছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা একটা ভয়ঙ্কর প্রেস্টিজ ইস্যুতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মণিশঙ্কর লস্ট দি গেম্। বাবার দীর্ঘকালের সুরক্ষিত সুন্দর আসনটা ওই তমাল যেন ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তিন হাজার তেত্রিশ ভোটে আমরা হেরে গেলাম।

এই বিপর্যয়ের জন্য মণিশঙ্কর মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। নির্বাচনের ফল বেরোবার পর থেকেই অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। প্রেসার বাড়তে লাগল। একদিন অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলেন। তারপর থেকে এক রকম শয্যাশায়ী। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে বাইরে বেরুতে চান না। অফিসিয়াল কাজ-কর্ম ছাড়া কারো সঙ্গে দেখাও করেন না। কোনোদিন গাড়ী নিয়ে কোলকাতা চলে যান। ফেরেন অনেক রাতে।

তমাল পার্টিইলেকশনে জিতে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে ড্রাম বাজাল। বাজি ফাটাল, তুবড়ি ছোটাল। আমরা দরজা জানালা বন্ধ করে রাখলাম। কিন্তু এত অল্পতে ওরা শান্ত হল না। মন্ত্রী-সভায় গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন করাল। আমরা হারলাম। কলেজের গভর্ণিং বডির ইলেকশন করাল। তাতেও ওরা মেজরিটি পেল। তারপর থেকে যেন ক্ষেপা কুকুরের মত আমাদের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাবার নামে একসঙ্গে সাত সাতটা মামলা স্টার্ট করল ওরা। কলেজ-ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ, পৌরসভার অর্থের অপচয়, কো-অপারেটিভ্ স্টোর নিয়ে জালিয়াতি, বাসকর্মীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা জমা না দেওয়া········এমনি কত কি। আমাদের সমস্ত জমি-জমা, কল-কারখানা এমন কি বাড়ীর দলিল-পত্র ধরেও টানা হ্যাঁচড়া শুরু করল। সারা অঞ্চলের কাগজে-পত্রে, পোস্টারে, হ্যাণ্ডবিলে ওরা জানিয়ে দিল, আমাদের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত প্রতিষ্ঠা জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করেই। আমরা চোর, আমরা জালিয়াত, আমরা খুনী!

আর এইসব কিছু পরিচালিত হতে লাগল ওই তমালের নেতৃত্বে। ওর উস্কানিতেই গ্লাস ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা বাড়তি বেতনের জন্য ধর্মঘট করে বসল। ফ্লাওয়ার মিলের কুলিগুলো বোনাস চাইল। বাস-কর্মীরা আটঘণ্টার বেশী কাজ করতে অস্বীকার করল।

চারদিকের আক্রমণে আমরা কেমন কোণঠাসা হয়ে গেলাম। ফাঁদেপড়া বাঘের মত মণিশঙ্কর চৌধুরী গজরাতে লাগলেন। মামলা মোকদ্দমাগুলো তাঁকে আরো অসুস্থ করে তুলল।

মিউনিসিপ্যালিটির হেরে-যাওয়া চেয়ারম্যান অধর হালদার একদিন ছুটে এলেন, 'কিছু ভাবনা নেই মণিদা, এই মিনিস্ট্রী টাঁসল বলে। সব ঠিক হয়ে গেছে। পুলিশ মিলিটারী রেডি। অক্টোবরের দুই তারিখ মুখ্যমন্ত্রী রিজাইন্ করছেন—'

মণিশঙ্কর বললেন, 'শুনে এসেছি। কাল কোলকাতায় মিটিং ছিল।'

অধর হালদার আরো উৎসাহিত হলেন, 'আর কি শুনে এসেছেন বলুন। ওই কম্যুনিস্ট ছোঁড়াগুলো বড্ড তড়পাচ্ছে। আমার ধানকলের দেয়ালে বড়ো বড়ো করে লিখেছে, 'এবার দিনবদলের পালা, পালা রে অধর পালা'। আস্পর্ধা দেখুন দেখি!'

মণিশঙ্কর বললেন, 'লিখুক গে। এখন কিছু বলো না, ওৎ পেতে থাক। ওদের চৌদ্দ শরিকের জোড়াতালি গভরমেণ্ট, আজ না হোক কাল ভাঙ্গবেই। তখন দেখা যাবে।'

কিন্তু সেকেণ্ড অক্টোবর মন্ত্রীসভা ভাঙ্গল না। মুখ্যমন্ত্রী নার্ভাস হয়ে মত পরিবর্তন করলেন। ধুঁকে ধুঁকে আরো কিছু দিন গোঁজা-মিলের সরকার টিকে গেল। বাবা ঘন-ঘন কোলকাতায় যেতে লাগলেন। এখানে ওখানে গোপন মিটিং বসতে লাগল। শলা-পরামর্শ চক্রান্তের সঙ্গে রকমারি গুজব বাতাসে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় জরুরী ফোন এল কোলকাতা থেকে। বাবা ফোন ধরলেন। তারপরই গাড়ী নিয়ে ছুটলেন কোলকাতায়।

অনেক রাতে ফিরে এসে স্যুট খুলতে খুলতে বললেন, 'এভরিথিং সেটেলড্ জয়। এই মিনিস্ট্রি ফল্ করছে। প্রফুল্লটা নতুন চীফ্ মিনিস্টার হচ্ছে। কিছু হামলা হতে পারে, রেডি থেকো!'

এবার সত্যি ভাঙ্গল। রাজ্যপালের এক কলমের খোঁচায় মন্ত্রীদের চাকরি চলে গেল। হরতাল হ'ল। মিটিং মিছিল হ'ল। বোমা পটকা ফাটল। এই শহরেও বিক্ষোভ দেখাল ওরা। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গলাবাজি করল। দোকানপাট বন্ধের ডাক দিল। ওদের দলের একটা মেয়ে ফার্স্ট মুন্সেফ কোর্টের চেয়ার দখল করে প্রফুল্ল ঘোষের বিচার করল এবং বিচারে সরাসরি তাঁর ফাঁসি দিয়ে ফেলল।

আমরা তৈরী ছিলাম। কোর্টের সামনে ওদের মিছিল লক্ষ্য করে গণশা আড়াল থেকে গোটা দুই বোমা ছুঁড়ল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে লাঠি নিয়ে ওদের তেড়ে গেল। তারপর কোর্টের মধ্যে ঢুকে এলোপাথাড়ি লাঠি চালাল, ডজনখানেক গ্রেপ্তার করল। সেই

তমাল পার্টিইলেকশনে জিতে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে ড্রাম বাজাল। বাজি ফাটাল, তুবড়ি ছোটাল। আমরা দরজা জানালা বন্ধ করে রাখলাম। কিন্তু এত অল্পতে ওরা শান্ত হল না। মন্ত্রীসভায় গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন করাল। আমরা হারলাম। কলেজের গভর্ণিং বডির ইলেকশন করাল। তাতেও ওরা মেজরিটি পেল। তারপর থেকে যেন ক্ষেপা কুকুরের মত আমাদের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাবার নামে একসঙ্গে সাত সাতটা মামলা স্টার্ট করল ওরা। কলেজ-ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ, পৌরসভার অর্থের অপচয়, কো-অপারেটিভ্ স্টোর নিয়ে জালিয়াতি, বাসকর্মীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা জমা না দেওয়া........এমনি কত কি। আমাদের সমস্ত জমি-জমা, কল-কারখানা এমন কি বাড়ীর দলিল-পত্র ধরেও টানা হ্যাঁচড়া শুরু করল। সারা অঞ্চলের কাগজে-পত্রে, পোস্টারে, হ্যাণ্ডবিলে ওরা জানিয়ে দিল, আমাদের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত প্রতিষ্ঠা জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করেই। আমরা চোর, আমরা জালিয়াত, আমরা খুনী!

আর এইসব কিছু পরিচালিত হতে লাগল ওই তমালের নেতৃত্বে। ওর উস্কানিতেই গ্লাস ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা বাড়তি বেতনের জন্য ধর্মঘট করে বসল। ফ্লাওয়ার মিলের কুলিগুলো বোনাস চাইল। বাসকর্মীরা আটঘণ্টার বেশী কাজ করতে অস্বীকার করল।

চারদিকের আক্রমণে আমরা কেমন কোণঠাসা হয়ে গেলাম। ফাঁদেপড়া বাঘের মত মণিশঙ্কর চৌধুরী গজরাতে লাগলেন। মামলা মোকদ্দমাগুলো তাঁকে আরো অসুস্থ করে তুলল।

মিউনিসিপ্যালিটির হেরে-যাওয়া চেয়ারম্যান অধর হালদার একদিন ছুটে এলেন, 'কিছু ভাবনা নেই মণিদা, এই মিনিস্ট্রী টঁসল বলে। সব ঠিক হয়ে গেছে। পুলিশ মিলিটারী রেডি। অক্টোবরের তুই তারিখ মুখ্যমন্ত্রী রিজাইন্ করছেন—'

মণিশঙ্কর বললেন, 'শুনে এসেছি। কাল কোলকাতায় মিটিং ছিল।'

অধর হালদার আরো উৎসাহিত হলেন, 'আর কি শুনে এসেছেন বলুন। ওই কম্যুনিস্ট ছোঁড়াগুলো বড্ড তড়পাচ্ছে। আমার ধানকলের দেয়ালে বড়ো বড়ো করে লিখেছে, 'এবার দিনবদলের পালা, পালা রে অধর পালা'! আস্পর্ধা দেখুন দেখি!'

মণিশঙ্কর বললেন, 'লিখুক গে। এখন কিছু বলো না, ওৎ পেতে থাক। ওদের চৌদ্দ শরিকের জোড়াতালি গভরমেণ্ট, আজ না হোক কাল ভাঙ্গবেই। তখন দেখা যাবে।'

কিন্তু সেকেণ্ড অক্টোবর মন্ত্রীসভা ভাঙ্গল না। মুখ্যমন্ত্রী নার্ভাস হয়ে মত পরিবর্তন করলেন। ধুঁকে ধুঁকে আরো কিছু দিন গোঁজা-মিলের সরকার টিকে গেল। বাবা ঘন-ঘন কোলকাতায় যেতে লাগলেন। এখানে ওখানে গোপন মিটিং বসতে লাগল। শলা-পরামর্শ চক্রান্তের সঙ্গে রকমারি গুজব বাতাসে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় জরুরী ফোন এল কোলকাতা থেকে। বাবা ফোন ধরলেন। তারপরই গাড়ী নিয়ে ছুটলেন কোলকাতায়।

অনেক রাতে ফিরে এসে স্যুট খুলতে খুলতে বললেন, 'এভরিথিং সেটেলড্ জয়। এই মিনিস্ট্রি ফল্ করছে। প্রফুল্লটা নতুন চীফ্ মিনিস্টার হচ্ছে। কিছু হামলা হতে পারে, রেডি থেকো!'

এবার সত্যি ভাঙ্গল। রাজ্যপালের এক কলমের খোঁচায় মন্ত্রীদের চাকরি চলে গেল। হরতাল হ'ল। মিটিং মিছিল হ'ল। বোমা পটকা ফাটল। এই শহরেও বিক্ষোভ দেখাল ওরা। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গলাবাজি করল। দোকানপাট বন্ধের ডাক দিল। ওদের দলের একটা মেয়ে ফার্স্ট মুন্সেফ কোর্টের চেয়ার দখল করে প্রফুল্ল ঘোষের বিচার করল এবং বিচারে সরাসরি তাঁর ফাঁসি দিয়ে ফেলল।

আমরা তৈরী ছিলাম। কোর্টের সামনে ওদের মিছিল লক্ষ্য করে গণশা আড়াল থেকে গোটা দুই বোমা ছুঁড়ল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে লাঠি নিয়ে ওদের তেড়ে গেল। তারপর কোর্টের মধ্যে ঢুকে এলোপাথাড়ি লাঠি চালাল, ডজনখানেক গ্রেপ্তার করল। সেই

মেয়েটাকে পুলিশ ধরতে পারল না দেখে গণশা খুব রেগে গিয়ে পুলিশ অফিসারটার নামে খিস্তি করল।

তারপর প্রতিদিন শুধু বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ। এখানে লাঠি, ওখানে গুলি। ট্রাম পুড়ছে, বাস পুড়ছে, ট্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিধানসভা বসতে না বসতেই বাতিল! স্পীকার বিট্রে করেছে। তলে তলে হাত মিলিয়েছে কম্যুনিস্টগুলোর সঙ্গে। বাজেট পাশ করার উপায় রাখে নি। নতুন মন্ত্রীসভা টলমল করছে। কবে ভাঙে ঠিক নেই।

মণিশঙ্কর চৌধুরী আবার কেমন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

আমরা বুঝলাম রাষ্ট্রপতির শাসন আসন্ন। কোনো রকমেই তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। আমাদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি ফেল করেছে। ওই কম্যুনিস্টরাই জিতে যাচ্ছে।

পরের নির্বাচনে মণিশঙ্কর আর দাঁড়াতে চাইলেন না। বললেন, 'লোকের কাছে আমার ইমেজ নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা ইয়ং কাউকে দেখ।'

বললাম, 'এবার আমি দাঁড়াতে চাই।'

'তুমি!' কিছুক্ষণ ভাবলেন মণিশঙ্কর, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'চট্ করে কিছু ডিসিসন্ নিও না। সবাইকে ডাকো। মিটিং কর।'

বাবার গলায় কেমন একটা অসহায়তা ফুটল। এই ফার্স্ট টাইম তিনি নিজের ইচ্ছাকে সবলে ঘোষণা করার পরিবর্তে একটা কমিটির উপর ছেড়ে দিলেন। বাবার ব্যক্তিত্বের ভাঙনটা আমি টের পেলাম। আমার চোখ জ্বলে উঠল। হাতের মুঠো শক্ত হ'ল। একটা প্রবল প্রত্যক্ষ শত্রুর সঙ্গে শেষ লড়াইয়ের জন্য আমি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেলাম।

এবার তমাল দাঁড়াল না। শুনলাম, সংগঠনের কাজে তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। পরিবর্তে আমাদের বাস সার্ভিস ইউনিয়নের সম্পাদক বৃন্দাবন সরকারকে ওরা ক্যাণ্ডিডেট্ করল।

এবং এই মোস্ট অর্ডিনারী মানুষটার কাছে আমি দশ হাজারেরও বেশী ভোটে হারলাম। আমাদের গ্যারেজ থেকে আমাদেরই সমস্ত বাস বের করে, আমাদের ফিলিং স্টেশন থেকে তেল ভরে, আমাদের ব্যাটারি খরচ করে আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে ওরা সারা শহর পরিক্রমা করল। আজ বিশ বছর ধরে আমরা ওদের পুষছি কিন্তু বেইমানের দল তমাল রায় আর জগৎবল্লভের নামে জিন্দাবাদ দিল। আমাদের বাড়ীর সামনে এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'বাস-মালিক হো হুঁসিয়ার, শ্রমিকশ্রেণী হুায় তৈয়ার!'

দরজাজানলা বন্ধঘরে বাবা বললেন, 'আমি জানতাম, তুমি জিততে পারবে না।'

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, 'এখানে একা কি করতে পারি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের সর্বত্র আমরা হেরে ভূত হয়ে গেছি! রেজাল্ট দেখছেন না?'

'হ্যাঁ, বাংলাদেশে আমরা প্রায় মুছে যেতে বসেছি।' গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বাবা চুরুট ধরালেন। তাঁর হাত অল্প কাঁপছিল, 'এভাবে চললে কল-কারখানা জমি-জমা কিছুই রাখতে পারব না আমরা। সব ওরা কেড়ে নেবে।'

আমি বললাম, 'আপনি নতুন কি পথের কথা ভাবছেন?'

বাবা বললেন, 'আমি একা কি ভাবব? সবাই মিলে একটা কিছু করতে হবে। তবে এটা ঠিক, এভাবে চললে কম্যুনিস্ট আক্রমণ রোখা যাবে না। আমাদের থানা-পুলিশ, আইন-আদালত এবং সংসদীয় রীতিনীতিগুলোকে আরো শানিয়ে তুলতে হবে। ওদের হিংসার বিরুদ্ধে আমাদের আরো হিংস্র হতে হবে। সেই বাষট্টি-তেষট্টির মত আবার একটা সিচুয়েশন্ তৈরি করতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমার ওপিনিয়নও তাই। ওই কম্যুনিস্টগুলোকে অনেক বেশী সহ্য করেছি আমরা। আই মীন্ অনেক বেশী প্রশ্রয়

দিয়েছি। এখন লাগাম টেনে ধরা দরকার। এটা আমাদের টিকে থাকার জন্যই জরুরী।'

বাবা আর কিছু না বলে বাঁ হাত গালে ঘষে ঘষে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে লাগলেন। আমি বাইরে বোমা ফাটানোর শব্দ শুনলাম। ওরা এখনো আমার বাড়ীর সামনে নেচে-কুঁদে ভোটে জেতার উল্লাস প্রকাশ করছে।

দ্বিতীয় দফায় ওরা মিনিস্ট্রি গড়ার মাস তিনেক পরে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

গ্লাস-ফ্যাক্টরিতে নিজের চেম্বারে মণিশঙ্কর চৌধুরী ঘেরাও হলেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন মারমুখী ওয়ার্কার দরজার সামনে থেকে দারোয়ানকে মারধর করে সরিয়ে দিয়ে শ্লোগান হাঁকতে হাঁকতে ঘরে ঢুকে পড়ল। তারা ফোনটা ছুঁড়ে মারল, টেবিলের কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলল, পেপারওয়েটটা দিয়ে ঠুকে টেবিলের বড় কাঁচটা টুকরো টুকরো করল। তারপর মণিশঙ্করের তামাকের বাক্স আর পাইপটা মাটিতে আছড়ে ফেলে কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি করে চেঁচাতে লাগল, 'মালিকের ধাপ্পাবাজি—চলবে না, চলবে না!'

বেতনবৃদ্ধি, বোনাস, ওভারটাইম, সস্তা ক্যান্টিন—এই সব মিলিয়ে দশদফা দাবি ছিল ওদের। ওরা সশস্ত্র অবস্থায় ঘরে ঢুকেছিল। একজনের হাতে বাবা একটা ভোজালী দেখেছিলেন।

কারখানার কেউ অন্য একটা ফোন থেকে বাড়ীতে খবর দিয়েছিল। শোনা মাত্র ভোলা, বংশী, পালুদের ইন্‌ফর্ম করে আমি স্কুটার নিয়ে ছুটে গেলাম। আমার জীবনের ঝুঁকি ছিল। কিন্তু আমার বাবা আক্রান্ত, শয়তানগুলো তাঁকে ঘিরে রেখেছে, এ কথা ভেবে ওই রিস্কটুকু নিতেই হল। যাবার আগে থানায় একটা ফোন করলাম। কিন্তু এটা করা না করা তখন একই ব্যাপার। ওদের রাজত্বে পুলিশ বসে বসে মাইনে খায়। ওরা ডাকলে একটু নড়াচড়া করে। কিন্তু আমরা ডাকলে চড়া গলায়

জবাব দেয়, হোম ডিপার্টমেণ্টকে জানাচ্ছি। ওখান থেকে অর্ডার পেলে যাব।'

তারপর গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে, 'কি করব স্যার, বোঝেন তো সবই। আমরা হলাম হুকুমের গোলাম। হুকুম না মানলে চাকরি ধরে টান দেয়। ডিপার্টমেণ্টটা যে স্যার বাঘের হাতে—'

বাঘ না খেঁকশিয়াল। এই ক'মাসেই রাজ্য জুড়ে ভূতের কীর্তন। এখানে জমি লুঠ, ওখানে ভেড়ী লুঠ। রাস্তা ঘাটে চুরি ছিনতাই রাহাজানি। সন্ধ্যে হলে মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে না। ফি-রাতে ডাকাতি আর খুন-খারাপি। কোলকাতায় নাইটশো সিনেমা পর্যন্ত বন্ধ হতে চলেছে। দেখেশুনে মনে হয় না রাজ্যে ল' এণ্ড অর্ডার বলতে কিছু আছে। এ ভাবে আর কিছুদিন চললে গঙ্গা দিয়ে মেকঙের মতো হাজার হাজার ডেড্‌বডি ভেসে যাবে। পাড়ে দাঁড়িয়ে লালঝাণ্ডাওয়ালারা মড়ার গন্ধ শুঁকে শুঁকে শকুনের হাসি হাসবে। হরিবল্‌!

কারখানার গেটের সামনে একপাল মানুষ। আঁকাবাঁকা অক্ষরে নানা পোস্টার। বাঁশের কঞ্চিতে একটা লালফ্ল্যাগ উড়ছে। আর রাস্তার এ-পাশে উড়েদের চা'য়ের দোকানে তমাল আর ওর ভাইটা পা ছড়িয়ে বসে লেকচার ঝাড়ছে।

দ্রুত স্কুটার চালিয়ে কারখানার গেটের সামনে এসে ব্রেক কষা মাত্র কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যস্‌, আ গিয়া বাপকা বেটা!'

অন্যেরা বাতাসে হাত ঝেঁকে শ্লোগান দিয়ে উঠল।

আমি খুব ডেস্‌পারেট্‌ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বললাম, 'গেট খোল! আমি ভেতরে যাব!'

একটা আধবুড়ো লোক, হ্যাঁ, একবাল ওর নাম, গ্লাসফ্যাক্টরির ইউনিয়নের একটা পুরনো দাগী পাণ্ডা, ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের সময় পাকিস্থানী চর বলে আমরা ওর চাকরি খতম করে জেলে ঢুকিয়েছিলাম, আবার কি ভাবে যেন কাজ পেয়ে গেছে, একেবারে

আমার মুখের কাছে এসে হাত নেড়ে বলল, 'আপনার হুকুমে আর এ গেট খুলবে না। গাড়ী ঘুরিয়ে সরে পড়ুন!'

আমি ব্যালান্স হারিয়ে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ইউ স্কাউণ্ড্রেল! তফাৎ যাও!'

কিন্তু আমার রাগ দেখে লোকগুলো হেসে উঠল। হ্যাঁ, আমারই কারখানার ষাট সত্তর একশ টাকা মাইনের কুলিমজুরগুলো! ওদের রকমারি হাসিটা আমাকে ঘিরে ঘিরে যেন লাফাতে লাগল। যেন আমি একটা মাছ কি ইঁদুর, একপাল ধাড়ি বেড়াল থাবা ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাকে নিয়ে খেলা করছে। ও ভাবে না হেসে ওরা যদি সরাসরি আমাকে আক্রমণ করত আমি বেশী খুশি হতাম!

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে আমি লোকগুলোর মুখ দেখছি, এমন সময় ভারি গলায় কেউ ডাকল, 'কমরেডস্—'

অনেকগুলো হাসি থেমে গেল।

আবার শুনলাম, 'কমরেডস্—'

সব হাসিগুলিই থামল।

আমি আমার সামনেই তমালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার পাশে অশোক।

এতক্ষণে আমার একটু ভয় হ'ল। ওদের দুই ভাইয়ের হাত খালি কিনা খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য করলাম। তমালের কাঁধে ঝোলানো লম্বা থলিটায় কি থাকতে পারে আঁচ করার চেষ্টা করলাম। ভোলা গণেশদের কেউ এসে পৌঁছল কিনা দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

এমন সময় তমাল বলল, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না মিঃ চৌধুরী, তাতে সকলেরই অসুবিধা হবে!'

আমি ওর মুখেও এক ধরণের চাপা হিংস্র হাসি লক্ষ্য করলাম। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বললাম, 'আমি ভেতরে ঢুকব।'

তমাল বলল, 'ভেতরে আপনার বাবার সঙ্গে ইউনিয়নের আলোচনা চলছে। আপনি গিয়ে কি করবেন?'

'আমার কারখানায় ঢুকে আমি কি করব, আপনারা তার কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন না।'

'পারি বোধহয়। কারণ প্রচলিত আইনে মালিক আপনারা হলেও আসলে ওটা শ্রমিকদের সম্পত্তি!'

'আপনি এ ফ্যাক্টরির ওয়ার্কার ন'ন। ওদের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

'জলের সঙ্গে মাছের যে সম্পর্ক! কিছু বুঝলেন?'

'আই ডাউট্, আপনার নির্দেশেই ভিতরে গুণ্ডাবাজি চলছে।'

'গুণ্ডাবাজি শব্দটা আপত্তিকর। বলুন আন্দোলন চলছে কিংবা বিক্ষোভ।'

'আপনারা জোর করে আমার বাবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন।'

'বাবার ঘর কেন বলছেন? বলুন কারখানা-মালিকের অফিসঘর। প্রয়োজন হলে শ্রমিকরা ওখানে ঢুকতে পারে।'

'তারা ফোন ভাঙছে, ফার্নিচার ভাঙছে, ঘর তছনছ করছে।'

'না, সব ঠিক আছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'খুব স্বাভাবিক। কোন মালিকই শ্রমিকের কথায় বিশ্বাস করে না।'

হঠাৎ অশোকের দিকে চোখ পড়তে আমি চমকে উঠলাম। ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন দেখছে। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। চোখ জ্বল জ্বল করছে। ওকি আমাকে আক্রমণ করবে? না, একেবারে খালি হাতে আসা আমার উচিত হয় নি।

কিন্তু অশোক আমার দিকে না এগিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল। তারপর দালের লোকগুলোকে ফিসফিস করে কি যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোটা লোক চায়ের দোকানের পেছনে টালির বাড়ির দিকে ছুটে গেল। মিনিট দুই পরে ধারালো বর্শা আর লাঠি হাতে আবার ছুটে এসে কারখানার গেটের সামনে সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে গলাফাটিয়ে

শ্লোগান দিয়ে উঠল। তার জবাব এল কারখানার ভেতর থেকে, আরো জোরে, আরো গমগমিয়ে। বাবার কথা চিন্তা করে আমার ঘাড়ে গলায় ঘাম জমে উঠল। একটু ঘুরে তাকাতে দেখলাম ভোলা বংশী সুদামেরা এগিয়ে আসছে। ওদের হাতে কিছু আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না! কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হলাম, বোমা টোমা কিছু ওরা এনেছেই। বিশেষ করে ভোলা যখন ঢিলেঢালা কোটটা গায়ে দিয়ে আছে—তখন পাইপগানটাও তার ভেতরে আছে। আমি এবার অশোকের তৎপরতা এবং ওদের লাঠি বল্লম নিয়ে আসার অর্থ বুঝলাম।

ওরা আরো কাছে এগিয়ে আসতে অশোকরা যেন ছটফট করে উঠল। বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ওদের বর্শাগুলো ঝকমক করতে লাগল। তমাল চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'মিঃ চৌধুরী, হাঙ্গামা বাধাবেন না, ওতে সুবিধে হবে না। মনে রাখবেন, এখন আর পুলিশের গাড়ী আপনাদের পেছনে নেই!'

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'আমরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় অভ্যস্ত নই, ওতে শুনেছি আপনারাই এক্সপার্ট!'

'ইতিহাস তাই বলে বুঝি?'

তমালের মুখে সেই হিংস্র জান্তব হাসিটা ঝিকমিক করে উঠল। সেই হাসিতে আমার রক্তে যেন জ্বালা ধরে গেল। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে ভোলার কাছ থেকে পাইপগানটা কেড়ে নিই। তারপর ক্রমাগত ট্রিগার টেনে তমালের সমস্ত বুকটা ঝাঁঝরা করে দিই।

কিন্তু ওরা দলে ভারি। অনেকগুলো লাঠি বর্শা নিয়ে তৈরী হয়ে আছে। উপরন্তু পুলিশ এখন ওদের আণ্ডারে। আমরা নিরুপায়, দুর্বল! আমি ভোলাদের দিকে তাকালাম। উদ্যত বর্শার সামনে ওরাও ঢোঁক গিলছে। সুদামের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে উঠেছে। কারখানার দরজা বন্ধ। তার সামনে ঝাণ্ডা হাতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাটার মিস্ত্রী একবাল, সেই পাকিস্থানী চরটা! আমার বাবা মণিশঙ্কর ভেতরে বন্দী, আমার নিজের কারখানায় আমাকে ওরা ঢুকতে দেবে না!

একসময় সুদাম কানের কাছে এসে বলল, 'জয়দা, এখনো কোর্ট খোলা আছে। একটা অর্ডার বের করে আনলে পুলিশ আসবে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'হতে পারে। তুমি এক্ষুণি বার লাইব্রেরীতে বিশ্বাস কিংবা সুমন্তবাবুর কাছে চলে যাও। কুইক্—'

সুদাম বলল, 'স্কুটারটা নিয়ে আপনিও চলুন। ভোলারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাক—'

কিন্তু অনেক তাড়াহুড়ো করেও সেদিন কোর্টের অর্ডার বের করা গেল না। রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত গ্লাস ফ্যাক্টরির ভেতর আবদ্ধ থাকলেন মণিশঙ্কর। শেষপর্যন্ত দশদফার মধ্যে প্রধান সাতদফা দাবি মেনে নিয়ে চুক্তিপত্রে সই করে ছাড়া পেলেন। গভীর রাতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত বাবা চোখমুখ ভয়ঙ্কর রকমের লাল করে যখন বাড়ী ফিরলেন এবং কিছু না খেয়েই পুরো একবোতল হুইস্কি গলায় ঢেলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন, তখন সেই মধ্যরাত্রে কারখানার শ্রমিকেরা মশাল জ্বালিয়ে ঢোল বাজিয়ে শহর পরিক্রমা শুরু করল। সেই মিছিল আমাদের বাড়ীর সামনে আসতে বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'স্টপ ইট জয়, স্টপ ইট। ওদের থামতে বল, নইলে আমি গুলি করব।'

আমি বাবার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে আস্তে বললাম, 'ওরা তো ভেড়ার পাল। চেঁচাতে বললে চেঁচায়, থামতে বললে থামে। আসল এনিমি ওই তমাল, ওই অশোক—'

আমার ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা থমথমে গলার শব্দ থেকে মণিশঙ্কর কিছু আঁচ করলেন। রক্তাভ চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখ দেখলেন। ধীরে ধীরে তাঁর উত্তেজনা কমে আসতে লাগল। বললেন, 'আই নো, জয়! আমি জানি। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। সময় আমাদের অনুকূলে নয়। অপেক্ষা কর। ওয়েট এণ্ড ওয়াচ—'

সেই ঘটনার পর থেকে বাবার শরীর দ্রুত ভেঙ্গে পড়তে

লাগল। ব্লাডপ্রেসারের সেকেণ্ডস্ট্রোকে একদিন বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ক'দিন ধরে যমেমানুষে টানাটানি চলল। কোলকাতা থেকে বড় বড় ডাক্তার এল। নার্স এল। বাড়ীটা ক'দিন হাসপাতাল হয়ে থাকল। অসম্ভব মনের জোরে ধাক্কাটা সামলে উঠলেন মণিশঙ্কর। কিন্তু আগের কর্মক্ষমতা আর ফিরে পেলেন না। আমি আমার শয্যাশায়ী বাবার মুখে মৃত্যুর কালো ছায়া দেখলাম! আমার বনেদী সামন্ততান্ত্রিক রক্তে প্রতিশোধের ইচ্ছা আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

মনে হ'ল, আমার বাবাকে ওরা হত্যা করছে। ওই কম্যুনিস্ট গুণ্ডারা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক হত্যা। প্রতিদিন তিলে তিলে, দণ্ডে দণ্ডে, ইঞ্চ্ বাই ইঞ্চ্। ছুরি বোমা পিস্তল দিয়ে মার্ডার করার চেয়েও যা অনেক বেশী নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক। আর আমার চোখের সামনেই প্রতিদিন এই হত্যাকাণ্ড ঘটছে। প্রতিদিনই বাবার আয়ু একটু একটু করে কমে যাচ্ছে।

সেই পিতৃহন্তারকদের আমি কি ক্ষমা করব? কখনো ক্ষমা করতে পারি?

আরো ক'টা মাস অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কোণঠাসা অবস্থায় আমাদের কাটাতে হ'ল। এর মধ্যে কো-অপারেটিভ স্টোরের মামলাটায় আমাদের হার হ'ল। আমরা সেটাকে হাইকোর্টে নিয়ে গেলাম। বাস-কর্মীদের আরো একদফা বেতন বাড়াতে হ'ল। গ্লাস-ফ্যাক্টরির সমস্ত ছাঁটাই কর্মীকে কাজে নিতে হ'ল। ফ্লাওয়ার মিল দুটোতে চীপ্ ক্যান্টিন খুলতে হ'ল।

সব জায়গায় হারতে হারতে আর মার খেতে খেতে হঠাৎ একদিন শুনলাম, নিজের মন্ত্রীসভা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চিৎকার করে বলছেন, 'এ সরকার অসভ্য, বর্বর! এ সরকার চলতে পারে না!' শোনামাত্র বাবা বিছানায় সোজা হয়ে বসলেন। আমি গাড়ী নিয়ে ছুটলাম কোলকাতায়। কার্জন পার্কে মুখ্যমন্ত্রী অনশন শুরু করেছেন। কাশীনাথ

বিভূতিদের সঙ্গে নিয়ে আমরা মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়া দিয়ে এলাম।

সমস্ত দেশটা অসম্ভব অরাজকতার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে মার্চের মাঝামাঝি এসে ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল! আগের দোসরা অক্টোবর উপযুক্ত সাহসের অভাবে মুখ্যমন্ত্রী যা করতে পারেন নি —এবার তা করলেন। মন্ত্রীসভার পতন ঘটল।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওরা হরতাল ডাকল। কিন্তু এবার হরতালের বিরুদ্ধে শুধু আমরা নই, আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল অনেক বন্ধুপার্টি। উল্টে ওরাই এবার দলছুট হয়ে একা পড়ে গেল।

ওরা হরতাল করে গদী হারানোর শোক প্রকাশ করল। কিন্তু আমরা বাড়ীর সমস্ত আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলাম। সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিলাম। মালীকে বললাম, বাবার ঘরে ফ্লাওয়ারভাসে টাটকাফুল সাজিয়ে দিতে। চাকরটাকে বললাম, বাজার খুঁজে মুর্গী আনতে। অনেকদিন পরে বাবা তিনতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় এসে বসলেন। পাম্‌গাছের উঁচুমাথার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আজ খুব সুস্থ বোধ করছি জয়। রাত্রে ভাত খাব। আমাকে একটু বেশী করে মাংস দিতে বলো।'

আমি খুব ধীরে ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় বাবার কাছে কথাটা রাখলাম।

একটু চমকে মণিশঙ্কর চৌধুরী আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি আবার বললাম, 'হ্যাঁ, এখনই উপযুক্ত সময়। সব দলই ওদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে। জেলায় জেলায় সি-আর-পি নেমে গেছে। ওরা এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।'

গভীর চিন্তান্বিত মুখে মণিশঙ্কর বললেন, 'শুধু তমালকে মার্ডার করে কি লাভ?'

আমি বললাম, 'অনেক লাভ। ও-ই এখন ওদের ব্রেন্। ওকে সরাতে পারলে—'

'তুমি কাকে দিয়ে সরাতে চাও?'

'ধরুন, ভোলাকে দিয়ে?'

'আস্ত গবেট! সেবার সাক্ষী দিতে গিয়ে কি করেছিল মনে নেই?'

'তাহলে গণেশ—'

—'ছিঁচকে চোর। কারো মাথায় লাঠি বসাতে ওর হাত কাঁপে। সেবার একনং ফ্লাওয়ার মিলটায় যখন স্ট্রাইক হ'ল—'

'তাহলে বাইরের কাউকে আনব? বিশ্বস্ত কেউ?'

'না, এ ব্যাপারে কেউ বিশ্বস্ত নয়। পুলিশের কথা ভাবছি না, কিন্তু ওদের হাতে ধরা পড়লে মারের চোটে সব বার করে নেবে। কম্যুনিস্টগুলোকে তুমি চেনো না।'

আমি একরকম মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, 'যদি নিজেই দায়িত্ব নিই?'

'তুমি?' আবার একটু চমকে কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকলেন মণিশঙ্কর। বয়সে ও দুশ্চিন্তায় তাঁর ভরাট মুখে এখন অজস্র গর্ত। টকটকে রং তামাটে হয়ে উঠেছে। চোখের ভাঁজে কালি। আস্তে আস্তে বললেন, 'পারবে?'

সেদিন গ্লাস-ফ্যাক্টরির সামনে সেই অপমানের কথা মনে করে বললাম, 'খুব পারব! এটা এমন কিছু শক্ত কাজ না।'

বাবা বললেন, 'কিন্তু খুব সাবধানে। খুব সতর্ক হয়ে। দে আর ভেরি ডেঞ্জারাস। রক্তখেকোর দল সব।'

'আমরাও কিছু কম নই!'

'আমার কাছে বিনা লাইসেন্সের একটা রিভলবার আছে। এক জন আমেরিকান সেইলরের কাছ থেকে পেয়েছিলাম—'

'আমাকে দিন।'

'আলমারিতে আছে। কিন্তু আবার বলছি, খুব সাবধানে—'

মণিশঙ্কর চৌধুরী তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি আমার রোগাক্রান্ত বাবার জীর্ণক্লান্ত মুখে, অনেকদিন পরে, একধরণের অদ্ভুত তেজ ও দীপ্তি দেখলাম। সেই পুরনো দিনের মত। এই তেজ ও দীপ্তি আমাকে সাহস দিল, শক্তি দিল। মণিশঙ্কর চৌধুরীর অনেক দুঃসাহসিক ঘটনার কথা স্মরণ করে মনে মনে বলে উঠলাম, 'বাঘের বাচ্চা যদি বাঘ না হইনু, কি হইনু তবে!'

আর এই ঘটনাটুকুই প্রমাণ করল কম্যুনিস্টদের উপর, বিশেষত তমালের উপর, বাবা কি পরিমাণে ক্ষিপ্ত। তাঁর আত্মমর্যাদা, বংশ মর্যাদা, তাঁর মানসম্ভ্রম প্রতিপত্তি কি নিদারুণ শকড্‌। তা না হলে আমি তাঁর একমাত্র সন্তান—এতবড় রিস্ক তিনি নিতেন না।

কিন্তু পুত্রস্নেহ তাঁকে অন্ধ করতে পারল না। এসব স্নেহমমতার ব্যাপারে বাবা চিরকালই অত্যন্ত র‍্যাশনাল। অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নই তাঁর কাছে বড়। আর আমাদের অস্তিত্ব মানেই জমি, কারখানা, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। শুনেছি, জমিরক্ষার তাগিদে বাবা নিজের হাতে দুটো কৃষককে গুলি করে মেরেছিলেন। কারখানার ইউনিয়ন ভাঙ্গার জন্য একবার বাইরে থেকে গুণ্ডা আমদানি করেছিলেন। ভোট না দেওয়ার সন্দেহে ফুলতলির একডজন মুসলমানের চালাঘরে আগুন লাগানোর হুকুম দিয়েছিলেন। তাতে দেড় না আড়াই বছর বয়সের একটা বাচ্চা পুড়ে-টুড়ে নাকি তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল!

আমি অবশ্য নিজের হাতে কখনো খুন করার সুযোগ পাই নি। কিন্তু চোখের সামনে কিছু খুন হতে দেখেছি। আমার ল'-ক্লাসের বন্ধু বিভূতি, কাশীনাথ আর সমর এ ব্যাপারে এক্সপার্ট ছিল। বাষট্টি সালে ওরা পাড়ার একটা চীনের দালালকে স্রেফ লাঠি দিয়ে পিটিয়েই নাকি শেষ করেছিল! সেইসময় একদিন ইউনিভার্সিটিতে আমি তমালকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর সবাই মিলে ঘিরে ধরেছিলাম ওকে। কাশীনাথ ছোরা টেনে বের করেছিল। কিন্তু ওই অলকেশ রাস্কেলটা এমন মড়াকান্না কেঁদে উঠল যে আমরা হকচকিয়ে গেলাম। নাহলে ওই দিনই তো ওর মরার কথা।

হ্যাঁ, কপালের জোর খুব। ছেষট্টিসালে গুলি খেয়েও বেঁচে গেল রাস্কেলটা! মরল না। পিঠে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিরে এসে আরো বেশী হিরো বনে গেল। তারপর সেদিন কালীতলাতেও আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। বোমাটা মাথায় না লেগে এক বাড়ীর জানালায় গিয়ে পড়ল। কপাল, সিম্পলি কপাল। এরি জোরে উজবুকগুলো ভিয়েৎনামে টিঁকে যাচ্ছে—

কিন্তু এবার লাস্ট এণ্ড ফাইন্যাল এটেম্পট্। হয় ও মরবে না হয় আমি। হয় এসপার না হয় ওসপার। শয়তানের হাত অনেক লম্বা হয়েছে। আর বাড়তে দেওয়া যায় না। নাউ লেট্ দি গেম্ স্টার্ট!

না, অসহ্য! শহরসুদ্ধু লোক এমন চিৎকার করছে কেন? ওদের সকলেরই কি মা বাবা ভাই বোন মারা গেল! নাকি তমালের ডেড্‌বডিটা এখন শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে? এত তাড়াতাড়ি? এখন তো মোটে চারটে। পূর্বদিকটা ফর্সা হয়ে আসছে। চাঁদটা কেমন গলে যাচ্ছে। আমার যেন একটু শীত শীত করছে। ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য? না নার্ভাসনেস্? হতে পারে, ওদের মড়াকান্না-ধরণের চিৎকারটা আমার মনে এই শীতলভাব সৃষ্টি করছে। এমন গলাফাটিয়ে চেঁচায় ওরা! বুকের নিশ্বাস আটকে যায়। ওরা তো শুনি খেতে পায় না। প্রলেটারিয়েট! তাহলে খালিপেট থেকে এমন আওয়াজ বেরয় কি করে? আমি কি আরো একগাড়ী পুলিশ পাঠাতে বলব? অথবা থানায় ফোন করে জেনে নেব কি হচ্ছে ওদিকে?

মূর্খের মত ওরা নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীটা আক্রমণ করতে আসবে না? কেননা আমিই যে মার্ডারার তার কোনো প্রমাণ নেই। অনেকদিন ওৎ পেতে আজ ঠিক সেই সোনারপুরের রাস্তায়, নিরিবিলি নির্জন বাঁকটার কাছে আমি ওকে পেয়েছিলাম। খুব

নিঃশব্দে নিপুণ লক্ষে কাজটা শেষ করেছি। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার থেকে পাতাপড়ার মত একটু শব্দ উঠেছিল মাত্র। ব্যাস্, অলক্লীয়ার। আমি স্কুটার হাঁকিয়ে ফিরে এসেছি। ওদিকটায় আমাদের দুইনম্বর ফ্লাওয়ারমিল। এভাবে প্রায়ই যাতায়াত করি আমি। সন্দেহ করার কি আছে ?

তবু এ বাড়ীটা ওরা যদি আক্রমণ করতে আসে—আমি তাহলে প্রকাশ্যেই বন্দুক ধরব। ভোলা পাইপগান চালাবে। বাকিরা বোমা-টোমা! আর পুলিশ তো থাকলই। এক মিনিটে দেড়ডজন লাশ নামিয়ে ফেলব রাস্তায়। অসঙ্কোচে, নির্বিবাদে।

না, ওই স্কাউণ্ড্রেলগুলোকে মারতে আমার বিবেকে একটুও অনুশোচনা হয় না। শত্রুহত্যায় পাপ কি! বিশেষত সে যদি আমার পিতৃঘাতী হয়! আমার ঐশ্বর্য, অস্তিত্ব, নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হয়। বাবা তো অনায়াসেই দুটো চাষাকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন—

আমার মৃত্যু শয্যাশায়ী বাবা অনেকদিন পরে আজ তৃপ্তি করে ঘুমুচ্ছেন।

অন্তত আমার তাই ধারণা।

আমি ফিরে এসেই রিপোর্ট দিয়েছি তাঁকে। খুশিতে উত্তেজনায় রোগের কথা বয়সের কথা ভুলে বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসেছিলেন তিনি। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছিল, ঠোঁট কাঁপছিল। খুব অস্থির ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি করেছ ? তুমি ?'

'হ্যাঁ।'

'নিজের হাতে ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কে ছিল সঙ্গে ?'

'কেউ না। আমি একা।'

'ভাল করে দেখেছ ? আবার বেঁচে উঠবে না তো ?'

'না।'

'কিছু বিশ্বাস নেই। ওরা শয়তানের বাচ্চা। গুলি-গোলায় ওদের কিছু হয় না। নর্থ ভিয়েৎনামে দেখছ না? লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলেও কব্জা করা যাচ্ছে না। তুমি আবার খবর নাও।'

'আচ্ছা।'

'থানায় ফোন কর। বল, আমাদের বাড়ী আক্রান্ত হতে পারে।'

'একটু পরে, সিচুয়েশন বুঝে করব।'

'আমাদের লোকদের খবর দাও।'

'ওরা এসে যাবে।'

'ঠিক আছে। তুমি ক'দিন সাবধানে চলাফেরা করো।'

'আচ্ছা।'

খুব সুখে, আরামে আলস্যে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন মণিশঙ্কর। ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে একটা চুরুট খেতে চাইলেন। আমি বারণ করলাম না।

চুরুট ধরানোর পর বাবার মুখটা আরো বেশী গম্ভীর দেখাল। যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করছেন তিনি। তাঁর চওড়া কপালে ভাঁজ পড়েছে। চোয়ালের হাড় শক্ত দেখাচ্ছে। বাঁ হাতটা মুঠো পাকিয়ে পরমুহূর্তে খুলে ফেলছেন। মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে চুরুটটা কামড়ে ধরছেন।

একটু পরে খুব আস্তে আস্তে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'ডোণ্ট গেট্ নার্ভাস, জয়। সংঘর্ষের এই সবে শুরু। এতদিন গিয়েছে মিটিং-মিছিল, কুৎসা আর ভোটবাজিতে। এখানে ওখানে একটু হাতাহাতি মারামারি হয়েছে। দু'দশটা বোম ফেটেছে কিংবা দু'চারখানা ট্রামবাস পুড়েছে। পুলিশ গুলি ছুঁড়লে ওরা রাগ করে হরতাল করেছে অথবা ঘটা করে কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। নাউ দি রিয়্যাল ব্যাটল্ হ্যাজ্ স্টার্টেড্ এণ্ড ইট্ ইজ এ ব্যাটল্ ফর এক্সিজ্‌টেন্স।'

ইয়েস মাই ফাদার, আই নো!

আমি জানি আজ কুশপুত্তলিকাদাহের দিন চলে গেছে। আজ রাজনীতি বড় কর্কশ, বড় কঠিন, বড় কঠোর। আজ বাংলাদেশের এখানে ওখানে আইনভাঙার ভয়ঙ্করখেলা শুরু হয়ে গেছে। ভোটের লড়াইয়ের আড়ালে ক্ষমতাদখলের লড়াই চলছে। শত্রুর হাতে বর্শা বল্লম বন্দুক উঠেছে। ঘরে-ঘরে শয়তানের বাচ্চারা শেষ আঘাত হানার চক্রান্ত করছে। এ দেশের রাজনীতির আকাশে এখন রক্তের রং, বাতাসে ঝাঁঝালো বারুদের গন্ধ।

আজ আমরা আর একতরফা আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারি না। রাষ্ট্র-ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও না। আজ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিআক্রমণ আসবে। অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ। রক্ত নিলে আজ কিছু রক্ত দিতেও হবে।

অলরাইট্, আমরাও তার জন্য প্রস্তুত! পৃথিবীর মানচিত্রে শুধু ভিয়েৎনাম নেই, ইন্দোনেশিয়াও আছে! লক্ষ লক্ষ কম্যুনিস্টের রক্তে হোলি খেলা হয়েছে সে দেশে। লেনিনের বাচ্চারা ঝাড়ে বংশে নির্মূল হয়েছে। সেই মহান ইন্দোনেশিয়ার কথা আমরা মনে রাখব।

এখনও রাষ্ট্র আমাদের, সৈন্য আমাদের, আইন-আদালত থানা-পুলিশ সব আমাদের। অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্বও আমাদের। যে-কোনো মূল্যে আমরা তাকে রক্ষা করব। আমার মাদারল্যাণ্ডকে ভিয়েৎনাম করার আগে আমরা তাকে ইন্দোনেশিয়া বানিয়ে তুলব!

ইয়েস মাই ফাদার, দি রিয়্যাল ব্যাটল্ হ্যাজ স্টার্টেড্ এণ্ড ইট্ ইজ এ ব্যাটল্ ফর এক্সিজ্টেন্স!

[অলকেশ]

তমালের খুন হওয়ার খবর খুব দ্রুত এই শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত দ্রুত যে তাকে ঘূর্ণীঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কে কাকে প্রথম বলেছিল বা কে প্রথম ওই দৃশ্যটা দেখেছিল এখন আর জানার উপায় নেই। শুধু মনে করা চলে, রাত এগারোটার একটু আগে বা পরে এই শহরের দক্ষিণ অংশে মণিশঙ্করদের তুইনম্বর ময়দাকলের কাছাকাছি রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংটার ধার ঘেঁষে একসঙ্গে অনেকমানুষ যেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর সেই চিৎকারটাই ক্রমে ক্রমে দ্রুততালে কালবোশেখী ঝড়ের মত এই শহরটাকে ঘিরে ঘিরে পাক দিয়ে দিয়ে এখানে ওখানে থমকে গিয়ে সহসা কোথাও প্রবল গর্জনে ফেটে পড়ছিল।

আমাদের বাড়ীটা শহরের উপান্তে মুচিপাড়ার কাছাকাছি বলে আমি প্রথমটায় কিছু বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেলাম। স্কুলের কাগজপত্র রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ানোমাত্র মা আর নন্দিতাও ছুটে এল।

মা ভয় পেয়ে বললেন, 'কারা চেঁচাচ্ছে খোকা, কি হয়েছে?'

নন্দিতা বলল, 'নিশ্চয়ই গ্লাসফ্যাক্টরি তালাবন্ধ করেছে মণিশঙ্কররা। ওদিক থেকেই গোলমাল আসছে।'

আমি কিছু বলার আগেই সুভাষকলোনী থেকে হিমানীশ ছুটে এল, 'শীগগির পার্টি অফিসে চলুন, তমালদা খুন হয়েছে।'

'খুন হয়েছে! কে বলল?' আমি অস্থির গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম। নন্দিতা অস্ফুটে একটা আর্তনাদ করল। মা-ও কি যেন একটা বললেন।

আমি আর কোনোদিকে না তাকিয়ে, কিছু না শুনে, 'নন্দিকে ঘরে আটকে রেখো মা' বলতে বলতে হিমানীশের সঙ্গে সুভাষকলোনীর দিকে ছুটে গেলাম। আমার হাত পা সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছিল। আমার নিশ্বাস আটকে আসছিল।

হিমানীশের কথায় অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। তবু তমাল আর বেঁচে নেই, ও খুন হয়েছে—এ কথা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

এই ক'ঘণ্টা আগে আজ দুপুরেও সে আমাদের মধ্যে ছিল।

একটা জরুরী মিটিং ছিল পার্টিঅফিসে। তমাল হরিপদদা ছিল। অশোক শিখা ছিল। বাসইউনিয়নের বৃন্দাবন, গ্লাস ফ্যাক্টরির একবাল, রাণীহাট-নোয়াপাড়া-শালবনীর কিছু কৃষককমরেডও ছিল।

রাষ্ট্রপতির শাসনে শহরে গ্রামে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। একদিন যারা বামপন্থী ছিল তারাও মুখোশ খুলে ফেলে সরাসরি ওদের দলে ভিড়েছে। কৃষকের উপর, শ্রমিকের উপর চারদিক থেকে আঘাত এসে পড়ছে।

প্রত্যহ তার রিপোর্ট আসছে পার্টিঅফিসে। রোজই আলোচনা পর্যালোচনার জন্য মিটিং বসছে। অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য নতুন নতুন কৌশল স্থির করতে হচ্ছে। কমরেডদের প্রতিরোধের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে হচ্ছে।

আজকের মিটিং-এ জগৎদা ছিলেন প্রধান বক্তা। তাঁর বলা হয়ে গেলে তমাল সংক্ষেপে তার বক্তব্য রাখছিল। ওর সেই স্বভাবসুলভ চাপাগলায়, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুয়ের কাছটা চেপে ধরে, কটাচোখের মণিতে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বেলে।

তমাল বলছিল, আমরা শুনছিলাম—'কমরেডস্, যা রিপোর্ট

আসছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, এবারের আক্রমণের রূপটা ক্রমে আরো ভয়ানক হবে। ওরা দিল্লী থেকে আরো পুলিশ আনবে, গ্রামে গ্রামে সি-আর-পির ক্যাম্প বসাবে, দরকার হলে মিলিটারিও নামাবে। যুক্তফ্রণ্টকে হাতিয়ার করে আমাদের শ্রমিককৃষকেরা যে-সমস্ত অধিকার অর্জন করেছে তার সবটুকুই ওরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে রিপোর্ট এসেছে, নোয়াপাড়ার কৃষকেরা যে-মেছোঘেরি দখল ক'রে ফসল বুনেছিল, আবার তাতে বাঁধ দিয়ে জল ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। রণপুর কৃষকসমিতির তিন জন কর্মীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। রাণীহাটেও গোলমাল চলছে। এদিকে মণিশঙ্কর ছাঁটাইয়ের লিস্ট তৈরী করে ফেলেছে। কমরেড্ একবাল ওখানে বসে আছেন, তাকে আজ সকালে পুলিশ এসে শাসিয়ে গেছে। কমরেড বৃন্দাবনকে গ্রেপ্তার করানোর জন্য চক্রান্ত সুরু হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে সংশোধনবাদীরা মণিশঙ্করের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।....তাই জগৎদা যা বললেন আমি আবার তা মনে করিয়ে দিচ্ছি, সামনে আমাদের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। ক্রমাগতই আক্রমণ আসতে থাকবে। তাকে প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে হবে। নোয়াপাড়া রাণীহাট শালবনীর কৃষকেরা যে বেনামজমি দখল নিয়ে ধান পুঁতেছে—সেই ধান যাতে জোতদারের গোলায় না যায় তা দেখতে হবে। কলেকারখানায় মণিশঙ্করেরা যাতে ছাঁটাই করতে না পারে তার জন্য ইউনিয়নকর্মীদের আরো সংগঠিত, আরো সতর্ক হতে হবে। শোধনবাদী-দালালদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে মধ্যবর্তীনির্বাচন ছিনিয়ে আনতে হবে।....একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন কমরেড, সাতষট্টি সাল আর সত্তর সাল এক নয়। শ্রেণীসংগ্রাম এখন তীব্রতর হয়েছে। এই বাংলার লক্ষ-কোটি মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের মানুষ, গোলামির মনোভাব ঝেড়ে ফেলে নতুন শক্তি নতুন সাহসে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে

এসেছে। আমরা গর্বিত যে আমাদের পার্টিই এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এখন এই জাগ্রত শক্তিকে আরো সংহত করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কমরেড, গ্রামে-শহরে ঘুরে জোট বাঁধুন, তৈরী থাকুন, সতর্ক থাকুন। সামনে আরো বড় লড়াই—'

শেষের দিকে তমালের গলায় একধরণের আবেগ ফুটে উঠেছিল। সেই আবেগে মাখামাখি হয়ে ওর কালোমুখটা অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আমরা সবাই ওর দিকে তাকিয়েছিলাম।

মিটিং শেষ হতে বিকাল চারটে বাজল। তারপর অশোক-বৃন্দাবনদের কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে হরিপদদাকে নিয়ে জগৎদা চলে গেলেন নোয়াপাড়া, সেখানকার মেছোঘেরির জমিতে মালিকের যে আক্রমণ শুরু হয়েছে তার ফয়সালা করতে।

রাণীহাট কৃষকসমিতির তু'জন কমরেড তমালকে নিয়ে যেতে এসেছিল। ওখানেও গোলমাল শুরু হয়েছে। কৃষকসমিতির নেতৃত্বে প্রায় ষাটবিঘা বেনামজমি উদ্ধার করা হয়েছিল। তারপর থেকে জমির মালিক বাংলা-কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রচারিত 'অসভ্য ও বর্বর সরকারে'র পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেই মালিকটি লোক লাগিয়ে কৃষকসমিতির চালা-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এখন গাঁয়ের ক্ষেতমজুর গরীবচাষীদের জেলে পোরার ভয় দেখাচ্ছে। দখল-করা জমির ধান কেটে নেবে বলে চক্রান্ত করছে। কাল রাতে একটা পুলিশভ্যান গাঁয়ের রাস্তায় টহল দিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। গ্রামের বিক্ষুব্ধ মানুষ এক হ'য়ে একটাকিছু করার কথা ভাবছে। কি করা হবে তারই জন্য আজ সন্ধ্যায় মিটিং। তমালকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে।

কাগজপত্র গুছিয়ে ঝোলাটায় ভ'রে নীচে নামার সময় খুব ব্যস্তভাবে তমাল আমাকে বলল, 'সেই লিফ্‌লেট্‌টা লেখা হয়ে গেছে, অলক?'

আমি লজ্জিত হ'য়ে বললাম, 'এখনও হয়নি।'

তমাল বলল, 'দেরী করছ কেন? ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

'আজই লিখে ফেলব।'

'আজ নয়, এখুনি।' তমাল সিঁড়িতে পা রাখল, 'এ-বেলা তোমায় কোথাও বেরুতে হবে না। এখানে বসেই লিখে ফেল। তারপর প্রেসে দিয়ে বাড়ী যাবে।'

আমি বললাম, 'তুমি কখন ফিরবে?'

তমাল বলল, 'ঠিক নেই। অবস্থার উপর নির্ভর করছে।'

আমার পাশেই ছিল শিখা। সে বলে উঠল, 'বেশী রাত হ'লে রাণীহাটে থেকে যেও তমালদা।'

তমাল সে-কথার উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসল। রাস্তায় নেমে গিয়ে সাইকেলে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে বলল, 'পাঁচহাজার ছাপতে বলবে। পরশুর মধ্যে চাই।'

আমিও চেঁচিয়ে বললাম, 'আ-চ্ছা!'

রাণীহাটের কমরেড্ দু'জনের সঙ্গে তমাল চলে গেল। তখন সাড়ে চারটা কি পৌনে পাঁচটা। পার্টিঅফিসে শুধু আমি আর শিখা। আমি একটা সিগেরেট ধরিয়ে কাগজ টেনে নিয়ে বসে পড়লাম।

শিখা বলল, 'কিসের লিফ্‌লেট্, অলকদা?'

বললাম, 'তুমি জাননা? মণিশঙ্করের বিরুদ্ধে একটা লিফ্‌লেট্। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আক্রমণ সুরু করেছে। গ্লাস-ফ্যাক্টরির চীপ্ ক্যান্টিনটা বন্ধ করে দিয়েছে, একবালকে ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে দিচ্ছে না, বাস-ওয়ার্কারদের আবার দশঘণ্টা করে কাজ করতে বলছে। সতেরোই মার্চ হরতাল করেছিল বলে বেছে বেছে বারোজনের নামে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছে। অঞ্চলের মানুষের কাছে ওদের এই চক্রান্তগুলো তুলে ধরা দরকার!'

শিখা হাসল, 'এখানকার মানুষ ওদের চেনে না নাকি! কিছু বাকি আছে?'

আমিও হেসে ফেললাম, 'না, নেই। তবু ঋতু বুঝে ওরা যেমন রং পাল্টায়, আমাদেরও তেমনি সজ্ঞাগ থেকে মুখোশ খুলে দেওয়া দরকার। এরফলে সাধারণমানুষের কাছে শত্রু সবসময় প্রত্যক্ষ থাকে। মানুষ তার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি এক হয়। লিফ্‌লেট্‌ ওই রকমই একটা হাতিয়ার।'

একটু পরে শিখাও চলে গেল। পার্টি-অফিসে একা বসে বসে আমি লেখাটা শেষ করলাম। তারপর প্রেসে সেটা পৌঁছে দিতে গিয়ে শুনলাম তমাল প্রেস হয়েই রাণীহাট গেছে। কি কাগজ, কোন্‌ টাইপ, কত ছাপতে হবে—প্রেসের মালিক মথুরবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

তখন মথুরবাবু কিংবা আমি দু'জনের কেউ কি জানতাম, এই শহরে তমাল আর কখনো ফিরবে না! একটু আগেই ওর সঙ্গে আমাদের শেষদেখা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, তমাল আমার বন্ধু। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার চেয়েও আজ যেটা বড় কথা, তমাল আমার কমরেড্‌। প্রিয় কমরেড্‌।

আমি তমালের জন্যই কমিউনিস্ট হয়েছি।

তমালের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়-বন্ধুত্ব না হলে, ওর সাহচর্যে না এলে আমার জীবন কোন্‌ খাতে বইত আমি জানি না। হয়ত বাবার মত আমিও একজন নিষ্ঠাবান কেরানি হতাম। অথবা সরকারী পরীক্ষা দিয়ে মাঝারিধরণের কোনো অফিসার। শাসনবিভাগের দায়িত্বে থাকলে কমিউনিস্টদের ঘৃণা করতে শিখতাম। কারণে-অকারণে ওদের ধরে এনে থানায় হয়রানি করতাম, লক্‌আপে রেখে পেটানোর হুকুম দিতাম।

কিন্তু আমি সে-সব কিছুই হলাম না—একজন কমিউনিস্ট হলাম!

আমার বাবা সরকারীঅফিসের লোয়ারডিভিশন কেরানি ছিলেন। বদলির চাকরি। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন। আমাদেরও সঙ্গে থাকতে হ'ত। কেননা এদেশে আমাদের কোনো বাড়ী ছিল না। এককাঠা জমিও না।

শুনেছি, ওই দেশে ছিল—যার সরকারী নাম এখন পূর্ব-পাকিস্থান। টাঙ্গাইল শহরে গলির মধ্যে ছোটরাস্তার ধারে নাকি একটা বাড়ী ছিল, গ্রামে কিছু জমিজমা ছিল। হাটের মধ্যে মামাদের সূত্রে পাওয়া একটা দোকানঘর ছিল। দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা তার কিছু বিক্রি করেছিলেন, কিছু করতে পারেন নি, হাজার পাঁচেক টাকা হাতে নিয়ে এদেশে চলে এসেছিলেন। আমার বয়স তখন দশ, আমার বোনের সাত। আমাদের ভাল করে কিছু মনে পড়ে না।

শুধু ঠাকুমার কথা মনে পড়ে। আমার স্থবির বৃদ্ধ পিতামহী। তাঁর বয়স এখন আশী পার হয়েছে। দুটো চোখেই ছানি পড়েছে। সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারেন না। তবু রোজ সকালে উঠে ঘর-দোর ঝাঁট দেন, উঠোনে গোবরজলের ছড়া দেন, পুকুরে স্নান ক'রে এসে ঠাকুর পূজো করেন, পাটকাঠির আগুন জ্বেলে নিজের ভাত নিজেই ফুটিয়ে নেন।

আমরা কাকার চিঠি থেকে এসব খবর পাই। কাকা লেখাপড়া শেখেন নি। গ্রামের বাড়ীতে জমি চাষ করেন, নৌকো নিয়ে মাছ ধরেন, অবসরসময় মোটা-মোটা দাড় তৈরী করেন। বাবা এদেশে আসার সময় কাকাকেও আসতে বলেছিলেন। কিন্তু জমিজমা গাছগাছালির মায়া ছেড়ে কাকা অনিশ্চিতের মধ্যে আসতে চাইলেন না। আমার ঠাকুমাও ভিটে আঁকড়ে রইলেন।

সেই বুড়ীঠাকুমার কোলেপিঠে আমরা ভাইবোন মানুষ। অন্ধকারে অভ্রের কুচির মতো ঠাকুমার স্মৃতি মনের কোঠায় এখনও জ্বলজ্বল করে।

এখানে-ওখানে ঘুরে একদিন এই শহরে আমরা বদলি হ'লাম। আমি তখন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছি। এখানে এসে কোলকাতায় এম-এ ক্লাশে ভর্তি হ'লাম। ট্রেনের মান্থলি কাটা হ'ল। আমি রোজ যাতায়াত শুরু করলাম।

তারপর যতদূর মনে পড়ে, ওই ট্রেনেই একদিন তমালের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল।

একটা ছোট ঘটনা ঘটেছিল সেদিন।

আমি পেছনের দিকে একটা কামরায় উঠেছিলাম। মাঝখানের বেঞ্চিতে হাঁটুমুড়ে দিব্যি আরাম করে বসেছিলেন হৃষ্টপুষ্ট মুণ্ডিত মস্তক এক সন্ন্যাসী। তাঁর পরনে গেরুয়াবসন, কপালে মস্ত বড় রক্ততিলক। তিনি গম্ভীর মুখে সামনের এক আধবুড়ো ভদ্রলোকের হাত দেখছিলেন। আমি পাশে গিয়ে বসতে সাধুবাবা সামান্য বিরক্ত হয়ে হুম্ জাতীয় শব্দ করলেন। তারপর সেই ভদ্রলোকটিকে বললেন, 'হবে, তোমার ছেলের চাকরি হবে, কিন্তু একবছর তিনমাস পরে। এই সময়টা বড় খারাপ।'

লোকটার মুখ কালো হয়ে গেল। গণক তা লক্ষ করে বললেন, 'এত চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রতিকূল সময়কে অনুকূলে আনার ব্যবস্থা জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে। তুমি কাউকে দিয়ে গ্রহশান্তি করাও—' সন্ন্যাসী বাঙালি। উচ্চারণ খুব স্পষ্ট, মনে হ'ল লেখাপড়া জানা লোক। কৌতূহলের সঙ্গে আমার একটু শ্রদ্ধাও হ'ল। আশে-পাশের অনেকের মত আমার হাতটা মেলে ধরার জন্য উসখুস করতে লাগলাম। ঠাকুর-দেবতা, গণক-জ্যোতিষে তখন আমার অশ্রদ্ধা তেমন প্রবল নয়। বাবা এসব বিশ্বাস করেন। নন্দিতার বিয়ের ব্যাপারে সুযোগ পেলেই মা একে-ওকে দিয়ে হাতখানা দেখিয়ে নেন।

আমি মনে মনে ভাবছি এমনসময় লোকটা শুকনো মুখে বলল, 'কাকে দিয়ে গ্রহশান্তি করাব বাবা? সব যে ঠগ্—'

গেরুয়াধারী হাসলেন, 'ঠিক কথা! সোনা কি পথেঘাটে পড়ে থাকে ভাই, কষ্ট করে খনি থেকে তুলতে হয়। পুঁটিয়ারি চেন?'

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

গেরুয়াধারী বললেন, 'পুঁটিয়ারি-শ্মশানের কাছে গঙ্গার কোলে আমার আশ্রম। চলে যেও একদিন।'

লোকটা মিন মিন করে বলল, 'কত খরচ পড়বে?'

গণক বললেন, 'বেশী না। যেও, দেখব।'

ঠিক এইসময় দরজার কাছ থেকে মোটামুটি আমার বয়েসি রোগামত, লম্বা, শ্যামবর্ণ একটি ছেলে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীর নাকের ডগায় হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই হাতটা একটু দেখবেন।'

গেরুয়াধারী একটু চমকে উঠে ওর আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর প্রবলবেগে ঘাড় নাড়তে লাগলেন, 'না, বাবা, না।'

সে বলল, 'কেন বাবাজী? আমি কি অপরাধ করলাম?'

তার মুখখানা অতিশয় নিরীহ, দেখে মনে হয় না বাবাজীকে নিয়ে কোনোরকম রসিকতা করতে এসেছে। বাবাজী তবু ঘাড় নাড়লেন, 'না বাবা, তোমরা সব আধুনিক ছেলে, এসব বিশ্বাস কর না!'

আমার সামনের সেই আধবুড়ো লোকটি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর!'

ছেলেটি এবার অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি। আপনি একটু দেখুন—

সাধকবাবা যেন আশ্বস্ত হলেন। হাতখানা টেনে নিয়ে বুড়ো-আঙ্গুল দিয়ে তেলো টিপতে টিপতে বললেন, 'কি জানতে চাও বাবা তুমি?'

সে বলল, 'আমার স্ত্রী অসুস্থ, হাসপাতালে আছে, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে—'

সাধকবাবা আবার তীক্ষ্ণচোখে ওর মুখের দিকে তাকালেন।

তারপর ধ্যানস্থ হওয়ার মত করে বললেন, 'ভয় পেও না, সংকট কেটে যাবে!'

ছেলেটি যেন খুশী হয়েছে এমনভাবে বলল, 'আমার মা'র মাথা খারাপ। আজ একমাস ধরে নিরুদ্দেশ—'

হাত দেখে সাধকমশাই মুখ কালো করলেন, 'উত্তরদিকে গেছে।'

ছেলেটি বলল, 'সেদিকে যে গঙ্গা!'

সাধক কিছু বললেন না। কপাল কুঁচকে চোখ উল্টে কি রকম একটা ভঙ্গি করলেন। তাতে আমার নিশ্চিত ধারণা হ'ল ওর মা গঙ্গায় ডুবে মরেছে!

ছেলেটি এবার বলল, 'আজ একমাস ধরে আমি ছাঁটাই হয়ে বসে আছি—'

সাধকমশাই হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'হাতে কি সব লেখা থাকে বাবা? জন্মক্ষণ, গ্রহনক্ষত্র, রাশিলগ্ন সব বিচার করতে হবে। পুঁটিয়ারি চেন?'

সেইমুহূর্তে ছেলেটি ঝকঝকে দাঁত বের করে খুব ধারালো ভঙ্গিতে হেসে উঠল। সাধকবাবা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আমি অবাক হয়ে ছেলেটির মুখ দেখলাম। হাসতে হাসতেই সে বলল, 'পুঁটিয়ারিতে ব্যবসাটা বেশ জাঁকিয়ে তুলেছেন, কি বলেন বাবাজী?'

বাবাজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি নাক দিয়ে একরকম শব্দ করলেন।

ছেলেটি বলল, 'বাবাজী, আমি বিয়ে করিনি, আমার মা বেঁচে নেই, আর আমি কোথাও চাকরিও করি না।'

বাবাজী বললেন, 'যত্ত সব। আমি আগেই বলেছিলাম—'

ছেলেটি এবার আমার সামনের সেই লোকটিকে বলল, 'শুনুন মশাই, হাত দেখাটেখা সব বুজরুকি। মানুষের অতীত-ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে না। আমাদের দেশে দারিদ্র্য যত বাড়ছে, শোষণ

যত বাড়ছে—এসব ব্যবসা তত জাঁকিয়ে উঠছে। আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন? এরপর যেন গাঁটের পয়সা খরচা করে ওর আশ্রমে যাবেন না।'

লোকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। বিরস মুখে বলল, 'সব ঠগ্—'

পরের স্টেশনে গাড়ী থামতে সাধকবাবা নেমে গেলেন। যাওয়ার সময় ছেলেটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে কি যেন বলেও গেলেন। ছেলেটি তা আর গ্রাহ্য করল না। আমার পাশে বেশ গুছিয়ে বসল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে তর্ক করার জন্য বলে উঠলাম, 'এই লোকটা ঠগ্ হতে পারে, তাই বলে ফলিত-জ্যোতিষকে আপনি মিথ্যে বলতে পারেন না। ওটা একটা সায়েন্স!'

ছেলেটি হাসি থামিয়ে আমাকে দেখল। তারপর মুখখানাকে গম্ভীর করে বলল, 'আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আলাদা করে দেখলে গ্রহনক্ষত্রচর্চার একটা মূল্য আছে, কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের কোনো যোগ নেই।'

আমি বললাম, 'শুধু আমাদের দেশে নয়, ইংলণ্ড আমেরিকাতেও এর চর্চা হয়। এই এটমিক যুগেও তার ঘাটতি দেখা যায় নি।'

ছেলেটি বলল, 'সেটা ওইসব দেশের সামাজিক-কাঠামোর জন্য। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে এসব চর্চা নেই।'

'কেন নেই?'

'এর সবটাই ভাঁওতা এবং মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে।'

'ক্ষতিকর কেন বলছেন?'

'অদৃষ্টবাদী মানুষ সংগ্রামের শক্তি হারায়। নিজের মর্যাদা ও মূল্যবোধকেও বিনষ্ট করে। মানুষের জীবন কিছু অতি-প্রাকৃত ব্যাপার নয়, তা একান্তই বস্তুতান্ত্রিক। সমাজের উৎপাদনব্যবস্থা মানুষের জীবন গঠন করে, তার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার মানুষই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উৎপাদনব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে। মোটামুটি এটাই হ'ল বিকাশের প্রক্রিয়া, এর সঙ্গে হাতের রেখা বা

কপালের রেখার কোনো যোগ থাকতে পারে না, ভূতপ্রেতে বিশ্বাসের মতই এটা একটা কুসংস্কার।'

আমি বললাম, 'আপনি স্পিরিটে বিশ্বাস করেন না?'

সে আবার হেসে উঠল, 'আপনি করেন নাকি?'

আমিও হাসলাম, 'কি জানি। ও নিয়ে কখনো ভাবিনি।'

গাড়ী আর একটা স্টেশনে থামলে ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, 'আমি এখানে নামব। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। আপনি কোথায় থাকেন?'

জায়গার নাম শুনে সে বলে উঠল, 'সে কি, সুভাষকলোনীর পিছন দিকে? গৌর চাটুজ্যের বাড়ী? কি নাম আপনার? আমার নাম তমাল! তমাল রায়—'

এতক্ষণ পরে আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম। তমালের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল। আর সেই প্রথম আলাপেই এই দীর্ঘ শ্যামবর্ণ যুবকটি তার উজ্জ্বল-মুখ ধারালো-হাসি আর সরস কৌতুকের সঙ্গে গম্ভীর বাচনিক ভঙ্গির মিশ্রণ নিয়ে আমার মনে গভীর ছাপ ফেলল। আমার মনে হ'ল, ওর যথেষ্ট পড়াশোনা আছে এবং সেটা ঠিক আমার মত নয়। ওর সমস্ত কথাই আমার কাছে কেমন নতুন ঠেকল। আমি তার অর্থ বুঝলাম না বা তার কথায় আমার মনের পুরনো বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র চিড়ও ধরল না—তবু তমালকে আমার ভাল লেগে গেল।

আরো কিছুদিন যাতায়াত করার পর তমালকে ভালো করে চেনার সুযোগ পেলাম। শুনলাম, সেও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস ওর বিষয়। মাঝে মাঝে ক্লাসে যায়, বেশীরভাগ দিন যেতে পারে না। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে। মাঠ-ঘাট কল-কারখানায় ঘুরে বেড়ায়। ট্রেনের হকারগুলো সবাই ওকে চেনে। বাসের ড্রাইভার কনডাকটারদের সঙ্গে ওর খুব মাখামাখি। ইউনিভার্সিটির ছাত্রমহলেও ও বেশ পরিচিত।

একদিন আশুতোষবিল্ডিং-এর একটা ক্লাসরুমে দেখলাম ডায়াসের উপর দাঁড়িয়ে তমাল বক্তৃতা করছে। সামনে ছাত্রসংসদের নির্বাচন। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছে। ক্লাসে ক্লাসে বক্তৃতা চলছে। তমাল ওর দলের হয়ে বক্তব্য রাখছে।

একদিন আমাদের ক্লাসেও এল। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আমাদের ক্যাণ্ডিডেটদের সমর্থন করবেন।' আমি ঘাড় নাড়লাম।

তমালদের রাজনীতির প্রতি আমার কোনো মোহ ছিল না, কোনো বিদ্বেষও না। আসল কথা, রাজনীতির আমি তখন কিছুই বুঝি না।

কখনো বোঝার চেষ্টাও করিনি।

স্কুলে শান্তশিষ্ট ভাল ছেলে বলে আমার একটা সুনাম ছিল। দিন রাত মাথা গুঁজে বই মুখস্ত করেছি। ফার্স্ট সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করেছি। একটা মফঃস্বল কলেজ থেকে আই-এ, বি-এ পাশ করেছি। সেখানে একআধটু খাদ্যআন্দোলন ছাড়া আর কিছু হ'ত না। এমন কি আমাদের কলেজ-ইউনিয়নের নির্বাচনও না। অধ্যক্ষমশাই নাম ধরে যাদের ঠিক করে দিতেন তারা খেলাধুলা, ডিবেট, পত্রিকা, সোস্তাল পরিচালনা করত। আমি ওসব ব্যাপারেও কখনো মাথা গলাই নি।

আমার অনার্স ছিল বলে দিনরাত পড়তে হ'ত। আমার পড়ার ক্ষতি হবে বলে বাবা কখনো হাটবাজার করতে দিতেন না। রেশন তুলতে বলতেন না। পড়ায় একটু ত্রুটি হলে মুখ কালো করে বলতেন, 'এই সংসারের কি হবে! আমার চাকরি তো আর মোটে সাতবছর, তারপর দু'বেলা কি করে যে অন্ন জুটবে!' মা দিনরাত বলতেন, 'তোর উপরেই সব ভরসা খোকা। তুই মন দিয়ে পড়। তাড়াতাড়ি পাশ করে সংসারের দুঃখু ঘোচা।'

এমন কি নন্দিতাও বলত, "তোর চাকরি হলে আমরা একটা ভাল বাসা দেখে উঠে যাব দাদা। এই ঠাণ্ডা স্যাঁৎস্যাঁতে ঘরে বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

এইভাবে সেই কিশোরকাল থেকেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম, এই সংসারের সমস্ত অভাব সমস্ত দুঃখ আমার মুখ চেয়ে বসে আছে, আমি তাদের তাড়িয়ে দু'হাত ভরে সুখ কিনে আনতে পারি। এই সুখটুকুর জন্য বাবা এত কষ্ট করে আমাকে পড়াচ্ছেন। মা দিনরাত আমার যত্ন করছেন। আমার বোন আমার সবকিছু খুঁটিনাটি দরকারের দিকে দৃষ্টি রাখছে। ওদের জন্য আমি একটু সুখ একটু স্বচ্ছলতা কিনে আনব বলে বাবা ধারদেনা করেও আমার অনার্সের বই কিনে দিচ্ছেন। পরীক্ষার সময় আমার জন্য আলাদা একপোয়া দুধ রাখা হচ্ছে। বাবা বাজার ঘুরে মাছ আনছেন, মা কপালে দইয়ের ফোঁটা এঁকে দিচ্ছেন, বোন কলমে কালি ভরে রাখছে। আর আমি একটা পরীক্ষা দিয়ে আর একটা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। বাইরের জগতে কোথায় কি ঘটছে আমার জানার কোনো দরকার নেই। এমন কি খবরের কাগজ পড়াও আমার কাছে সময়ের অপব্যয়। বন্ধুবান্ধব থাকাটাও।

এইরকম মানসিকতায় বড় হতে হতে আমি ইউনিভার্সিটির দরজায় পৌঁছলাম। মস্তবড় সেনেটহলে ঝাউপাতায় গোলাপের কুঁড়ি গেঁথে পুরনো ছাত্ররা আমাদের প্রতি নবাগতের সম্ভাষণ জানাল। আমি অবাক হয়ে এই প্রাচীন বনেদী বাড়ীর বিশাল ছাদ আর মোটা মোটা থাম দেখলাম। লনে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ পামগাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে এক আশ্চর্য আকাশ দেখলাম। কলেজ স্ট্রীটে ধাবমান দোতলা বাসের প্রচণ্ড শব্দে আমার বুকের ভিৎ কাঁপতে লাগল। শেয়ালদা স্টেশনের প্রবল জনস্রোতে আমি মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলাম।

এইসময় তমালের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমার নিঃসঙ্গতা অনেকখানি কেটে গেল। তমালকে আমার পছন্দ হ'ল, কিন্তু সেটা ওর রাজনীতির জন্য নয়। ওর কথাবার্তা, চাল চলন ও চেহারার জন্য। আমার চেয়ে একটু লম্বা, একটু পাতলা গড়নের শরীর ওর,

কিন্তু হাত পা মুখের পেশীতে একধরণের তীক্ষ্নতা আছে। কথা বলার সময় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়, চোয়ালের হাড় শক্ত হয়, কপালের শিরা দপ্ দপ্ করে। বক্তৃতা করার সময় এইসব লক্ষণগুলো আরো স্পষ্ট হয়। খুব সুন্দর গুছিয়ে বক্তৃতা দেয় ও। ছেলেমেয়েরা মন দিয়ে ওর কথা শোনে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভাল লাগে।

দেখা হলেই অল্প হেসে কাছে এগিয়ে আসে। খুব সহজ সুরে কথা বলে, হাসিঠাট্টা করে। তারপর মনের উপর সুন্দর একটা ছাপ ফেলে আবার ক'দিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওর কোথাও কোনো বাড়ীঘর নেই, পার্টিঅফিসে থাকে, খায়, ঘুমোয়। রাতে একটু পড়ার সময় পায়, সারাদিন এখানে ওখানে পার্টির কাজ, তারই ফাঁকে ফাঁকে কখনো কোলকাতায় এসে ক্লাস করা, বক্তৃতা দেওয়া, পোস্টার লেখা। এক অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া জীবন, বন্ধনহীন, দায়-দায়িত্বহীন, যা আমি কল্পনাও করতে পারি না, আমাকে খুব অবাক করে। এই সবকিছু মিলিয়ে তমালের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মায়। আমি মনে মনে ওকে ভালবাসতে থাকি।

ওর প্রতি এই গূঢ় আকর্ষণের জন্যই ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে রাজনীতির কিছু না বুঝেও ওদের প্রার্থীদের আমি ভোট দিই। তমালরা জেতে। তারপর ক'দিন ওর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

একদিন শুনলাম, এই অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হবে। তমাল একজন ক্যাণ্ডিডেট। সুভাষকলোনী দিয়ে যেতে-আসতে নির্বাচনীপোস্টার দেখলাম। এই ওয়ার্ডে কে এক হরিপদ সরকার দাঁড়িয়েছেন, তাঁর সমর্থনে বিকেলে জনসভা। প্রধানবক্তা জগৎবল্লভ দাস, তমাল রায়।

রবিবারে মিটিং। সেদিন সকালে তমাল এল আমাদের পাড়ায়। সঙ্গে আরো কয়েকজন। আমাদের বাসার কাছে এসে আমাকে ডাকল।

আমি বেরিয়ে আসতে বলল, 'কি করছিলেন ? পড়াশুনা ?'

বললাম, 'হ্যাঁ। আপনারা কোথায় চললেন ?'

তমাল বলল, 'ভোট চাইতে। আজ বিকেলে মিটিং। যাবেন।'

বাবা এসে দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দায়। তিনি বলে উঠলেন, 'ও গিয়ে কি করবে ? আমরা ভাড়াটে, আমাদের তো ভোট নেই !'

তমাল বাবাকে চিনতে পেরে নমস্কার করে বলল, 'ভোট নাই বা থাকল। মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় থাকেন, তার কাজকর্ম কেমন চলছে জানবেন না ?'

বাবা বললেন, 'আমাদের জেনে কি লাভ ? আজ আছি কাল নেই।'

আমি ভদ্রতা করে বললাম, 'একটু চা খাবেন ?'

তমাল ঘাড় নাড়ল, 'আজ না, অন্যদিন আসব।'

ওরা সবাই আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে মুচিপাড়ার দিকে চলে গেল।

তারপর ওই ভোটের কাজকর্মেই তমাল আরো ক'বার এল এ পাড়ায়। আমি ওকে বাড়ীতে ডাকলাম। নন্দিতাকে বললাম চা করে দিতে। পৌরসভা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা হ'ল। দেশের সাধারণ অবস্থা নিয়েও তমাল অনেক কথা বলল। আমি কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না।

কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতে ওর আসা-যাওয়া নিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। আমাদের বাড়ীঅলা গৌর চাটুজ্যে রিকশায় চেপে ভাড়া আদায় করতে এসে তমালকে আমার ঘরে বসে থাকতে দেখে মুখ কালো করে ফেললেন। ভাড়ার টাকা গুণে নিয়ে আমাকে বাইরে ডেকে বললেন, 'বাবা কোথায় ? অফিস গেছেন ? তা, ওই ছোঁড়াটা এখানে কেন ?'

গৌর চাটুজ্যের কালো নাদুস-নুদুস চেহারা। কথা বলার সময় গালের মাংস থলথল করে। গলায় একখানা টকটকে হলুদরঙের

মাফলার জড়ানো। সামনের দু'খানা দাঁত সোনার তার দিয়ে ঘেরা।

তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে আমি আহত বোধ করলাম। বেশ স্পষ্ট করেই বললাম, 'ও আমার বন্ধু।'

'বন্ধু?' গৌর চাটুজ্যে রিকশায় গুছিয়ে বসতে বসতে বললেন, 'ডাঙার বাঘ আর জলের কুমীর—এই দুইয়ের সঙ্গে কি বন্ধুত্ব হয় বাবা? তোমার কাঁচা বয়েস, হিসেবে ভুল করো না।'

রিকশা চলতে শুরু করলে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তোমার বাবাকে বলব।'

ঘরে ঢুকে তমালকে বলতেই ও শব্দ করে হেসে উঠল, 'গৌর চাটুজ্যে মণিশঙ্করের লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে।'

আমি বললাম, 'কেন?'

তমাল বলল, 'ওরা বড়োলোক আর আমরা গরীব বলে। আপনি জানেন, ওই গৌর চাটুজ্যের সাতখানা বাড়ী আছে এই শহরে?'

'সাতটা বাড়ী!'

'হ্যাঁ। আর সব তৈরী হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির পয়সা আর মাল-মশলা চুরি করে। গৌরবাবু হলেন ভাইস্-চেয়ারম্যান। আবার সিমেন্টের ব্যবসাও আছে। ব্ল্যাকে একবস্তা সিমেন্ট বিক্রি করেন পনেরো টাকায়—'

আমি দেখলাম, তমালের মুখের রেখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। চোখে সেই ধারালো দৃষ্টি। আমি এই প্রথম লক্ষ করলাম, তমালের চোখের মণিদুটো পরিষ্কার কালো নয়, সামান্য কটা।

এর দু'দিন পরে সন্ধ্যাবেলা বাবা গম্ভীর মুখ করে বললেন, 'তুমি তমালকে আর এ বাড়ীতে এনো না। ওর সঙ্গে মেলামেশাও করো না।'

আমার গৌর চাটুজ্যের কথা মনে পড়ে গেল। একটু কঠিন সুরে বলে উঠলাম, 'কেন, ও কি দোষ করেছে?'

বাবা বললেন, 'দোষ-গুণের কথা না খোকা, ওরা হ'ল কমিউনিস্ট।'

'তাতে কি!'

'তাতে কি!' বাবা খুব বিরক্ত হয়ে রাগত গলায় বললেন, 'পুলিশ রিপোর্টে আমার চাকরিটা যখন যাবে তখন বুঝবে তাতে কি!'

বাবাকে রাগ করতে দেখে আমি চুপ করে গেলাম। আর কোনো প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করলাম না। বাবার কথার উপর কথা বলতে আমরা ভাইবোন কেউ অভ্যস্ত নই। তাঁর কথা আমরা কখনো অমান্য করি না।

কিন্তু বাবার কথাগুলো আমার চেতনাকে তীব্রভাবে আঘাত করল। একজন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে বা তাকে বাড়ীতে এনে একটু গল্প করলে কি চা খাওয়ালে, এমন কি বিপর্যয় ঘটে, যার ফলে বাবার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে, আমি ভেবে পেলাম না।

বাবা আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'হ্যাঁ, খোকা, আমি বানিয়ে বলছি না। সেবার নলহাটিতে বিষ্ণুবাবুর চাকরি গেল, বহরমপুরে কানাই নন্দীর সাসপেনসন হ'ল, মথুরবাবুর ইন-ক্রিমেণ্ট বন্ধ হয়ে গেল—সব ওই কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য। সরকারি চাকরির অনেক জ্বালা রে খোকা। তুই ওদের সঙ্গে মিশলে তোরও কোনোদিন চাকরি জুটবে না। পুলিশ-রিপোর্টে সব বাতিল হয়ে যাবে!'

আমি বাবার কথা বিশ্বাস করলাম। কেন না কানাই নন্দীর চাকরি যাওয়ার কথা আমি জানতাম। তাছাড়া আমি লক্ষ করছিলাম, গৌর চাটুজ্যের মত আমার বাবা তমালের প্রতি অন্ধবিদ্বেষ নিয়ে কিছু বলছিলেন না। কমিউনিস্টরা ভাল কি খারাপ, ওরা ডাঙার বাঘ, না জলের কুমীর—এসব কোনো কথা নয়। শুধু নিজের নিরাপত্তা, আমার চাকরির ভবিষ্যৎ—যার উপর এই সংসারের আজ ও কালের গ্রাসাচ্ছাদনটুকু নির্ভর করছে, সেটুকু রক্ষার তাগিদে

চারদিকের বাস্তব অবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে খুব সহজ বুদ্ধিতেই আমাকে তমালের সঙ্গ পরিহার করতে বলছিলেন।

আসলে বাবা খুব নির্বিরোধী, ভীতু চরিত্রের মানুষ। সবরকম ঝামেলা সযত্নে এড়িয়ে চলেন। আমি বাবার স্বভাব অনেকটাই পেয়েছি। তবু তমালের সঙ্গ একেবারে ছাড়তে পারলাম না। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে বা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের যোগাযোগ থাকল। কিন্তু তমালকে আর কখনো বাড়ীতে আসতে বললাম না। বরং বাবার কথা বলে ইঙ্গিতে ওকে আসতে বারণই করলাম। তমাল বুঝতে পেরে শুধু হাসল। বাবার প্রতি কোনোরকম কটাক্ষ করল না দেখে আমার ভাল লাগল।

ক'দিন পরে পৌরসভার ইলেকশন চুকে গিয়ে ফল বেরুল। তমাল জিততে পারল না। কিন্তু সাতনম্বর ওয়ার্ড সুভাষকলোনী থেকে হরিপদ সরকার জিতে গেলেন। শুনলাম, সতেরোটি আসনের মধ্যে তমালরা পেয়েছে মোটে তিনটি। বাকিসব মণিশঙ্করবাবুরা।

ভাড়া নিতে এসে গৌর চাটুজ্যে বাবাকে বললেন, 'আরে মশাই, এ হচ্ছে মণি চৌধুরীর খাসতালুক, এখানে সিঁধ কাটা কি সহজ কথা! বাঁদরগুলোর চাল নেই, চুলো নেই, নিজেদের পেট নিজেরাই চালাতে পারে না, চাঁদার কৌটো হাতে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়! ওরা বলে কিনা মিউনিসিপ্যালিটি দখল নিয়ে শহর চালাবে! সেই যে বলে না, আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা সগ্‌গে যেতে চায়রে—'

বাবা বললেন, 'রান্নাঘরে একটা জানালা কেটে দেবেন বলেছিলেন চাটুজ্যে মশাই?'

'বলেছিলাম নাকি? তা ইয়ে, নেবেন! কেটেকুটে আপনিই বানিয়ে নেবেন।'

'খরচটা ভাড়া থেকে কাটা যাবে তো?'

'ভাড়া থেকে? তা হলে এমাসে না। বড় টানাটানি যাচ্ছে। ও মাসে দেখব।'

বলতে বলতে রিকশা নিয়ে চলে গেলেন গৌর চাটুজ্যে। বাবা সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, 'হারামজাদা! ভাড়াটের কাছ থেকে কেবল নিতেই শিখেছিস! কিছু দেবার বেলায় ওমনি টানাটানি! তুই বেটা দশটাকার বস্তা পনেরো টাকায় বেচিস—তোর আবার টানাটানি কিরে! কিছু জানি না নাকি!'

মা এসে বললেন, 'কি হ'ল? এ মাসেও হবে না বুঝি?'

বাবা বললেন, 'কি করে হবে। উনার টানাটানি যাচ্ছে—'

এতক্ষণ চুপ করে শোনার পর আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমাদের রান্নাঘরটা ছোটজায়গার উপর অনেক কায়দা করে বানানো হয়েছে। মাথার উপর গুটিকয়েক ঘুলঘুলি ছাড়া কোনো জানালা নেই। অন্ধকারে মা ভালো দেখতে পান না, তেল-মশলার ঝাঁঝে সারাক্ষণ কাসতে থাকেন। কখনো সে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি বলে উঠলাম, 'সামনের মাসে ওর ভাড়া বন্ধ করে দাও বাবা। দেখি কি করে।'

আমার রাগ দেখে বাবা নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না খোকা। তুই তোর পড়া কর।'

মা-ও বললেন, 'হ্যাঁ, খোকা। কম ভাড়ার বাড়ী, সবরকম সুবিধে কি হয়? এই শেষ পাশটা দিয়ে তুই ভাল একটা চাকরি নে। আমরা অন্য বাসায় উঠে যাব।'

আমি মা ও বাবার মুখ দেখলাম। ওঁরাও অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বুকের মধ্যে এই প্রথম কি রকম একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। যন্ত্রণার সঙ্গে ক্ষোভ এসে মিশল। মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে গৌর চাটুজ্যেদের প্রতিপক্ষ বলে ভাবতে শুরু করলাম। আর তখুনি তমালের মুখটাও আমার মনে পড়ে গেল। খুব অস্পষ্ট-ভাবে এই প্রথম আমি যেন শত্রুমিত্র চিনতে শুরু করলাম!

একদিন তমাল বলল, 'আপনি তো খুব পড়াশুনা করেন। দিনরাত সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে বই মুখে বসে থাকেন।'

আমি বললাম, 'না করলে চলবে কেন? বছর তিনেকের মধ্যে বাবা রিটায়ার করবেন।'

'পাশ করে কি করবেন? চাকরি?'

'তাছাড়া?'

'কিন্তু পাশ করেই যে চাকরি পাবেন, তার গ্যারান্টি কি?'

'হ্যাঁ, আদাজল খেয়ে খুঁজতে হবে।'

'অনেকেই তো খুঁজছে। পাচ্ছে কই?'

আমি চুপ করে রইলাম। ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে তমাল আমার মুখ দেখল। আমি দেখলাম, ওর ঈষৎকটা চোখের মণিতে কৌতুক ঝিকমিক করছে।

একটু পরে বলল, 'আপনি পাশ করে বেরুতে বেরুতে এ দেশের অর্থনীতি আরো বন্ধ্যা হবে। চাকরির বাজার আরো সঙ্কুচিত হবে।'

'কেন?'

'এই সরকারের অর্থনীতির ধারাটাই ওইরকম। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এদেশে খুব আশাবাদী হবেন না, তাহলে ঠকবেন।'

'আমার বড়রকমের কোনো আশা নেই।'

'ভাল কথা।' উজ্জ্বল চোখে ধারালো কৌতুকের ছাপ ফেলে আবার হাসল তমাল, 'একটা বই পড়বেন? ছোট বই, আপনার বেশী সময় নষ্ট হবে না।'

'কি বই?'

'ভারতের অর্থনীতি কোন্ পথে'। আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থাটা তাহলে বুঝতে পারবেন।'

'দিন। পড়তে দোষ কি।'

তমাল ওর খয়েরিরঙের ঝোলা থেকে একটা চটিবই টেনে আমার হাতে দিল। আমি নিলাম।

তারপর ক'দিন যেতে না যেতে তমাল ট্রেনে ধরল, 'সেই বইটা পড়লেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কি বুঝলেন ?'

আমি খুব সাধারণ অর্থে বললাম, 'সব অন্ধকার।'

তমাল কিন্তু শব্দ করে হেসে উঠল, 'না, আলোও কিছু আছে। আর দুটো বই পড়বেন ? সব ছোট ছোট—আপনার পড়াশুনার ক্ষতি করবে না।'

সেই ঝোলা থেকে টেনে বের করল, 'মার্কসবাদের গোড়ার কথা' আর 'কমিউনিজম্ কাহাকে বলে ?'

আমি সামান্য ইতস্তত করে সেই বইদুটোও রাখলাম।

তারপর বেশ ক'দিন তমালের দেখা নেই।

একদিন স্টেশনে যাওয়ার পথে রাস্তায় গোলমাল দেখলাম। কোর্টের কাছে পর পর ক'টা বাস দাঁড়িয়ে আছে। সামনে লাল ফেস্টুন নিয়ে একদল ছেলে। কোর্টের বটতলায় লাঠি হাতে দশ বারোজন পুলিশ। বাসে কনসেসন চালু করার দাবিতে ছেলেরা চিৎকার করছে। তমালের ভাই অশোক ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এর আগে তমাল-মারফৎ অশোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু গোলমালের মধ্যে আমি ওর কাছে গিয়ে তমালের কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস করলাম না। ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল, আমি দ্রুত পায়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সেদিন বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে শুনলাম, বাসমালিক মণিশঙ্করের লোকেদের সঙ্গে ছেলেদের হাতাহাতি হয়েছে। পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে। অশোককে থানায় ধরে নিয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে নাকি সুভাষকলোনীর একটি মেয়েও ছিল। সে ছুটে পালাতে গিয়ে একটা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে জখম হয়েছে।

দুপুর থেকে আমার কেমন জ্বর জ্বর লাগছিল। লাইব্রেরিতে

পড়াশুনা করতে পারিনি। বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম। সন্ধ্যের মুখে জ্বরটা বাড়ছে মনে হ'ল। চা দিতে এসে নন্দিতা বলল, 'শুয়ে আছিস কেন দাদা ?'

বললাম, 'মাথা ধরেছে।'

নন্দিতা কপালে হাত দিয়ে বলল, 'গা যে গরম রে। জ্বরও তো এসেছে।'

মা ছুটে এলেন, 'জ্বর এসেছে ? সে কি খোকা ! কখন এল ? দুপুরে খুব রোদে ঘুরেছিলি নাকি ? এখন আমি কি করি !'

বললাম, 'কিছু করতে হবে না। কালই সেরে যাবে।'

মা বললেন, 'নারে খোকা, তোর জ্বর অল্পতে তো সারে না। ভারি ভোগায় ! তোর বাবা যে কখন ফিরবেন—'

'কোথায় গেছেন ?'

'নন্দির জন্য ছেলের খোঁজে, নৈহাটি। সেই অফিস থেকেই চলে গেছেন।'

'ঠিক আছে মা। এত ভাবার কিছু নেই। ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমোতে দাও।'

মা অল্পকাল চুপ থেকে নন্দিতাকে বাইরে ডেকে নিয়ে কি পরামর্শ করলেন। একটু পরে ও-পাশের বাড়ী থেকে একটি কিশোর এসে দাঁড়াল। মা তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বলো, দুপুরে কলেজ গিয়েছিল, ফিরেই জ্বরে পড়েছে। গা গরম, মাথা ধরা। গুছিয়ে বলতে পারবে তো বাবা ?'

ছেলেটির নাম সুকুমার। সে বলল, 'হ্যাঁ, মাসীমা।'

মা বললেন, 'ভাল দেখে যেন অষুদ দেয়।'

সুকুমার চলে গেলে নন্দিতা আবার ঘরে এল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'সব ব্যাপারেই তোরা এত ব্যস্ত হো'স কেন বল দেখি ?'

নন্দিতা বলল, 'ব্যস্ত হওয়ার কি দেখলি ? অসুখ হলে অষুদ লাগে না ? ডাক্তার ডাকছি, না তোকে হাসপাতালে পাঠাচ্ছি ?'

'বাবা এলে যা হয় করতিস।'

'হ্যাঁ, মাঝরাতে এসে বুড়োমানুষটা ছুটোছুটি করলে ভাল হ'ত! তোর যেমন বুদ্ধি।'

আমি চুপ করে গেলাম। নন্দিতা আমার পাশে বসল। আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেন জানি না আমার বৃদ্ধা পিতামহীর মুখটা মনে পড়ে গেল। এই বাংলা থেকে অনেক দূরে, অনেক নদ-নদী গাছ-পালা পার হয়ে অন্যএক বাংলার একটি অখ্যাত গ্রামের গৃহকোণে আমার বুড়ীঠাকুমা এখন হয়ত অন্ধকার দাওয়ায় বসে আমাদের দুই ভাইবোনের কথাই ভাবছেন। তাঁর দু'গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামছে। এ জন্মে আমরা আর কি তাঁকে দেখতে পাব!

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'নন্দি, ঠাকুমার কথা তোর মনে পড়ে?'

হঠাৎ এই প্রশ্নে নন্দিতা একটু চমকে উঠল। তারপর বিষণ্ণ হেসে বলল, 'পড়ে।'

আমি বললাম, 'ঠাকুমাও আমাদের কথা খুব ভাবে রে।'

নন্দিতা বলল, 'হ্যাঁ দাদা। ক'দিন আগে কাকার চিঠি এসেছে। তুই দেখিস নি?'

'দেখেছি।'

'তোর চাকরি হলে সবাইকে নিয়ে একবার যেতে লিখেছে।'

'যাব। ঠিক যাব দেখিস—'

এইসময় আমাদের বাড়ীর বাইরে একটা সাইকেল থামার শব্দ হ'ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা রিকশা। আমরা ভাইবোন অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ দেখলাম। নন্দিতা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। তারপর একটু পিছিয়ে এসে বলল, 'তোর সেই বন্ধু—'

তমাল ঘরে ঢুকল, সঙ্গে সুকুমার। ওদের দু'জনের পিছনে দিব্যি

ফর্সা মোটাসোটা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর মাথার চুল খুব ছোট করে কাটা, পরনে মোটা সুতির জামাকাপড়, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। বয়স হলেও চোখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়নি এবং সারা মুখে ও শরীরে কেমন যেন একটা কোমল ব্যক্তিত্ব। দেখলে আপনা থেকেই শ্রদ্ধা জাগে।

আমি জ্বর গায়ে বিছানায় উঠে বসলাম।

তমাল কিছু বলার আগে উনি বলে উঠলেন, 'কার জ্বর হয়েছে রে? তোর? কবে থেকে হয়েছে? কি করে হয়েছে? এই ছোঁড়ার সঙ্গে মাঠে-ঘাটে ঘুরিস নাকি? কমিউনিস্ট? হ্যাঁরে, কমিউনিস্ট নাকি তুই?'

তমাল একটা চেয়ার টেনে দিতে উনি বসলেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্টেথিসকোপটা বের করলেন। বুঝলাম, ইনি ডাক্তারবাবু। তাঁর তড়বড় করে কথা বলার ভঙ্গি দেখে আমার খুব মজা লাগল। হঠাৎ তমাল ও ডাক্তারবাবু একসঙ্গে কি করে এসে জুটলেন, কেই বা এঁদের আসতে বলল, ডাক্তারবাবুর ভিজিট কত এবং তা দেওয়ার মত বাড়তিটাকা ঘরে আছে কিনা—এসব ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। আমি দেখলাম, মা ও নন্দিতা দুজনেই খুব অবাক হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তারবাবু স্টেথিসকোপ কানে লাগালেন। বুকে বসানোর আগে মাথা তুলে ঘরের ছাদ ও দেওয়াল দেখে বললেন, 'এই ড্যাম্প বাড়ীতে থাকিস, জ্বর তো হবেই! কার বাড়ী এটা? গৌরহরির? ওরে বাবা, চোর দি গ্রেট।'

বলেই তমালের দিকে তাকিয়ে মস্তবড় করে জিব কাটলেন, 'দেখিস বাবা, গৌরকে বলিস না যেন। মানহানি ঠুকে দেবে।'

তমাল কিছু বলল না, হাসতে লাগল। ডাক্তারবাবু আমাকে নিয়ে পড়লেন, 'দেখি, শ্বাস টান। জোরে, আরো জোরে! পিঠ দেখি! কি খাস বাবা, পাঁজরাগুলো যে সব কটকট করছে! ও, তোরা

তো আবার খেতে পাস না, কমিউনিস্ট! আরে বাবা, খেতে না পেলেই কি কমিউনিস্ট হয়? তাহলে ভারতবর্ষের লোক তো তোদের মার্কসসাহেবের জন্মের আগেই কমিউনিস্ট হয়ে বসে থাকত!'

স্টেথিসকোপ গুটিয়ে তমালের দিকে তাকালেন, 'ওই মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানোই সার। এদেশে কিছু হবে না বাবা! এ হ'ল মুনিঋষিদের দেশ, ব্যাস বাল্মিকী মনু পরাশর—! পারিস তো নিজের দেশ থেকে একটা নীতি খুঁজে বার কর। শীতের দেশের চারা কি গরমের দেশে বসে রে? যতই জল ঢাল, শুকিয়ে মরে যায়।'

তবু তমাল কিছু বলল না, ঠোঁট টিপে টিপে হাসতেই লাগল। ডাক্তারবাবু কাগজ চাইলেন। পকেট থেকে মোটাধরণের কলম বের করে বড় বড় হরফে প্রেসকৃপসন লিখলেন। প্রেসকৃপসনের তলায় বাংলাঅক্ষরে লিখলেন, 'তমালের সহিত মিশিবে না!' মুখে বললেন, 'বুঝলি? ওই হতভাগার সঙ্গে যে মেশে তারই মাথা ফাটে, পা ভাঙ্গে, জ্বর হয়, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। খবরদার ওর সঙ্গে মিশবি না।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোর লিস্টে আর রোগী আছে, না এই শেষ? বল তাড়াতাড়ি। আমাকে আবার মণির ওখানে যেতে হবে—'

তমাল বলল, 'না ডাক্তারবাবু, আজ আর নেই।'

'বেশ বাবা, চলি তাহলে—'

তমাল ডাক্তারবাবুকে রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। ডাক্তারবাবু চলে গেলে আবার ঘরে এসে বলল, 'কি ব্যাপার, জ্বর বাধালেন কি করে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'ডাক্তারবাবুর ভিজিটটা—'

তমাল হেসে বলল, 'আমি নিয়ে এলে ভিজিট লাগে না। এমনিতেও গরীবমানুষের কাছ থেকে উনি ভিজিট নেন না। এই অঞ্চলে সদাশিবডাক্তার একজন অদ্ভুত মানুষ।'

আমিও বললাম, 'হ্যাঁ, ভারি মজার মানুষ।'

তমাল বলল, 'ওই দেখুন প্রেসক্রুপসনে কি লিখেছেন। প্রায়ই ও-রকম লেখেন উনি। একবার বাগ্দীপাড়ায় নিয়ে গেছি, একটা বাচ্চার ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া, প্রায় মরো মরো অবস্থা। ডাক্তারবাবু দেখেশুনে প্রেসক্রুপসনের তলায় লিখলেন, 'আগে তুইকাহন খড় যোগাড়পূর্বক ঘর ছাইবে।' গ্রামের একজন ক্ষেতমজুর টি-বি পেশেণ্টের প্রেসক্রুপসনে লিখেছিলেন, 'একপোয়া করিয়া তুধ খাইবে, নিজের না থাকিলে জমিদারের গরু তুইয়া খাইবে।' আজ শিখার প্রেসক্রুপসনে লিখে এসেছেন, 'শীঘ্র বিবাহ দিতে হইবে।'

আমি বললাম, 'শিখা কে ?'

তমাল বলল, 'আমাদের একজন কমরেড্। আজ সকালে পুলিশের তাড়া খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। হাতে পায়ে চোট লেগেছে। ওরই জন্য ডাক্তারবাবুকে এনেছিলাম। পথে সুকুমারের সঙ্গে দেখা। আপনার জ্বরের কথা বলল। ভাবলাম হাতের কাছে যখন আছে তখন ডাক্তারবাবুকে একবার নিয়েই যাই।'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'এই সামান্য ব্যাপারে—'

তমাল বলল, 'তাতে কি হয়েছে। ডাক্তারবাবু কিছু মনে করবেন না।'

সুকুমার তখনো দাঁড়িয়েছিল। তমাল ওকে বলল, 'সাইকেল চালাতে শিখেছিস ? তাহলে যা, ওষুধটা নিয়ে আয়।'

সুকুমার চলে গেলে তমাল আবার ডাক্তারবাবুর প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'আপনি শুনলে অবাক হবেন, উনি গান্ধীবাদী। এককালে সত্যাগ্রহ করেছেন, জেল খেটেছেন। এখন ডাইরেক্ট রাজনীতি করেন না কিন্তু মণিশঙ্করের হয়ে ভোট করেন। কমিউনিজমের প্রতি ওঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু মজাটা দেখুন, উনি গরীবমানুষদের ভালোবাসেন। সেই সূত্রে আমাদেরও। মণিশঙ্কররা অনেক চেষ্টা করেও এটা বন্ধ করতে পারে নি। একটু পাগলাগোছের, তাছাড়া স্বার্থের টানও নেই কোনো, তাই কারো শাসন মানেন

না। আসলে এ ম্যান অব কন্‌ট্রাডিকশন্‌। জগৎদা বলেন, এ মানুষ বেশীদিন ওদের থাকবে না—একদিন আমাদের হবে। আমিও তাই বিশ্বাস করি।'

আমার হঠাৎ অশোকের কথা মনে পড়ল। বিকেলে শুনেছিলাম পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে। এতক্ষণ ওর কথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কিন্তু তমাল ও ডাক্তারবাবুর আকস্মিক উপস্থিতি এবং ডাক্তারবাবুর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সব ভাবনাগুলো এলোমেলো করে দিয়েছে। আমি এবার অশোকের কথা তুললাম।

তমাল বলল, 'ও জামিন পেয়েছে। কিন্তু মণিশঙ্কররা আমাদের দু'জনের নামে মামলা দায়ের করেছে।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনার নামেও? আপনি তো ছিলেন না?'

'তাতে কি আসে যায়?'

'বাঃ, আদালতে প্রমাণ করতে হবে না?'

'আদালত?' তমালের চোখে সেই পরিচিত কৌতুকের রেখা দেখা দিল, 'বুর্জোয়ারাষ্ট্রে আইন-আদালত সবই বড়লোকদের ব্যাপার। বিচারকরা তো ওদেরই মাইনে-করা লোক। যেমন বিচার করতে বলে তেমনি করে।'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'তাহলে আপনি বলছেন, এ-দেশের বিচার-ব্যবস্থাও স্বাধীন নয়?'

সে কথার জবাব না দিয়ে তমাল মিটমিট করে হাসতে লাগল। একটুপরে বলল, 'আপনাকে যে বইদুটো দিয়েছিলাম, পড়েছেন? ঠিক আছে, আরো বই দেব। আরো পড়ুন। নিজেই সব বুঝতে পারবেন।'

সুকুমার ওষুধ নিয়ে ফিরে এলে তমাল উঠে পড়ল, 'আমার সাইকেল এসে গেছে। চললাম।'

সুকুমারকে বলল, 'মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিস, বুঝলি?'

সুকুমার ঘাড় কাৎ করল। তমাল সাইকেল নিয়ে চলে গেল।

রাত দশটানাগাদ বাবা ফিরে এলেন। বিয়ের ব্যাপারে কিছু

সুবিধা না হওয়ায় তাঁর মুখ কালো। আমার জ্বর দেখে আরো চিন্তিত হলেন। মা'র মুখ থেকে সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ওই কমিউনিস্ট ছোঁড়াগুলোই ওমনি। গরীবমানুষের আপদবিপদ দেখলে ছুটে যায়। বহরমপুরের কানাই নন্দীকে দেখনি?....কিন্তু হ'লে কি হবে! এই গবর্মেন্ট ওদের দু'চোখে দেখতে পারে না। কানাই নন্দীর চাকরি চলে গেল। তুমি খোকাকে বলো, ওই তমালের সঙ্গে যেন না মেশে—'

এমনিতে আমার জ্বরজারি বিশেষ হয় না। কিন্তু একবার হলে দশপনেরো দিনের আগে ছাড়েও না। সদাশিব ডাক্তারের অষুদের গুণে এবার কিন্তু তিনদিনেই সেরে উঠলাম। শরীরটা দুর্বল ছিল বলে কলেজে গেলাম না। ক'দিন তমালও আর এল না। কিন্তু সুভাষকলোনীর একটি ছেলের হাত দিয়ে ও কিছু বই পাঠিয়ে দিল। বেশ মোটা মোটা লালমলাটের ইংরেজি বই। পাতা উল্টে দেখলাম, লেনিনের সিলেক্টেড ওয়ার্কস।

ক'দিন পরে বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছি, সুকুমারকে দেখলাম পেছনের মুচিপাড়া থেকে বেশ কিছু মেয়ে-বৌ জুটিয়ে কোথায় যাচ্ছে। ওর কিশোর হাতের মুঠোতে-ধরা লালঝাণ্ডা।

এই ক'দিন ও রোজ এসেছে আমাদের বাড়ীতে। খোঁজখবর নিয়েছে। আমার সঙ্গে ওর বেশ ভাব জমে উঠেছে। আমি জেনেছি, আমাদের তিনটে বাড়ী পরে ওরা থাকে। বাবা নেই, তিন ভাইবোনের মধ্যে ও বড়—ক্লাস নাইনে পড়ে। ওর মা হাসপাতালে কাজ করে। ওই ডাক্তারবাবুই জুটিয়ে দিয়েছেন কাজটা। তমালেরাও কিছু সাহায্য করে।

আমি বারান্দা থেকে ডেকে বললাম, 'সুকুমার, কোথায় যাচ্ছ?'

সুকুমার বেশ চড়াগলায় জবাব দিল, 'মিটিং আছে, অলকদা।'

'কিসের মিটিং?'

'চাল ডালের দাম বাড়ছে, তার জন্য মিটিং। আপনি যাবেন?'

'তমাল আসবে ?'

'হ্যাঁ, তমালদা, জগৎদা সবাই আসবে। কলেজের মাঠে—'

'ঠিক আছে, যাও।'

'আপনি যাবেন না ?'

'আমি ? আচ্ছা, দেখি—'

সুকুমাররা চলে গেল। যতদূর দেখা যায় বারান্দায় বসে আমি ওই ছোট-দলটাকে দেখলাম। পড়ন্ত রোদ্দুরের আলোতে সুকুমারের কিশোর হাতের লালফ্ল্যাগ অনেকখানি সময় ধরে চিক্-চিক্ করল। তারপর ওরা সুভাষকলোনীর মধ্যে ঢুকে পড়তে আমার সমস্ত শরীরে কেমন অস্থিরতা দেখা দিল। দীর্ঘকাল ধরে বইপত্রের মধ্যে আবদ্ধ অসার অকেজো মনটা যেন ছটফট করে উঠল। বাজারে চালের দাম, ডালের দাম, তেলের দাম বাড়ছে, মানুষের জীবনধারণের ব্যয় প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়ে যাচ্ছে, তার প্রতিবাদে শহরে গ্রামে বিক্ষোভ হচ্ছে, প্রতিবাদ হচ্ছে, মিটিং হচ্ছে—অথচ আমি তার কোনো খোঁজই রাখি না। এমন কি আমার নিজের সংসারে কোথায় কি ঘটছে সে জ্ঞানও আমার নেই। এই দুর্মূ্ল্যের বাজারে সামান্যবেতনের উপর নির্ভর করে বাবা কি করে হাটবাজার করছেন, বাড়ী ভাড়া গুনছেন, আমার পড়ার খরচ চালাচ্ছেন—সে বিষয়ে আমি একেবারে অন্ধ। ওই চৌদ্দ পনেরো বছরের বালকটি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানে, বোঝে, খোঁজ রাখে !

সহসা নিজের উপর নিজেরই রাগ হ'ল। এই প্রথম আমার মনে হ'ল, আমি বাস্তবসংসারের কেউ নই, আমি একটা পুথির মানুষ। আমার নিজের দেশে, গ্রামে, শহরে যখন এত অভাব, এত কষ্ট, এত আন্দোলন, তখন সেই নোনাজলের ঢেউ থেকে গা বাঁচিয়ে আমি একটা নির্জন দ্বীপখণ্ডে নির্বাসিত। সেখানে বড় বড় ফার্ গাছের ছায়ায় বসে আমি শেলী বায়রণ কীটস মুখস্থ করি। সেক্সপীয়রের

লাইফ ফিলজফি নিয়ে মাথা ঘামাই। মানুষের জীবন বলতে সাড়ম্বরে সোৎসাহে বুঝি—'It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing'.

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে নন্দিতাকে ডেকে বললাম, 'কাল থেকে আমি বাজারে যাব। রেশন তুলব। বুঝলি?'

নন্দিতা বলল, 'সে কি রে দাদা!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কারো কথা শুনব না।'

নন্দিতা খুব অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেদিন তমালদের মিটিঙে আমি গেলাম না। ওদের পার্টিমিটিঙে যোগ দেওয়ার মত মানসিক প্রস্তুতি তখনো আমার হয় নি। আমি চুপ করে বারান্দায় বসে থাকলাম।

একটু রাতের দিকে কলেজের মাঠ থেকে অস্পষ্টভাবে মাইকের আওয়াজ আসতে লাগল। বাবা শুনে বললেন, 'ওসব মিটিং-ফিটিং করে কচু হয়। মাঝখান থেকে মাইকঅলারা দুটো পয়সা করে নেয়!'

একটুপরেই আবার বললেন, 'তমালের গলা না এটা? ছোঁড়া বলে বেশ। খুব গরম গরম। কিন্তু মুখের বকবকানিতে কি চিঁড়ে ভেজে? না সোজা আঙুলে ঘি ওঠে?'

বাবা কি বলতে চাইছেন বুঝতে না পেরে সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকাতে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন, 'আর বাইরে থাকিস না খোকা, ঠাণ্ডা লাগবে। ঘরে যা।'

এরপর থেকে তমালের দেওয়া বইগুলো খুব যত্ন করে পড়তে লাগলাম। পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহ আমার চিরকালের। এতদিন পাঠ্যপুস্তক পড়েছি, এখন তার পাশাপাশি ওইসব অ-পাঠ্য পুস্তকও শুরু করলাম। প্রথমদিকে কিছু না ভেবে আরম্ভ করে-ছিলাম, এখন নতুন একটা বই ধরার আগে অনেককিছু ভাবতে

হয়। আগের বইটায় কি ছিল, কি বুঝেছি মনে করার চেষ্টা করি। নতুন বইয়ের সঙ্গে ভাবনাগুলো মিলিয়ে নিতে চাই। আমি মনোযোগী মেধাবী ছাত্র, আমার বুঝতে কষ্ট হয় না।

আর যত পড়ি ততই যেন বদ্ধঘরের দরজা-জানালা একটা একটা করে খুলে যায়। মানুষের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ধর্ম-সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে নতুন নতুন সংবাদ এসে পৌঁছয়। শ্রম-মজুরি-মুনাফার তত্ত্ব পড়ি—বুর্জোয়া সমাজে শোষণের নগ্নরূপ দাঁত বার করে। রাশিয়া-চীন-ভিয়েৎনামের বিপ্লবী ইতিহাস পড়ি—শোষণ-মুক্তির পথ বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে।

আর যত পড়ি, যত বুঝি, যত শিখি—মনের মধ্যে ততই ঝড় ওঠে, ফাটল ধরে। এই দেশের জল মাটি সমাজ সংস্কার থেকে উত্তরাধিকারীসূত্রে-পাওয়া পুরনো ভাবনাচিন্তা ধ্যানধারণার শক্ত মাটিতে ফাটল। মনটা দুর্ভাবনায় টনটন করে ওঠে। প্রাচীন বিশ্বাসের ভূমি থেকে বহু-কালাগত সহস্র সংস্কারের শিকড় চড় চড় করে উঠে আসে। আমার সব প্রত্যয়ের জগৎ, বোধের জগৎ কেমন এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। অস্থিরতা সমস্ত রক্তে সঞ্চারিত হয়। আমি যেন নেশাগ্রস্ত হতে থাকি।

একদিকে পুরনো বিশ্বাস টলতে থাকে, ভাঙতে থাকে, অন্যদিকে নতুন বিশ্বাস, নতুন বোধের এক আশ্চর্য দ্বীপ খুব ধীরে ধীরে মাথা তুলতে থাকে। এই ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে মনটা ক্রমশ রাগী আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। বুকের ভাঁজে ভাঁজে রক্তপাত শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ মন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় তমালের সঙ্গে দেখা হলেই আমি মারমুখী তর্ক শুরু করি: 'তুমি বলছ আমাদের সমস্ত ইতিহাস মিথ্যা, যে ইতিহাস আমরা পড়ি?'

'হ্যাঁ, অলক।' খুব শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয় তমাল, 'ইতিহাস তো রাজারাণীর গালগল্প না! প্রকৃত ইতিহাস হ'ল শ্রমিক-

কৃষকের ইতিহাস, শ্রমের ইতিহাস, শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। আমাদের দেশে তা লেখা হয় না। আমরা তাজমহল দেখে সাজাহানের প্রশংসা করি কিন্তু অর্ধনগ্ন অভুক্ত যে হাজার হাজার শ্রমিক দিনরাত পাথর কেটে ওই প্রাসাদ তৈরী করেছে, তাদের একজনের নামও কি জানি?'

'আমাদের দর্শন? যা আমাদের পরম সম্পদ, আমাদের গর্বের বস্তু?'

'অধিকাংশই গোঁজামিল। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার।'

'আমাদের ধর্ম?'

'মার্কসবাদ বলে, ধর্ম হচ্ছে আফিঙ্। মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে রাখে।'

'আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি?'

'শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার চতুর বিজ্ঞাপন। ভাষায় ও ছন্দে তা যত নিখুঁৎ—তত বেশী ক্ষতিকারক।'

'তাহলে চিরন্তন সত্য বলে কি কিছু নেই? আমরা যাকে বলি ইটারন্যাল ট্রুথ্?'

'কি করে থাকবে? সায়েন্স তো প্রমাণ করেছে সবকিছুই আপেক্ষিক, সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সাহিত্যে দর্শনে ধ্রুব কিছু নেই। এমন কি কমিউনিজম্ও শেষ সত্য নয়। সত্য যদি কিছু থাকে তা হ'ল বস্তু, ম্যাটার। বস্তুই সমস্ত পরিবর্তনের কর্তা।'

'আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক? মানবিক মূল্যবোধগুলি?'

'অর্থনীতি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার মূলকথা উৎপাদন-ব্যবস্থা।'

'আমার স্বদেশ........জন্মভূমি?'

'স্বদেশ কি মাটির, না মানুষের? যে ভূমিতে শ্রমিক কৃষকের কোনো অধিকার নেই সে তার স্বদেশ কি করে হবে। তাতে তোমার আমারই বা অধিকার কতটুকু?'

'আমাদের স্বাধীনতা?'

'স্বাধীনতা! কার স্বাধীনতা? কিসের স্বাধীনতা? পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে তাদের পুঁজি-বাড়ানোর স্বাধীনতা আর শ্রমিকের উপবাসে মরার স্বাধীনতা। বিপ্লব ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতাও আসে না। আর সে স্বাধীনতা আনতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকশ্রেণী, অনেক দুঃখে অনেক রক্তের মূল্যে।'

'আচ্ছা তমাল, রক্তপাতহীন বিপ্লব কি অসম্ভব?'

'হ্যাঁ, ওটা কবির কল্পনা, না হয় সুবিধাবাদী-সংশোধনবাদীদের আত্মপ্রতারণা। একটা শ্রেণী কায়েমীস্বার্থের দুর্গ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবে অথচ রক্তপাত ঘটবে না, এ হতেই পারে না। তবে ওরা যত রক্ত ঝরায় তার তুলনায় কমিউনিস্টরা কিছুই করে না। ভিয়েৎনামে দেখছ না আমেরিকার খুনী চেহারা?...এই চব্বিশ পরগণাতেই আজ পর্যন্ত কত কৃষককে ওরা খুন করেছে জান?'

'তুমি কি মানুষ খুন করতে পার, তমাল?

'মানুষ অর্থে?'

'যাদের তোমরা শ্রেণী-শত্রু বল? ওই জোতদার-মিলমালিক—'

'পারি।'

'পার!'

'হ্যাঁ, অসঙ্কোচে। কিন্তু ইন্‌ডিভিজুয়াল টেরিরিজমে আমরা তো বিশ্বাস করি না, অলক। আমরা চাই কালেকটিভ্‌ এ্যাকশন্‌—'

'যদি তোমাকে কেউ খুন করতে আসে?'

'তাহলে নিশ্চয়ই চৈতন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব না!'

বলে শব্দ করে হেসে উঠল তমাল।

আমিও হাসলাম।

তমালের কথাগুলো সত্য হোক, মিথ্যা হোক, বড় তীব্র, বড় নির্মম। ধারালো তীরের মত ছাড়া পেয়েই ছুটে আসে, মনের আনাচে কানাচে যে অজস্র ক্যাটলের জন্ম হয়েছে তার কোনো একটায় সরাসরি বিদ্ধ হয়। টেনে তুলতে পারি না, কষ্ট হয়। রেখে দিতেও পারিনা,

টনটন করে। আমার মধ্যে ভাঙ্গাগড়ার প্রক্রিয়া আরো প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে।

এরপর থেকে ওদের মিটিঙগুলোতেও যেতে শুরু করলাম।

একদিন তমাল আমাকে পার্টিঅফিসে নিয়ে গেল। বাজারের পিছনদিকে ছোট একতলা বাড়ী। দুটো মাত্র ঘর। সামনের দিকের ঘরটায় অফিস, সেখানে একটা চাটাই পাতা, কোণে আলমারিতে অনেকগুলো বই, দেওয়ালে ঝুলানো লেনিন আর কার্লমার্কসের ছবি, গোটা দুই ক্যালেণ্ডার। পাশের ঘরটা আরো ছোট। সেখানে মেঝের উপর তিনটে বিছানা গুটিয়ে রাখা হয়েছে। একপাশে জলের কুঁজো, কাঁচের গ্লাস, কয়েকটা কলাইয়ের থালাবাটি, একটা টিফিন-ক্যারিয়র।

তমাল ঘরে ঢুকে বিছানাটা একটু টেনে দিয়ে বলল, 'এই আমাদের আস্তানা। এখানেই বসতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তোমরা দেখছি একেবারে তপস্যা শুরু করেছ।'

তমাল হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার কি ধারণা ক্ষমতাদখলের লড়াই বিয়েবাড়ীর একটা উৎসব? আমরা বরযাত্রীর মত সেজে-গু'জে তাকিয়াবালিশ ঠেস দিয়ে সরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে যাব?'

তারপর একটু থেমে জানালার কাছে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'রাঘব, এই রাঘব—'

সেই চিৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো একটা গলা শোনা গেল, 'শু-নে-ছি-ই, ব-লু-ন!'

'দুটো চা দিয়ে যা।'

'আচ্ছা-আ-আ!'

একটুপরে কালো কুচকুচে একটা ছেলে চা নিয়ে এল। বছর আটেক বয়স, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, গা দিয়ে খড়ি উঠছে, চোখদুটো ফোলা ফোলা।

কাকের মত কালো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তমাল বলল, 'কিরে সাহেব, আজও মার খেয়েছিস ?'

ছেলেটা চুপ করে রইল।

তমাল চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠল, 'বল শীগ্‌গির—'

ছেলেটা এবার মাথা নাড়ল।

তমাল বলল, 'কি করেছিলি আজ ? ঘুমিয়ে পড়েছিলি ?'

'না।'

'তবে ? বল শীগ্‌গির—'

ছেলেটা মুখ নীচু করে বলল, 'ত্নুটো বিস্কুট—'

তমাল বলল, 'চুরি করে খেয়েছিলি ? তাহলে তো মারবেই। রাঘবটা কসাই !'

ছেলেটা এবার বলল, 'আমি মার কাছে যাব !'

বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তমালের মুখটাও কেমন বিষণ্ণ ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটার হাত ধরে কাছে টেনে এনে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এই সাহেব, কাঁদছিস কেন! কাঁদার কি হল ? এত বড় ছেলে, কাঁদছে দেখ! এই রোববার যাব তোদের গাঁয়ে, তোকে সাইকেলে করে নিয়ে যাব। ঠিক নিয়ে যাব। এখন গ্লাস নিয়ে যা, আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে।' ছেলেটা বাঁ হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে ডান হাতে গ্লাসত্নুটো নিয়ে চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ওর যাওয়া দেখলাম।

তমাল ম্লান হেসে বলল, 'কি ভাবছ ?'

বললাম, 'ওতো নেহাৎ শিশু। ওকে মার কাছ থেকে কেন নিয়ে এসেছ ?'

তমাল বলল, 'আমি কি সখ করে এনেছি ? আজকাল গ্রামের অবস্থা তো জানো না! গরীবমানুষেরা ক্ষেতে-খামারে কাজ করে যে মজুরি পায় তাতে নিজের পেটই ভরে না। ছেলেমেয়েদের

খাওয়াবে কি? সাহেবের মত হাজার হাজার শিশু আজ শহরের পথে ছিটকে পড়েছে। একটু চোখকান খোলা রাখ, এমন অনেক দেখতে পাবে।'

আমি কথা না বলে চুপ করে ভাবতে শুরু করলাম।

তারপর একসময় ভারাক্রান্ত বিষণ্ন মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। সাহেবের কান্না-করুণ মুখটা সমস্ত চিন্তা ও চেতনার মধ্যে টলটল করতে থাকল। আর এইসময় আরো একটা স্মৃতি মনের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল। অনেকদিন আগের পুরাতন স্মৃতি।

আমাদের মালপত্র ঘোড়ার গাড়ীতে তোলা হচ্ছে। আমার ঠাকুমা ঘরের ভেতর চিৎকার করে কাঁদছেন। আমাদের দুই ভাইবোনকে বুকের কাছে ধরে আমার কাকা কাঁদছেন। আমার মা কাকীমা সবাই কাঁদছে। বাবার মুখে কোনো শব্দ নেই, তাঁর দু'চোখ বেয়ে শুধু দরদর করে জলের ধারা নামছে।

বাবা তাঁর মাকে ছেড়ে আসছেন। আমরা আমাদের ঠাকুমাকে ছেড়ে আসছি। ও-দেশ এখন আমাদের নয়। ও-দেশের মাটিতে আমাদের সব অধিকার খোয়া গেছে!

কেন এমন হ'ল? কেন এমন হয়?

আমি একদিন তমালকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বেশ স্পষ্ট করে জানাল, 'শোষণের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালেরা এমনি করেই দেশ-জনপদ ভাগবাঁটোয়ারা করে নেয়। দেখছ না, ভিয়েৎনাম ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়েছে, জার্মানী আর কোরিয়া আধখানা হয়ে গেছে? ভারতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আমাদের বর্তমান সরকার শোষণের সুবিধার জন্য মুসলিম-লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত ভেঙ্গে ভাগ করার সাম্রাজ্যবাদীচক্রান্ত মেনে নিয়েছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বর্তমানে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তার মূলে কংগ্রেসের তো একটা দান আছে?'

তমাল বলল, 'অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে

তখন কংগ্রেস একটা সাধারণ প্ল্যাটফর্ম ছিল। সমস্ত বামপন্থীরাও সেখানে জড়ো হয়েছিল। এর নেতৃত্ব ছিল দেশের বুর্জোয়াদের হাতে। তারা নিজের শ্রেণীস্বার্থে সমস্ত আন্দোলনকে আপোষরক্ষার পথে চালাতে চেয়েছে। সাধারণ মানুষ যখনই বিক্ষুব্ধ হয়ে গণ-অভ্যুত্থানের পথে গেছে তখনই এই নেতৃত্ব তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। কারণ, ওরা ভয় পেয়েছে, গণ-আন্দোলন ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ নিলে নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাদের উপরও আঘাত এসে পড়বে। তাই অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ ধরণের নিষ্ক্রিয় আন্দোলন সৃষ্টি করে মানুষের সংগ্রামী শক্তিকে সবসময় নিজেদের কব্জায় রাখতে চেয়েছে। ওদের নেতারা শ্রমিক-শ্রেণীর ধর্মঘট হরতালকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন। জমিদারের পক্ষ নিয়ে কৃষকের 'খাজনা-বন্ধ-আন্দোলনে'র বিরুদ্ধতা করেছেন। নৌ-বিদ্রোহের বীর নাবিকদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়েছেন। গান্ধিজী বলেছেন, শ্রমিক-শ্রেণীকে তিনি নাকি সবচেয়ে বেশী ভয় করেন।····এই নেতৃত্বের হাত দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তুমি কি মনে কর, তা প্রকৃত স্বাধীনতা ?'

'তবে এর রূপ কি ?'

'নিছক ক্ষমতা হস্তান্তর। তাই এর চেহারা এমন খণ্ডিত, এমন পঙ্গু। তাই বাসভূমি মাতৃভূমি ছেড়ে আজ তোমরা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু—'

একদিন বাবা আবার মুখ খুললেন, 'তুই কি শুরু করেছিস বল তো ?'

আমি বললাম, 'কেন কি হয়েছে ?'

বাবা বললেন, 'আমাদের হেড্ক্লার্ক মণিশঙ্করবাবুর লোক। উনি বলছিলেন—'

কেন জানি না মণিশঙ্করের নাম শোনামাত্র আমার রাগ হয়ে

গেল। লোকটা তমাল আর অশোককে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে—মনে পড়ল। এই দুর্মূল্যের বাজারে গ্লাস-ফ্যাক্টরির দশজন শ্রমিকের চাকরি খেয়েছে, তারা সাতদিন ধরে কারখানার গেটে বসে অনশন করেছে, মণিশঙ্কর পুলিশ পাঠিয়ে ওদের হঠিয়ে দিয়েছে....তাও মনে পড়ল। আমি যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কি বলেছে ওই মণিশঙ্করের লোক?'

আমাকে এভাবে কথা বলতে দেখে বাবা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আমার বোন নন্দিতাও। আমি নন্দিতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও ইঙ্গিতে আমাকে চুপ করতে বলছে।

বাবা যথেষ্ট ক্ষুব্ধগলায় বললেন, 'মিথ্যে কিছু বলে নি। তুমি তো আজকাল ঘোরাঘুরি কর তমালের সঙ্গে। ওদের মিটিঙেও যাও—'

'মিটিঙে গেলে কি হয়? আমি সেদিন বিধান রায়ের মিটিঙেও গিয়েছিলাম।'

'ওখানে গেলে দোষ নেই। কমিউনিস্টদের মিটিঙে কেন যাও?'

'আমি সকলের কথাই শুনতে চাই। ওদের পার্টি তো বেআইনী নয়। আর এটা তো গণতান্ত্রিক দেশ।'

বাবার বার্ধক্যজীর্ণ মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল।

নন্দিতা আমাকে ডাকল, 'ও ঘরে আয় দাদা, তোর মুড়ি মেখে দিয়েছি।'

আসলে আমাকে সরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু আমার যেন জিদ চেপে গিয়েছিল। অথবা আত্মসম্মানে লাগছিল। আমি তো এখন আর ছোট নেই, যথেষ্ট বড় হয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অধিকার করতে যাচ্ছি। আমার চিন্তাভাবনা মতামতের উপর সবসময় সব ব্যাপারেই বাবা কেন হস্তক্ষেপ করবেন। এমন না, আমি কোনো গর্হিত কাজ করছি, কোনো অশালীন কাজ, যাতে করে সহকর্মীদের কাছে বাবার মাথা হেঁট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে বাবার অফিসের ওই বড়বাবু কিংবা আমাদের বাড়ীঅলা

গৌর চাটুজ্যে—কি অধিকার আছে ওদের আমার গতিবিধির উপর খবরদারি করার, তা নিয়ে রিপোর্ট করার বা বাবাকে কোনোরকম পরামর্শ দেওয়ার। ওরা মণিশঙ্করের লোক হলেই বা কি আসে যায়। এই অঞ্চলটা কি মণিশঙ্কর চৌধুরীর খাস তালুক! আমি বা বাবা কি তার ঠিকা প্রজা!

আমি নন্দিতাকে বললাম, 'মুড়িটুড়ি কি দিয়েছিস—এখানে নিয়ে আয়।'

বাবা পুরনো কথার সূত্র ধরে ভাঙ্গাগলায় বললেন, 'ওসব গণতন্ত্র টণতন্ত্র কিছু নয় খোকা। যারা যখন রাজ্য চালায় নিজের সুবিধামত আইনগুলো ভাঙ্ চুর করে নেয়। ওদের মতে মত না দিলেই কোমরে দড়ি পরিয়ে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যায়। আমি না হয় মুখ্যু কেরানি, মোটে এণ্ট্রান্স পাশ, তুই তো অনেক পড়েছিস খোকা....এই সোজা কথাটা বুঝিস না?'

বাবাকে এভাবে কথা বলতে দেখে আমার রাগ পড়ে গেল। কেমন মায়া হল। আমি আর উত্তর দিলাম না। একটুপরে বাবা নিজেই বললেন, 'একবার পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেলে তোর এত লেখাপড়ার দাম কি থাকবে? আমার এত কষ্ট, এত টাকাপয়সা সব জলে ফেলা। বড়বাবুটা আবার শুনেছি পুলিশেরই লোক—'

'তার মানে ইন্‌ফর্মার?' আমি অবাক হয়ে বললাম।

বাবা ঘাড় নাড়লেন, 'সবাই তো বলে। সত্যমিথ্যা কে জানে!'

ক'দিন পরে তমালের সঙ্গে দেখা হ'তে বড়বাবুর কথাটা ওকে বললাম। তমাল সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল, 'তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন। লোকটার নাম বিপদতারণ। সম্পর্কে মণিশঙ্করদের আত্মীয় হয়। থানার সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। টাকা পায়।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমাদের খোঁজ রাখতে হয়।'

'সব অফিসেই এমন স্পাই আছে?'

'অধিকাংশ অফিসেই আছে। সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের উপর ওরা লক্ষ রাখে। রিপোর্ট পাঠায়।'

'অবাক কাণ্ড।'

'কেন, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোতে গণতন্ত্র বলে কিছু থাকে না—যা থাকে তা হ'ল স্বৈরতন্ত্র। এই স্বৈরতন্ত্রের বীভৎসতাকে ঢাকার জন্য গণতন্ত্রের একটা মুখোশ ওরা পরে থাকে। কিন্তু সে-মুখোশের আড়াল থেকে কুৎসিৎ দাঁতগুলো প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে। দেখলে না, '৫৯ সালে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ খাদ্য-মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে কেমন করে ওরা আশিটা লোককে মেরে ফেলল? কেমন করে কেরালার কমিউনিস্ট সরকার ভেঙ্গে দিল?....শুধু কি সরকারী অফিসে? ওদের গণতন্ত্রের বাসরঘরে কে উঁকি মারছে তা দেখার জন্য সর্বত্র হাজার হাজার ইন্‌ফর্মার, আই, বি, ওয়াচার ওরা ছড়িয়ে রেখেছে।'

বলে সামান্য হাসল তমাল। ওর ঈষৎ কটা-চোখের মণিতে কৌতুক যেন ফেটে পড়তে চাইল। কিংবা ওটা বিদ্রূপও হতে পারে।

আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। আমার মুখচোখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে উঠল। তমালের কথাগুলোর সঙ্গে বার্ধক্যজীর্ণ বাবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের চেহারা এবং তার উপর কোনো-এক-ইন্‌ফর্মার বড়বাবুর শ্যেনদৃষ্টি মিশে গিয়ে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের কদর্যতাকে মুহূর্তে যেন নগ্ন করে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। বাবার জন্য অসম্ভব করুণা হল এবং এই প্রথম বাবার অসহায় ভয়, রাগ, ক্ষোভ আমার কাছে উদ্যত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। আমি আরো একটা তিক্ত, কটু, রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

বাবার নিষেধ অমান্য করে মাঝে মাঝে হাটবাজার করতে শুরু করেছিলাম। আর তা করতে গিয়ে সংসারের অভাবগ্রস্ত ক্ষুধাক্লিষ্ট রূপটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আমি দেখলাম, মাসের শেষে

মা'র হাতে পাঁচটা টাকাও থাকে না। ছেঁড়াশাড়ী সেলাই করে পরতে হয়। রাতেরবেলায় অনেকদিন তাঁর ভাত জোটে না। সেই অন্ধকার রান্নাঘরে কিছু একটা মুখে দিয়ে একঘটি জল খেয়ে এসে শুয়ে পড়েন। আমি টেরও পাই না।

একদিন ভাবাবেগে তমালকে বললাম, 'জানো, আমার মা এক আশ্চর্য মানুষ। আমাদের ঘরে যে কত অভাব, কত কষ্ট কখনো টের পেতে দিলেন না। কাল রাত্রে হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে দেখি এই এতটুকু ভাত আর একটু ডাল—'

তমাল আমার হাত চেপে ধরল। অন্যদিনের মত ওর চোখে কৌতুক ঝিলিক দিল না, সমস্ত মুখ এক গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'অলক, আমার মা নেই, তবু আমি জানি। তোমাকে একদিন বলেছিলাম না, আমাদের ইতিহাস সব মিথ্যা, সব ধাপ্পা। যুগ যুগ ধরে আমরা শুধু ভোগেরই ইতিহাস লিখেছি, শুধু বিলাসের ইতিহাস। কখনো বা আরো একটু নেমে জাতীয়তাবাদের রাংতায় মোড়া সস্তা সেন্টিমেণ্টের ইতিহাস। কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হচ্ছে খেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, আমাদের মত মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে। ইতিহাস তৈরি করছে আমাদের মা-বোনেরা, এই সমাজ-ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত, অপমানিত, ক্ষুধার্ত....অথচ ঘরে ঘরে বুকের রক্ত ঢেলে যারা মৃত্যুঞ্জয়ী সৈন্যবাহিনী লালন করছে, নতুন ইতিহাসের ভিৎ কাটছে—'

বলতে বলতে তমালের কণ্ঠ আবেগে উদ্দীপ্ত হ'ল। মুখের বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে উত্তেজনা ফুটল। উজ্জ্বল দুইচোখ নক্ষত্রের মত দপ্ দপ্ করতে লাগল। তমালকে আমার অনেক কাছের অথচ অনেক দূরের মানুষ বলে বোধ হ'ল। আমার বুকেও গুম্ গুম্ শব্দে মেঘ ডাকল। স্নায়ুতে শিরায় রক্তধারা উষ্ণতা পেল। আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। আচ্ছন্ন আবিষ্টের মত নিজের মনেই বলে উঠলাম, 'না, আমি জানি না সে কোন্ ইতিহাস। কি তার রূপ, কেমন

তার চরিত্র। শ্রমিকে কৃষকে মিলে যে ইতিহাস রচনা করবে তার সঙ্গে আমার মত মধ্যবিত্তের যোগ কোথায়, ভূমিকা কি, তাও আমি জানি না। কিন্তু তমাল, তোমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। তোমার কথায় আমার মা যেন আজ গোর্কির 'মাদার' হয়ে গেল। আমি যেন মাকে এই প্রথম আবিষ্কার করলাম।'

তারপর দিন কাটতে লাগল।

খাদ্যের দাবিতে এখানে ওখানে আন্দোলন শুরু হ'ল। কলকাতায় ট্রাম পুড়ল, বাস পুড়ল। এই অঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টির তেমন জোর না থাকলেও কিছুকিছু সভাসমাবেশ হতে লাগল। একদিন কলেজে ধর্মঘট করতে গিয়ে জয়শঙ্করের অনুগামীদের হাতে অশোক মার খেল। খাদ্যের জন্য কৃষকমিছিল এনে এস-ডি-ও সাহেবের এজলাশ ঘেরাও করার অপরাধে তমালকে পুলিশ জেলে নিয়ে গেল। দিনসাতেক ধরে রেখে আবার ছেড়েও দিল।

'৬২ সালের নির্বাচনে জগৎবল্লভবাবু পরাজিত হলেন।

কিন্তু এই নির্বাচন উপলক্ষে ছোট একটি ঘটনা দেখলাম। ঘটনাটি মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। বাজারে যেখানটায় রাঘবের চায়ের দোকান তারপাশেই একটা দেয়ালে তমালরা পোস্টার মেরেছিল। লালকালিতে আঁকাবাঁকা মেয়েলিঅক্ষরে লেখা পোস্টার: 'কায়েমী-স্বার্থের তল্পিবাহক মণিশঙ্করের বিরুদ্ধে কৃষকনেতা জগৎবল্লভকে ভোট দিন।'

তমাল অনেকদিন কলেজে না যাওয়ায় দেখা হচ্ছে না ভেবে ওর খোঁজে পার্টিঅফিসের দিকে যাচ্ছিলাম। সেই দোকানটার কাছাকাছি এসে দেখলাম জনাপাঁচেক লোক পোস্টারটার সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'এই গণশা, এটা কাদের বাড়ী রে।'

গণশা বাড়ীটার আপাদমস্তক দেখে বলল, 'গৌর চাটুজ্যের—'

প্রথমলোকটা বলল, 'তবে শালা কমুরা পোস্টার মেরেছে যে। ওদের বাপের বাড়ী ? ছিঁড়ে ফেল—'

গণশা এগিয়ে গিয়ে পোস্টারটা ছিঁড়তে শুরু করল।

আর ঠিক তখুনি রাঘবের চায়ের দোকান থেকে কাকের মত রুক্ষ কালো সেই ছেলেটা ছুটে এসে গণশার হাত টেনে ধরল, 'ছিঁড়ছ কেন ? জগৎদাত্বরা লাগিয়েছে।'

গণশা খুব অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে অল্পকাল তাকিয়ে থেকে গর্জে উঠল, 'কে রে শালা, শুয়োরের ছানা !'

দলের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'কষে মার এক লাথি।'

ছেলেটা তবু বলল, 'না, ছিঁড়বে না ! ছিঁড়বে না বলছি—'

গণশা সত্যি সত্যি একটা চড় মারল। ছেলেটা মাটিতে ছিটকে পড়ল। তারপরই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। চায়ের দোকান থেকে রাঘব ছুটে এসে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। গণশারা পোস্টারটার এখানে ওখানে ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে বীরদর্পে চলে গেল। যাওয়ার আগে রাঘবকে শাসিয়ে গেল, 'বাচ্চাটাকে কোত্থেকে জুটিয়েছিস বাবা ? খুব তেল হয়েছে ? দেব একদিন চালাখানায় আগুন লাগিয়ে, বুঝবি তখন !'

মধ্যবয়সী রোগাপাতলা চেহারার রাঘব একটা কথাও বলল না। একধরণের অদ্ভুত ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল। তারপর ওরা চলে যেতে এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে একদৌড়ে গলিতে ঢুকে পড়ল। ওর দোকানের পিছন দিকেই তমালদের পার্টিঅফিস।

রাগে আমার সারা শরীর জ্বলছিল। বুঝতে পারছিলাম, ওই গণশারা মণিশঙ্করের লোক। ওরা পোস্টার ছিঁড়েছে বলে তত না, কেননা তমালদের পোস্টারকে আমি তখনও নিজের পোস্টার বলে ভাবতে শিখি নি, আমার রাগ হচ্ছিল ওরা ওই কচিছেলেটাকে মারল বলে। ওই অবোধশিশু রাজনীতির কি বোঝে ? ও কি কারো

শত্রু হতে পারে? তমাল বা জগৎদাত্মর প্রতি ভালবাসার টানেই ও পোস্টারটা রক্ষা করতে এসেছিল। ওকে এমনভাবে মারার কি অর্থ হয়। আর একদলের পোস্টার অন্যদল ছিঁড়বেই বা কেন? এটা কোন্ সভ্য রীতি? মণিশঙ্কর চৌধুরী কি এদের সাহায্যে এই-ভাবেই ভোট করেন?

মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে পার্টিঅফিসের দরজার কাছে পোঁছে সেখানেও গোলমাল শুনলাম। দেখলাম, বাইরের দিকের ঘরটায় দাঁড়িয়ে চোখ-মুখ লাল করে হাত নেড়ে অশোক চিৎকার করছে। একপাশে রাঘব দাঁড়িয়ে, অন্যপাশে জগৎবল্লভবাবু বসে কি কাগজপত্র দেখছেন। শুনলাম, অশোক বলছে, 'আপনি বুঝছেন না জগৎদা, ওই গুণ্ডাগুলো প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠে বসেছে। ওদের শায়েস্তা করা দরকার। আমি এখুনি ফুলতলির ব্যারাকে যাচ্ছি, ওয়ার্কারদের নিয়ে এসে ওদের ঠাণ্ডা করছি—'

জগৎবল্লভবাবু কাজ করতে করতে মাথা নাড়লেন, 'না অশোক, ওতে হাঙ্গামা হবে। আর ওরা তাই চায়।'

'তাই বলে রোজ রোজ ওরা আমাদের পোস্টার ছিঁড়বে?'

'তোমরা রোজ রোজ লাগাবে!'

'কত লাগানো যায়?'

'তাহলে লাগাবে না! ওদের মত আমাদের পার্টি তো শুধু কাগজে প্রচারের উপর নির্ভর করে বাঁচে না! আমরা বাঁচি আমাদের সংগঠনের মধ্যে। সংগঠনকে আরো শক্ত কর, তখন আর পোস্টার লিখবার দরকার হবে না কিংবা লিখলেও কেউ ছেঁড়ার সাহস পাবে না।'

অশোক অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল, 'আপনি শুধু আপোষের কথা বলেন, জগৎদা!'

এবার জগৎবল্লভবাবু মাথা তুললেন। তাঁর প্রবীন তামাটে মুখে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। কাঁচাপাকা ভুরু কুঞ্চিত হ'ল। চোখ থেকে

চশমাখানা খুলে একটু হাসলেন। তারপর মৃদু কিন্তু ভারিগলায় বললেন, 'কমরেড্, এক পা আগে দুই পা পিছে! অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা মার্কসবাদবিরোধী। ভুলে যেও না, এ-অঞ্চলে আমরা এখনো দুর্বল, আমাদের ভূমিকা আত্মরক্ষামূলক। সহজ উত্তেজনার পথ ছেড়ে দৃঢ়ভাবে সংগঠন গড়ে তোল। এটাই তোমার কাজ।'

অশোক আর কিছু বলল না। একটু চুপ করে থেকে ভোটার-লিস্টটা নিয়ে রাঘবকে ডেকে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কিছু বলল না।

আমি খুব মনোযোগে জগৎবল্লভকে দেখছিলাম। এর আগেও দেখেছি। কিন্তু এই ছাদচাপা আগোছালো অফিসঘরটার মধ্যে একরাশ কাগজপত্র নিয়ে কর্মরত এই গ্রামীণ বৃদ্ধমানুষটির সহজ অথচ সংযত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আমাকে মুগ্ধ করল। আমার মনের উত্তেজনাও ধীরে ধীরে কমে এল। পরিবর্তে খুব মৃদু অথচ সংবদ্ধ একটা সাহসে বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আমি যেন আমার সামনে বহুদূরবিস্তৃত, ব্যাপক কোনো সংগঠনের অনুত্তেজিত সুশৃঙ্খল রূপ দেখতে পেলাম, তারা যেন সারিবদ্ধ সৈনিকের মত তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে। আর এই বৃদ্ধ গ্রামীণ মানুষটি তাদের দিকে উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন।

আমি খুব সহজগলায় বললাম, 'জগৎদা, তমাল নেই?'

জগৎবল্লভ আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'না তো। গ্রামে গেছে। ক'দিন থাকবে। আপনি কে ভাই?'

বললাম, 'আমি অলক, তমালের বন্ধু।'

জগৎদা বললেন, 'ও। আপনার কথা শুনেছি।........কিছু বলবেন?'

'না জগৎদা। তমাল এলে আরেকদিন আসব।'

একটু হেসে জগৎবল্লভ বললেন, 'আসবেন। নিশ্চয়ই আসবেন।'

নির্বাচনের ফল বেরুলে জগৎবল্লভবাবু দশহাজারের কিছু বেশী ভোটে হারলেন। মণিশঙ্করদের বিজয়মিছিল পটকা ও তুবড়ি ফাটিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে শহর পরিক্রমা করল।

হামলা হতে পারে আশঙ্কায় তমালেরা পার্টিঅফিসে তালা লাগিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। একদিন খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম অফিসের দরজায় কাঁচাহাতে লেখা পোস্টার, 'পার্টি খিদিরপুরের ডকে গিয়াছে, সেখানে নীলাম হইবে।' তার পাশে দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা, 'জগৎ শালার মুণ্ডু চাই।'

নির্বাচনী উত্তেজনা কমে যেতেই তমালেরা আবার কিন্তু ফিরে এল। আবার অফিস-ঘরের তালা খুলল। আবার এই শহরের পথেঘাটে, ধাঙ্গরপাড়া মুচীপাড়ায়, ময়দাকলের কুলি-ব্যারাকে, কাঁচ-কলের মজুর-বস্তীতে সেই পরিচিত মূর্তিগুলির সঙ্গে হ্যাণ্ডলুমের ঝুলখাটো পাঞ্জাবি, লংক্লথের পাজামা, কাঁধে ঝোলানো খয়েরি রঙের ব্যাগ, হাতে কিছু কাগজপত্র ইস্তাহার সমেত তমালকেও ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।

আমার পরীক্ষা সামনেই।

আমি অন্যকিছু ভাবনাচিন্তা ছেড়ে পড়াশুনায় মন দিলাম। তমালের দেওয়া নানারকম ইস্তাহার ও বইগুলো আমার কাছেই থাকল। কখনো কখনো একঘেয়ে পাঠ্যসূচীতে ক্লান্তি এলে লেনিনের ওয়ার্কস, ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ পড়তে লাগলাম। এতদিনে আমার মনে ভাঙাগড়ার একটা স্তর বোধহয় শেষ হয়েছে। সেই প্রবল অস্থিরতা কাটিয়ে উঠে আমি দ্বিতীয় স্তরে পা রেখেছি। সেখানে তেমন সন্দেহ বা অবিশ্বাস নেই, কিন্তু ভয় আছে, প্রশ্ন আছে। তমাল আমার বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে উঠেছে—কিন্তু এখনো কমরেড্ হয় নি।

তারপর নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো এসে গেল। সেই আশ্চর্য মাস, আশ্চর্য বছর।

১৯৬২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর।

কোথাও কিছু নেই, অকস্মাৎ ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত থেকে গুলিগোলার শব্দ ভেসে এল। সেই শব্দে নাকি উত্তাল হ'ল আসমুদ্র হিমাচল! সারা দেশ জুড়ে ত্বরিৎবেগে তপ্ত দেশপ্রেমের বন্যা বইতে শুরু করল। প্রাচীরে প্রাচীরে দেশপ্রেমের পোস্টার পড়ল। পণ্ডিত নেহেরুর আজানুলম্বিত ছবির সঙ্গে মুদ্রিত হ'ল প্রতিরক্ষার উদাত্ত আহ্বান। কাগজে কাগজে ছাপা হ'ল তার বিজ্ঞাপন। পাড়ায় পাড়ায় মিছিল বেরুল, মিটিং হ'ল। আকাশবাণীতে অষ্টপ্রহর দেশাত্মবোধের সুর বাজতে লাগল। সিনেমাগৃহে জাতীয়সঙ্গীত চালু হ'ল। প্রতিরক্ষা বণ্ড, প্রতিরক্ষা তহবিলের সঙ্গে এল জরুরীঅবস্থা। বিনাবিচারে আটক রাখার জন্য ঘোষিত হ'ল ভারতরক্ষা আইন।

চারদিকে সে কি গেল গেল, সাজ সাজ রব! সে কি প্রবল উদ্দীপনা, প্রখর রোমাঞ্চ!

বড়লোকের মেয়েরা গলা থেকে হার, হাত থেকে চুড়ি, আঙুল থেকে আংটি খুলে প্রতিরক্ষাফাণ্ডে জমা দিল। ছেলেরা দিল রক্ত আর টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করার ফাঁকে ফাঁকে কোনো স্বদেশানুরাগিনী কোলে উলের গুলি রেখে ভাবাবিষ্ট মুখে মোজা মাফলার সোয়েটার বুনতে লাগল। বাংলাদেশের কাগজগুলো সকাল-সন্ধ্যা দেশপ্রেমের গান গল্প কবিতা ছাপাতে লাগল। সাহিত্যিকেরা দলবেঁধে এক বিখ্যাত সাপ্তাহিকে স্বীকারোক্তির দাসখৎ লিখে দিল। সিনেমা আর্টিস্টরা পর্যন্ত স্যুটিং বন্ধ রেখে মাঠে নেমে ক্রিকেট খেলল, রাস্তায় গান গেয়ে মিছিল করে টাকা তুলল।

জরুরীঅবস্থায় আমাদের পরীক্ষা গেল পিছিয়ে।

এই অঞ্চলেও মিছিল হ'ল, মিটিং হ'ল। প্রতিরক্ষাফাণ্ডে টাকা তোলার জন্য কমিটি তৈরী হ'ল। পদাধিকারবলে এস-ডি-ও সাহেব তার প্রেসিডেন্ট, মণিশঙ্কর ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অধর হালদার সম্পাদক আর শ্রীযুক্ত গৌরহরি চ্যাটার্জী

তার কোষাধ্যক্ষ। একদিন কোর্ট-প্রাঙ্গণে চাঁদোয়া খাটিয়ে দেশপ্রেমের আবেগবশত গভীর গদগদ মুখ ও অর্ধনিমীলিত নেত্রে ওঁরা সকলে উপবিষ্ট হলেন। এই শহরের কিছু মানুষ লাইন বেঁধে টাকা দিয়ে এল। গয়নাও দিল কেউ কেউ। অধর হালদারের মেয়ে কমলা, গৌর চ্যাটার্জীর বউ হেমনলিনী মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কান থেকে দুল, হাত থেকে চুড়ি খুলে দান করল। মাইকে বারংবার তাদের নাম ঘোষিত হ'ল। ফটোগ্রাফাররা ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দে ছবি তুলল। হাততালির প্রবল শব্দে কোর্ট-প্রাঙ্গণের বৃদ্ধ বটগাছ থেকে দেড়ডজন কাক কা কা শব্দে উড়ে গেল।

আমার বাবাও, যেন মন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছেন এমন বিনীত আপ্লুত ভঙ্গিতে লাইনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি টাকা দিয়ে ফেললেন। বাড়ীতে এসে বললেন, 'তোর নামেই রসিদটা কাটালাম খোকা। অফিসে গিয়ে বড়বাবুকে দেখাব!'

আমি একটুও প্রতিবাদ করলাম না।

বস্তুত ঘটনার আকস্মিকতায় ও সংবাদপত্রের প্রচার-মাহাত্ম্যে আমিও তখন দিশেহারা। তাছাড়া মনের মর্মমূলে বাসা বেঁধে আছে যে সংস্কার তার তাড়না বড় প্রবল। সে সংস্কার আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। শুধু বই পড়ে তাকে তাড়ানো যায় না। দুঃখ-দারিদ্র্য-তপ্ত সংগ্রামের মৃত্তিকা ছেনে নতুন বিশ্বাস নতুন সংস্কারের মূর্তি প্রস্তুত করতে হয়। শ্রমিক-কৃষকের সান্নিধ্যসিক্ত ভালবাসার বেদীমূলে তাকে স্থাপন করতে হয়। এই নতুন মূর্তিই পুরনো অন্ধ সংস্কারকে ঠেলে সরাতে পারে। সেদিন জগৎবল্লভের শিক্ষায় আর অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সেই বিশ্বাস তমালেরা লাভ করেছিল। আমি করি নি।

তাই আমি, সামান্য মধ্যবিত্ত এক বুদ্ধিজীবী, ভাঙতে ভাঙতে কাঁপতে কাঁপতে ভাবলাম, আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার মাটি আক্রান্ত হয়েছে। ভাবলাম, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জন্মভূমি আক্রান্ত হওয়া আর জননী আক্রান্ত হওয়া একই কথা। যে কোনো মূল্যে যে কোনো শর্তে জন্মভূমিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার! মনে পড়ল, 'ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত!'

তখন চারদিক থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'যারা জন্মভূমিকে রক্ষা করে না, শত্রুকে শত্রু বলে ধিক্কার দেয় না, প্রতিরক্ষাতহবিলে সোনা দেয় না, টাকা দেয় না, রক্ত দেয় না, তারা বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, মাতৃঘ্ন! তারা দেশের মাটিতে পঞ্চমবাহিনী, চীনের দালাল, চীনের চর। তাদের শায়েস্তা কর, গ্রেপ্তার কর, পিটিয়ে মার, পুড়িয়ে মার!

ডাক উঠতে না উঠতে চতুর্দিক থেকে দেশপ্রেমিকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরকারের পুলিশ, গোয়েন্দাবাহিনী তৎপর হ'ল। অনেক রাজনৈতিক দল লাঠি হাতে শিকার খুঁজতে বেরুল। এমন কি তমালদের পার্টির একটা ছোট অংশও এই মারণযজ্ঞে যোগ দিয়ে দেশপ্রেমিকের সার্টিফিকেট কিনল।

তখন রোজই কাগজ দেখতাম। রোজই নতুন খবর, টাটকা খবর। আজ পার্লামেণ্টে হৈ-হট্টগোল, কাল বিধানসভায় হাতাহাতি। আজ কলকাতায় তিনটে পার্টিঅফিস পুড়ল তো কাল বর্ধমানে একজন দেশদ্রোহীকে পিটিয়ে মারা হ'ল! কলকাতার চীনাবাজার থেকে একদল চীনাকে ধরা হ'ল একদিন। ওদের দু'একটা জুতোর দোকান লুঠ হ'ল, বউবাজারে একটা কাঠের আসবাবের দোকান পুড়ে গেল। এই অঞ্চলে স্টেশনের কাছে একজন চীনা দাঁতের ডাক্তার ছিলেন। একদিন তাঁর ডিসপেন্সারির সাইনবোর্ডটায় সশব্দে একখানা ইঁট পড়তেই তিনি তালা ঝুলিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। বিধানসভায় নানা বাদ-প্রতিবাদ, ক্ষোভ, ঘৃণা, ধিক্কারের মধ্যে নতুন একটা কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'আমরা কমিউনিস্ট হলেও সাচ্চা দেশপ্রেমিক। পণ্ডিত নেহেরুর প্রগতিশীলতায় আমরা বিশ্বাস করি এবং তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সমর্থন করি।'

আরো শুনলাম, এই অঞ্চলের সদাশিব ডাক্তার ঘরে ঘরে রোগী দেখতে গিয়ে অভ্যাসমত তড়বড় করে বলছেন, 'এসে গেল বাবা, এসে গেল! এবার আর ভোটের বাজি না, বরফ ঠেঙিয়ে চীনারা সব এসে গেল! গায়ে-গতরে বল কর বেটারা, যুদ্ধে যেতে হবে যে!'

রোগীর বুকপিঠ দেখতে দেখতে মোটাগলায় আবৃত্তি করছেন, 'দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ, নির্মম নির্ভীক!'

তেমন রোগী হ'লে বা রোগীর কাছে ছেলে-ছোকরা কেউ থাকলে আবৃত্তি থামিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, 'কার কবিতা? জানিস না? কি ঘোড়ার ডিম পড়িস? ছ্যা ছ্যা! বলি নিজের বাপের নাম জানিস? না তাও জানিস না?'

প্রেসক্রিপসনের তলায় বড় বাংলাহরফে 'জয় জন্মভূমি' লিখতে লিখতে বলছেন, 'মায়ের নামে চাঁদা দিয়েছিস? দিস নি? কি করেই বা দিবি? তোর পেটেই তো ভাত জোটে না!'

কাউকে বলছেন, 'দিস, কিছু দিস। না দিলে চাকরি থাকবে না, ধরপাকড় করবে!'

বাচ্চাদের পেট টিপতে টিপতে চোখ বড় বড় করে ছড়া কাটছেন, 'চৌ এন লাই, চৌ এন লাই, ধর বেটাকে, কর জবাই!'

আর পরিচিতদের বলছেন, 'শেষকালে ওই গৌরহরিকে ফাণ্ডের ট্রেজারার করলি? ও যে মায়ের ডাকাত-ভক্তরে!' বলেই লম্বা করে জিব কাটছেন, 'দেখিস বাবা, গৌরকে বলে দিস না যেন! মানহানি ঠুকে দেবে!'

এই অঞ্চলের কমিউনিস্টপার্টির অফিস আক্রান্ত হ'ল একদিন।

পার্টিঅফিসের কাগজপত্র পুড়ে ছাই হ'ল। লেনিনের ছবি ভাঙল, স্টালিনের বইগুলো রাস্তায় ছিটকে পড়ল, কার্লমার্কস পুড়ে গেল। পার্টিসম্পাদক জগৎবল্লভবাবু দু'হাতে দরজা আটকে দাঁড়িয়েছিলেন,

কুৎসিৎ গালিগালাজের সঙ্গে মাথায় একটা লাঠি পড়ল। তাঁকে বাঁচানোর জন্য অশোক ছুটে আসছিল, তিন-চারজন মিলে তাকে ধরে ফেলে কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। কয়েক মিনিট পর ওরা চলে যেতে পুলিশ এসে দাঁড়াল।

মাথার ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরে জগৎবল্লভ বললেন, 'অশোক, তুমি পালাও। তাড়াতাড়ি—'

আহত অশোক ফুঁসে উঠল, 'না জগৎদা!'

জগৎবল্লভ বললেন, 'মূর্খ, ধরা পড়ে কি লাভ? পালাও! যতদিন পার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকে কাজ করবে—'

অশোক তবু বলল, 'না জগৎদা, আপনাকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না।'

এবার জগৎবল্লভ রূঢ়ভাবে ধমকে উঠলেন, 'অশোক, কমিউনিস্ট পার্টিতে সস্তা সেন্টিমেন্টের জায়গা নেই। আমি যা বলছি, তুমি তা কর।'

পার্টিঅফিসের পেছনদরজা দিয়ে পাঁচিল টপকে অশোক পালিয়ে গেল। আহতবৃদ্ধ জগৎবল্লভ পালাতে পারলেন না। পুলিশ এসে শান্তিভঙ্গ সমেত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁর কোমরে দড়ি পরিয়ে প্রকাশ্যরাস্তায় পায়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে গেল। এই অঞ্চলের পুরনো ও নয়া দেশপ্রেমিকরা ব্যঙ্গবিদ্রূপসহ দু'চারটে ছোটখাটো ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাঁর অনুগামী হ'ল।

কলেজ যাওয়ার সময় আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলাম। আমার সমস্ত অনুভূতিতে একটা ক্রুদ্ধ যন্ত্রণাবোধ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আমি এর ভালমন্দ ন্যায়অন্যায় বিচার করতে পারলাম না। উদ্যতফণা অজগরের ক্রুদ্ধদৃষ্টির সামনে ভীত খরগোশ যেমন দমবন্ধ করে স্থির হয়ে থাকে, উত্তপ্ত দেশপ্রেমের অন্ধ আবেগ আমাকে তেমনি বুদ্ধিশূন্য বোধশূন্য করে রাখল। বদ্ধ মাতালের মত আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপর একসময় নজরে এল, দেশপ্রেমিকদের এই দলটা থেকে অনেকখানি দূরত্ব রেখে পায়ে পায়ে হেঁটে আসছে রুক্ষ রুগ্ন কাকের মত কালো সেই ছেলেটা। তার মুখটা বিবর্ণ কিন্তু বিস্ফারিত কচিচোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। সে অবাক হয়ে জগৎদাদুর হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ির অর্থ খুঁজছে!

আরো একজন রিকশা থামিয়ে থমথমে মুখে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছেন—তিনি সদাশিব ডাক্তার। সম্ভবত রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন আর অভ্যাসমত রিকশাওলার সঙ্গেই বকবক করছিলেন। এখন একেবারে চুপ। তাঁর ফর্সামুখের উপর রোদ পড়ে টকটক করছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে গালে হাত ঘষে ঘষে তিনি কি যেন ভাবছেন। হয়ত নিজের জীবনের জেল-যাত্রার কথা তাঁর মনে পড়ছে। কিংবা হয়ত অন্যকিছু।

কিন্তু আমার নেশা কাটতেও সময় লাগল না।

সেইদিনই বিকেলের দিকে ইউনিভার্সিটিতে একটা ঘটনা ঘটল। আমার চোখের সামনেই।

চারতলার লাইব্রেরি থেকে পড়াশুনা করে, বই পাল্টে ফিরে আসছিলাম। পুরনো সেনেটহল ভাঙা হয়ে গেছে তখন। নতুন বাড়ীর ভিৎ উঠছে। চারদিকে পাথরকুচি, বালি, লোহালক্কড়, মেসিনপত্র।

একটা বিশালাকৃতি ক্রেণের আড়াল থেকে কিছু উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। পাঁচ-ছয়জন ছেলে মিলে ঘিরে ধরেছে তমালকে। তারমধ্যে একজন আমার চেনা। মণিশঙ্করের ছেলে জয়শঙ্কর। ও নাকি আইন পড়ছে এখানে। চোঙা প্যাণ্ট, নাইলনের ডোরাকাটা গেঞ্জি, চোখে সানগ্লাস। তমালের সেই পরিচিত পাঞ্জাবি-পাজামা, শুধু কাঁধে আজ খয়েরি রঙের ঝোলাটা নেই।

ওকে দেখে হয়ত ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্যই সামান্য দুশ্চিন্তা হ'ল। ক'দিন থেকে ও শহরে নেই, বোধ হয় জানে না, আজ সকালেই পার্টিঅফিস আক্রান্ত হয়েছিল, অশোক আহত অবস্থায় গা ঢাকা দিয়েছে, জগৎবল্লভকে ধরে নিয়ে গেছে। সমস্ত শহরে এখনো উত্তেজনা। তমাল সেখানে গেলে গ্রেপ্তার হবে, আক্রান্তও হতে পারে। আজ ওর সেখানে না যাওয়াই উচিত।

তমালকে এ কথাগুলো বলা আমি কর্তব্য মনে করলাম। সারা দেশ জুড়ে যা-ই ঘটুক তমালের প্রতি আমার কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। ওদের কারো প্রতিই কি ছিল?

ওদের উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে ঢুকতে সাহস করলাম না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার কেমন ভয় ভয় করছিল। জয়-শঙ্করেরা তমালকে ঘিরে ধরেছে কেন? কি মতলবে? ওদের লোকই তো সকালে পার্টিঅফিস পুড়িয়েছে, জগৎবল্লভবাবুকে লাঠি দিয়ে মেরেছে। এখানে তমালকে ওরা আক্রমণ করবে না তো? আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাম্‌গাছের দীর্ঘ ছায়ায় ঢাকা লনটা ফাঁকা। কিন্তু দ্বারভাঙাবিল্ডিং-এর বারান্দায় কেউ কেউ ঘোরাফেরা করছে। ক্যান্টিন থেকেও কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ও-পাশে অনেক কুলিমজুর নতুন সেন্টিনারিবিল্ডিং-এর ভিতে ঢালাইয়ের কাজ করছে। আমি মোটামুটি আশ্বস্ত হলাম।

কিন্তু আমি যা আশঙ্কা করছিলাম তাই ঘটতে লাগল। জয়শঙ্করদের একজন কথা বলতে বলতে তমালের ডানহাতটা শক্ত করে চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'ওসব বুজরুকি ছেড়ে যা বলেছেন এখুনি উইথ্‌ড্র করুন।'

তমাল হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, 'না, বরং আবার বলছি শুনুন, কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনো অন্যদেশ আক্রমণ করে না।'

'রাস্কেল। উইথ্‌ড্র তোমাকে করতেই হবে। এখুনি, এই মুহূর্তে।'

'যদি না করি ?'

'তাহলে আমরা তোমাকে খুন করব।'

'খুন করবেন ?'

আমি তমালকে যেন হাসতে দেখলাম। হাসিটা ছুরির ফলার মত চকচকে, সামান্য বক্র কিছু বা হিংস্র অথচ অদ্ভুত শান্ত। রুক্ষ চুল সিংহের কেশরের মত ফুলিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর পড়েছে, চোখ জ্বলজ্বল করছে। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'যে-শ্রেণীতে আপনাদের জন্ম, খুন করার অভ্যাস তাদের বহু পুরনো। উপস্থিত আপনারা আবার দেশপ্রেমের ঠিকেদারি নিয়েছেন!'

'চুপ কর ইডিয়ট!' আবার একজন গর্জে উঠল, 'বেইমানের কাছে আমরা দেশপ্রেম শিখতে চাই না।'

তমাল তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাশীনাথ, আমি তোমাকে চিনি। তোমার বাবা ডিস্টিলড্ ওয়াটারের এম্পুলে কলের জল ভরে ব্যবসা করেন। একবার সাক্ষীপ্রমাণ সমেত আমাদের কাগজেই বেরিয়েছিল—'

'ইউ বাস্টার্ড!'

'আর বিভূতিবাবু, আপনাদের সেই ম্যাসাজ-ক্লিনিকটা এখনও আছে নাকি ? রিফ্যুজি মেয়েদের নিয়ে যেটা চালু করেছিলেন ?'

'জুতিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেব শালা।'

'আর জয়শঙ্করবাবু তো আমাদের ঘরের ছেলে। ওর বাবা একসময় গুলি করে দুজন কৃষক খুন করেছিলেন—'

'কুত্তার বাচ্চা! চীনের দালাল!'

'এক্সিলেণ্ট! দেশপ্রেমের নামাবলী আপনাদেরই মানায়! আসুন একসঙ্গে বলি, ভারত মা-তা-কী—'

সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুষি পড়ল তমালের পেটে। তারপর আরো একটা। বুকে পিঠে মুখে ঘুষি পড়তেই লাগল। তমাল মরিয়া

হয়ে একজনের হাত কামড়ে ধরল। সে চেঁচিয়ে উঠতেই অন্যজন তলপেট থেকে লম্বা একখানা ছুরি টেনে বের করল—

রুদ্ধবাক্ নিথর হয়ে আমি সব দেখছিলাম। এক পা এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। পালিয়ে যাওয়ার শক্তিও না। কিন্তু উদ্যত ছুরিকার ধাতবঅংশ রৌদ্রালোকে ঝকমকিয়ে উঠতেই আমার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি যেন তড়িতাহত হয়ে প্রাণপণে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'তমাল—তমাল—খুন, তমালকে ওরা খুন করছে, খুন—খুন—খুন—'

আমার নাভিমূল মথিত করে উঠে আসা সেই তীব্র তীক্ষ্ণ আকাশ-ফাটানো চিৎকারে ওরা থমকে গেল। সবাই মিলে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। যে ছুরি বের করেছিল মুহূর্তে আবার লুকিয়ে ফেলল। জয়শঙ্কর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'ওই আর একটা দালাল, ধর শালাকে—'

আর তখুনি চারদিক থেকে কোলাহল উঠল। ইউনিভার্সিটির ইউনিয়নরুম আর ক্যান্টিন থেকে বেশকিছু ছেলে দৌড়ে এল। কয়েকজন মেয়ে বেরিয়ে এসে ভীত সন্ত্রস্তভাবে তাকাতে লাগল। ঢালাইয়ের মেসিন থামিয়ে কুলিরাও এগিয়ে এল।

জয়শঙ্কর চাপাগলায় বলে উঠল, 'ওরা আসছে! এদিকে বেরিয়ে চল সব! এই কাশীনাথ, এই বিভূতি, কুইক্—কুইক্—'

যাওয়ার সময় একটা বোমা ফাটাল। ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে গেল।

তমালের তখন জ্ঞান নেই। নাক দিয়ে ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। সমস্ত মুখ রক্তে মাখামাখি। কাঁধের কাছে জামাটা ছিঁড়ে গিয়ে ভেতরের গেঞ্জি বেরিয়ে পড়েছে। ক্রেণের একপাশে বেঁকে দুমড়ে অদ্ভুতভাবে পড়ে আছে শরীরটা।

সঙ্গীরা ওকে ধরাধরি করে বড়রাস্তায় নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ট্যাকসি ডাকতে লাগল। কেউ কেউ জয়শঙ্করদের পিছু নিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার নিজের সেই তীব্র আর্ত চিৎকারটাই প্রবলশব্দে আমার কানে শুধু বাজতে লাগল।

সকালে শহরের প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে বৃদ্ধ জগৎবল্লভবাবুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সেই ঘটনার সঙ্গে এই দৃশ্য একত্রিত করে আমার চোখের উপর থেকে টান দিয়ে কেউ যেন একটা পর্দা সরিয়ে দিল। বদ্ধ মাতালের নেশা সাপের কামড়ে যেমন ছুটে যায়, তার আত্মরক্ষার চৈতন্য ফিরে আসে তেমনি আমার আচ্ছন্ন অসাড় বিচারবুদ্ধি সমস্ত অন্ধ আবেগকে ঠেলেঠুলে জেগে উঠল।

তৎক্ষণাৎ আমার মনে হ'ল, এ অন্যায়, এ অযৌক্তিক।

মনে হ'ল, আমাদের চারদিকে দেশপ্রেমের এই উত্তাল উচ্ছ্বাস, এই গানবাদ্যকোলাহল, নিখাদ নয়, আন্তরিক নয়। এর পেছনে কোথাও কোনো কুটিল পিচ্ছিল চক্রান্ত আছে।

সকালে জগৎবল্লভবাবুর সেই মাথা উঁচু করে সদর্পে চলে যাওয়া, তাঁর পেছনে গুণ্ডাবাহিনীর সেই কুৎসিৎ বিদ্রুপধ্বনি, পায়ে পায়ে হেঁটে আসা নিকষকালো ছেলেটির সেই বেদনাময় ক্রুদ্ধদৃষ্টি, সদাশিব ডাক্তারের হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা, আর এইসবকিছুর সঙ্গে তমালের দাঁড়ানোর এই দৃপ্ত ঋজু ভঙ্গি, তার কটাচোখ থেকে বিচ্ছুরিত শাণিত শ্লেষের ক্ষুরধার আলোক, কাশীনাথ জয়শঙ্করদের কুকীর্তির এমন নির্ভয় নির্মম উন্মোচন, সম্মিলিত আক্রমণের মুখে দুঃসাহসিক প্রতিরোধ·······একত্র মিলেমিশে আমার মনে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করল। আর জগৎবল্লভের কপালে রক্তচিহ্নিত সেই ক্ষতস্থানের সঙ্গে তমালকে হত্যার জন্য উদ্যত তীক্ষ্মমুখ ঝকঝকে ছুরিটার কথা মনে পড়া মাত্র পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল, এত ঢাক-ঢোল প্রচারে যা বলা হচ্ছে তার সবটাই মিথ্যা, সবটাই বানানো। জগৎদা যা বলেন তাই ঠিক, তমাল যা বলে তাই ঠিক। আমার আরো বিশ্বাস করতে

ইচ্ছে হ'ল, জগৎবল্লভ, তমাল কিংবা অশোক নয়, এই কাশীনাথ, বিভূতি, জয়শঙ্করেরাই দেশের শত্রু, প্রকৃত দেশদ্রোহী !

তমালের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হ'ল। ও কোথায় আছে, কেমন আছে, কিভাবে আছে জানতে চাইলাম। কিন্তু কলেজে গিয়ে ইউনিয়নের পুরনো কর্মীদের আর খোঁজ পেলাম না। একজনকে যদি বা পেলাম সে তীক্ষ্ণচোখে আমার আপাদমস্তক দেখে বলল, 'ঠিক জানি না, আপনি ওর পার্টি-অফিসে খোঁজ নিন।' শুনে মনে হ'ল, সে জানত কিন্তু বলল না। চারদিকে তখন ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়েছে, সন্দেহ হ'লেই পুলিশ বাড়ী ঢুকে সার্চ করছে, তমালদের পার্টির একটা অংশ গোপনে গোপনে পুলিশকে সাহায্য করছে। চারদিকেই কেমন ভয় ভয় উত্তেজনা, সন্দেহ, অবিশ্বাস। আমি তমালদের পার্টির কেউ নই—ওর খবর কেউ আমাকে বলল না।

একদিন কলকাতা থেকে ফেরার পথে দেখলাম স্টেশনের দেয়ালে নতুন পোস্টার পড়েছে, 'চীনের দালাল তমাল রায়কে গ্রেপ্তার কর,' 'দেশদ্রোহী তমাল-অশোকের মুণ্ডু চাই'।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাবা বললেন, 'তোমার পড়ার টেবিলে চীন-রাশিয়ার অনেক বই আছে। ওগুলো সরিয়ে ফেল।'

আমি মুখের ভাব শক্ত করে বললাম, 'কেন, বই সরাব কেন? বই কি নিষিদ্ধ?'

'ছেলেমানুষি কর না। ও বয়স তোমার আর নেই।'

'বই আমি সরাব না। আর সরাবই বা কোথায়?'

'ওদের অফিসে পাঠিয়ে দাও।'

'পার্টি-অফিসে কেউ নেই। তালাবন্ধ।'

'তাহ'লে পুড়িয়ে ফেল!'

'বই পোড়াব? অসম্ভব!'

'পুলিশ জানতে পারলে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'অকারণে ধরলে আমি কি করব।'

'বড়বাবু সব জানে। আমার চাকরি চলে যাবে।'

'তুমি তো এবার রিটায়ারই করবে। আমি একটা চাকরি খুঁজে নেব।'

'পুলিশ-রিপোর্টে তুমিও কোনো সরকারী কাজ পাবে না।'

'বেসরকারী কাজ করব। সরকারী কাজে ঢোকার ইচ্ছা আমার আর নেই।'

'মূর্খ, গোঁয়ার! নিজের ভবিষ্যৎ নিজে নষ্ট করছ।'

'অনেকে যে জীবন পর্যন্ত নষ্ট করছে? ওই ত আমার বন্ধু তমাল—'

তমালের কথা বলতেই বাবার মুখচোখ পাল্টে গেল। ঠিক রাগ না, কেমন যেন থমথমে। ঝড়ের আগে আকাশের গায়ে ঠেস-দেওয়া নিষ্কম্প গাছের মত। নন্দিতা ভয়ে ভয়ে বাবার মুখ দেখল, আমার হাত ধরে টানল। মা বুঝলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, 'তুই ওঁর সঙ্গে কেন তর্ক করছিস খোকা? আগে তো এমন করতিস না। যা বলছেন, শোন না—'

আমি আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লাম, 'না মা, হাতে পায়ে এত ভয় জড়িয়ে বাঁচা যায় না। সামান্য ক'টা লেনিনের বই—'

বাবা চেঁচামেচি না করে খুব ক্লান্ত বিমর্ষ গলায় বললেন, 'ওকে আর কিছু বলে লাভ নেই। তমালের সঙ্গে মিশে ও-ও একটা কমিউনিস্ট হয়ে গেছে!'

তারপর সেই আসন্ন ঝড়টা প্রবল দীর্ঘশ্বাসের আকারে নেমে এল, 'আমি চোখ বুজলে তোমাদের কপালে যে কি আছে খোকার মা!'

বাবার আশঙ্কা কিন্তু সত্য হ'ল।

পরের দিন সকালেই আমাদের বাড়ীতে পুলিশ এল। ঠিক সদলবলে নয়, দু'জন সিপাইসহ থানার ও-সি হিরণ্ময় ঘোষাল। কমিউনিস্টদের ধরপাকড় ও মারধর করার ব্যাপারে এই ক'মাসেই তিনি সুনাম

কিনেছেন। তাকে দেখে বাবার মুখ শুকিয়ে গেল। মা ভয় পেয়ে চাপা গলায় ডুকরে উঠলেন। হিরণ্ময় ঘোষাল বাড়ী সার্চ করার কথা বললেন। বাবাকে সার্চ ওয়ারেণ্ট দেখালেন। বাবা কোনো কথাই বলতে পারলেন না। ছাইয়ের মত সাদা মুখ নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

দুশ্চিন্তায় আমার মুখও কালো হয়ে উঠল। আমি ভেবেই পেলাম না, আমার জন্য কেন পুলিশ আসবে। আমি তো সত্যি সত্যি কমিউনিস্ট হয়ে যাই নি। পার্টির কাজ করি না। কলে-কারখানায় ঘুরে বেড়াই না, বাজারে চাঁদা তুলি না, ইস্তাহার বিলি করি না। আমার কি অপরাধ? শুধু তমালের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে বলে? অথবা তমালকে সেদিন ওরা খুন করছিল দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম বলে? জয়শঙ্কর আমাকে দেখেছিল। হয়ত ও আমাকে চেনে। জয়শঙ্করই কি পুলিশ পাঠিয়ে দিল? অথবা গৌর চাটুজ্যে? লোকটা আমাকে একদিন তমালদের পার্টি-অফিসে ঢুকতে দেখেছিল।

ভয়ে-ভাবনায় আমি ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করলাম। আমার মনে পড়ে গেল, তমালের দেওয়া পার্টির অনেকগুলো ইস্তাহার আমার কাছে আছে। বইগুলো নিষিদ্ধ না হ'লেও ওই ইস্তাহারগুলো সম্ভবত এখন বে-আইনী হয়ে গেছে। বাবার কথা শুনে অন্তত ওইগুলো যদি কাল পুড়িয়ে ফেলতাম!

বাবাকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাহস সঞ্চয় করে শুকনো গলায় বললাম, 'বাড়ী সার্চ করবেন, আমার বিরুদ্ধে কি কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে?'

মাংসল গালে ভাঁজ ফেলে হিরণ্ময় ঘোষাল হাসলেন, 'না-থাকলে আমরা কি এখানে হাওয়া খেতে এসেছি?'

আমি দাঁত চেপে বললাম, 'কি অভিযোগ, বলুন?'

হিরণ্ময় বললেন, 'আপনাকে পরে দেখছি। এখন একবার আপনার বোনকে ডাকুন।'

'বোনকে ?'

'হ্যাঁ, শ্রীমতী নন্দিতা দেবী!'

'নন্দিতা!'

ঘরে যেন সশব্দে বাজ পড়ল। ছাদটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমি প্রবলভাবে চমকে উঠলাম। বাবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দরজার আড়ালে মা অস্ফুটে কি বললেন। নন্দিতার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ও-সি বললেন, 'মনে হচ্ছে সব আকাশ থেকে পড়লেন! কেউ কিচ্ছু জানেন না!'

আমি তীব্র কণ্ঠে বললাম, 'কি করেছে আমার বোন ?'

বাবাও অতিকষ্টে বললেন, 'কি করেছে আমার মেয়ে ?'

ও-সি বললেন, 'সে কীর্তি-কাহিনী ওর মুখ থেকেই শুনবেন! ডাকুন ওকে।'

ভীত বিবর্ণ মুখে বাবা আমার দিকে তাকালেন। আমি মা'র দিকে তাকালাম। মা খুব আস্তে নন্দিতাকে ডাকলেন। নন্দিতা মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকল।

মা'র মতই রোগা আর নিরীহ চেহারা ওর। বাইরের কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারে বলে মনে হয় না। আমার সঙ্গেই ওর যা কিছু কথা, আবদার, খবরদারি। রোগা আর যথেষ্ট ফর্সা নয় বলে অল্প পণে বাবা ওর বিয়ের সম্বন্ধ কোথাও পাকা করতে পারছেন না।

ও কি করেছে ? ও কি করতে পারে ?

নন্দিতা ঘরে ঢুকতেই বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি করেছিস তুই ? আমার ঘরে পুলিশ কেন ?'

আমিও বললাম, 'নন্দি, কি করেছিস তুই ?'

হিরণ্ময় বললেন, 'আহা, আপনারা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? যা বলার আমি বলছি। আপনি বসুন নন্দিতা দেবী।'

নন্দিতা আমার পাশে চুপ করে বসল। আমি তীব্র দৃষ্টিতে ওর মুখ দেখতে লাগলাম।

চেয়ারটা আরো একটু সামনের দিকে টেনে ও-সি নরম গলায় শুরু করলেন, 'আপনি তো কলেজে পড়েন?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ ইয়ারে?'

'থার্ড ইয়ারে।'

'অশোককে চেনেন?'

'চিনি!'

'তমালকে চেনেন?'

'চিনি।'

'সুভাষকলোনীর রেল-লাইনের ধারে একটা বাড়ীতে আপনি যান?'

'যাই!'

'কেন যান?'

'ও বাড়ীর শিখা আমার বন্ধু। আমার সঙ্গে পড়ে।'

'গুড্। আর কে কে যায় ও বাড়ীতে?'

'আমি জানি না।'

'জানেন, একটু মনে করুন! তমাল, অশোক, সুব্রত এদের ও-বাড়িতে দেখেছেন কিনা?'

'আমি দেখিনি।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। ও-বাড়িতে রেগুলার মিটিং হয়, পোস্টার লেখা হয়, বোমা-টোমাও তৈরি হয়—'

'না, আমি কিছু জানি না।'

'ন্যাকামি রাখুন!'

ভদ্রতার মুখোশ খুলতে শুরু করলেন হিরণ্ময়। চোখমুখ পাকিয়ে তুললেন। গলার স্বর রূঢ় করে বললেন, 'আমাদের কিছু

অজানা নেই। আপনি ও-বাড়ির মিটিঙের একজন রেগুলার মেম্বার! অশোক কিংবা তমাল দু'জনের কারো সঙ্গে আপনার ভালবাসা আছে—'

নন্দিতার মুখ লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে জ্বলে উঠল। ওর দুই গালে, চিবুকে আমি রক্ত জমে উঠতে দেখলাম। ও আমার দিকে আহত দৃষ্টি মেলে তাকাল।

রাগে অপমানে কালো হয়ে গেল আমার মুখ। শরীরের সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেল। রক্তের মধ্যে কি রকম একটা বাজনা বাজতে লাগল।

না, নন্দিতার ভালবাসার জন্য ততটা না—যতটা হিরণ্ময় ঘোষালের কুৎসিৎ মুখভঙ্গি করে 'ভালবাসা' শব্দটা উচ্চারণের জন্য। ঘরের সমস্ত বাতাস মুহূর্তে বিষাক্ত, অশ্লীল করে তুললেন হিরণ্ময়। শূয়োরের মত দাঁত বের করে হাসতে লাগলেন। বাবা মাথা হেঁট করলেন। মা দরজার ও-পাশ থেকে দ্রুত সরে গেলেন।

সেই মুহূর্তে হিরণ্ময়ের ঠোঁট থেকে থাবা মেরে হাসিটা ছিঁড়ে আনতে ইচ্ছে হ'ল আমার, তারপর ঠাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে। আমার সমস্ত ভয়-ভাবনা কেটে গেল। নিঃশব্দ কঠিন দৃষ্টিতে আমি হিরণ্ময়ের দিকে তাকালাম।

কিন্তু পুলিশী-রাজত্বের এই বর্বর-প্রতিনিধি ক্ষমতার গর্বে আমার সেই দৃষ্টিকে ভ্রূকুটি করে আগের মতই কুৎসিৎ গলায় বললেন, 'এবার লক্ষ্মী-সোনার মত বলুন তো নন্দিতা দেবী, তমাল বা অশোক এখন কোথায়? আমার ধারণা আপনি ওদের ঠিকানা জানেন! চিঠিপত্র চালাচালি হয়!'

নন্দিতা কিছু বলার আগে আমি উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলাম, 'না, আমার বোন কিছু জানে না! আর জানলেও আমি ওকে বলতে দেব না।'

'ইজ ইট?' হিরণ্ময় ক্রুদ্ধ-কুটিল চোখে আমার দিকে তাকালেন,

'ভাই-বোনে খুব মিল দেখছি? একেবারে সোনায় সোহাগা! কিন্তু মনে রাখবেন, থানা এখান থেকে বেশী দূরে নয়।'

'জানি, জানি!' সমান তেজে ভেতরের কোন একটা অদৃশ্য শক্তির আবেগে আমিও বললাম, 'থানায় যেতে হয়, জেলে যেতে হয়, আমি যাব। নন্দিতাকে আপনি আর একটাও প্রশ্ন করবেন না। যা, তুই উঠে যা নন্দি!'

ও-সি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাবাকে বললেন, 'আমরা বাড়ি সার্চ করছি, আপনি সঙ্গে থাকুন।'

সিপাই দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে হিরণ্ময় নিজেই বাড়ি সার্চ শুরু করলেন। আমাদের বিছানাপত্র উল্টে, ট্রাঙ্ক স্যুটকেশের সমস্ত জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, রান্নাঘরের তেল-মশলার শিশি-কৌটো ঘেঁটে বাড়ি সার্চ সম্পূর্ণ হ'ল। ইস্তাহারগুলোর কথা ভেবে আমার বুক দুরদুর করছিল। কিন্তু হিরণ্ময়রা কিছুই পেল না। এমন কি লেনিনের বইগুলোও না।

আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। বাবাও যেন একটু জোর পেলেন। মিনমিন করে বললেন, 'আপনার কোথাও ভুল হতে পারে দারোগাবাবু। আমার ছেলেমেয়েরা খুব ভাল, খুব শান্ত—'

'তাই নাকি!' ব্যর্থতার আক্রোশে হিরণ্ময় তখন ফুলছিলেন। কটমট করে তাকালেন বাবার দিকে, 'আপনার ছেলেমেয়ে কাউকেই আপনি চেনেন না। ওরা দু'জনেই কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়েছে! আমরা সব খবর রাখি। আপনি থানায় চলুন।'

বাবা আবার ভয় পেয়ে কাঁপাগলায় বললেন, 'কেন, থানায় কেন?'

'বণ্ড সই করতে হবে। আপনার ছেলেমেয়েরা এখন এই অঞ্চল ছেড়ে কোথাও যাবে না—'

বলতে বলতে রাস্তায় নেমে পড়লেন ও-সি। পেছনে সিপাই দু'জন।

আমার চোখমুখ তখনও জ্বালা করছিল। আমি খুব স্পষ্ট করে

সোজাসুজি নন্দিতার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর চোখও অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। কপালে চিক চিক করছে ঘামের ফোঁটা।

চাপাগলায় ও বলে উঠল, 'ইস, যাবে না! মগের মুল্লুক—'

আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অসম্ভব জেদি ছেলের মত বললাম, 'না, যাব না। আমরা এখানেই থাকব। এই বাড়িতেই থাকব। দেখি ওরা কি করে!'

হ্যাঁ, দারোগা সাহেব! এই অঞ্চল ছেড়ে আমরা কোথাও যাইনি। আমরা কোথাও যাব না। আমি না, আমার বোন নন্দিতাও না। আমরা এই অঞ্চলেই আছি। এই অঞ্চলেই থাকব।

সেদিন আপনার রুদ্রমূর্তির সামনে এই কথাটা জোর দিয়ে সাহস করে বলতে পারিনি। কেন না, তখনও আমার ভয় কাটেনি, বোঝা-পড়া শেষ হয়নি। তখনও মনের আনাচে কানাচে অনেক দ্বিধা অনেক সংশয় জমা ছিল।

তারপর একটু একটু করে আপনাদের মুখোশ যত খুলতে লাগল আমি ততই দ্বিধাহীন অসংশয় হ'লাম। আমার ভয় দুর্বলতা কেটে গেল। আমি নির্ভয় হ'লাম। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝলাম, এ এক আশ্চর্য দেশ, আশ্চর্য শাসন। এই দেশে, এই শাসনে বাঁচতে হ'লে, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে হ'লে, আপনাদের শক্তির দম্ভ আর অত্যাচারের অহঙ্কার চূর্ণ করতে হ'লে আমাকে ওই জগৎবল্লভ আর তমালদের পথেই যেতে হবে। ওই একমাত্র পথ। বাঁচার পথ। বাঁচানোর পথ।

জানি, এ পথে শত্রু অনেক, আক্রমণ অনেক, রক্তপাত অনেক।

জানি, এ পথের বাঁকে বাঁকে মিলিটারি-রাইফেলের উদ্যত-নল অগ্নিবর্ষী, গুপ্তঘাতকের শাণিত ছুরিকা নিপুণ লক্ষে ঝলসিত। জানি, বেইমান ও বিশ্বাসঘাতকেরা বন্ধুর ছদ্মবেশে আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু তমাল আমাকে শিখিয়েছে—শ্রমিক আর কৃষক যেদিন জাগবে সেদিন ঝড়ের বেগে খড়কুটোর মত নিমেষে সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দিগন্ত থেকে দিগন্ত লাল হয়ে উঠবে সেদিন। কৃষকের মাঠ জুড়ে সোনার ফসল দখিনা বাতাসে ঝরণার মত নাচবে। শ্রমিকের হাতে কলে-কারখানায় লোহার চাকা সেতারের তার হয়ে বাজবে। সেদিন এ দেশ আমার হবে। এ মাটি আমার হবে। আমরা সমস্ত শোষণ থেকে মুক্ত হব। সমস্ত অপমান থেকে।

এখন শুধু লড়াই আর লড়াই!

সামনে লড়াই—

যেন সেইরকমই লড়াইয়ের একটা আবেগ নিয়ে আমরা ছুটছিলাম। আমি, হিমানীশ, সুব্রত আর সমীরণ। আমাদের ধাবমান পায়ের শব্দে দু'পাশের বাড়ী-ঘরের দরজা-জানালা খুলে যাচ্ছিল। আমাদের ছুটতে দেখে ওরাও 'কি হয়েছে, কমরেড্' জিজ্ঞেস করেই ঘরবাড়ী দোকান ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ছুটতে শুরু করছিল। দেখতে দেখতে আমরা চারজন দশজন হয়ে উঠছিলাম। দেখতে দেখতে দশ একশ হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের পায়ে পায়ে ধুলো উড়ে রাত্রির আকাশ ঢেকে যাচ্ছিল।

আমাদের সকলেরই উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল মুখ, রুদ্ধ নিশ্বাস, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। সকলের মুখেই এক জিজ্ঞাসা, 'কোথায়, কোন্ অঞ্চলে, কোন্ রাস্তায় শায়িত আছে নিহত তমালের দেহ? কে, কখন, কি ভাবে খুন করল তাকে?'

'কমরেড্, ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে। মশালের আলো—'

'চলুন কমরেড্, এইদিকে চলুন। বাঁ দিকে—'

[নন্দিতা]

আমি জানতাম তমাল একদিন মরবে। যেমনভাবে ও মরেছে সেইভাবে অথবা পুলিশের লাঠি-গুলি খেয়ে। আমি জানতাম, দাদাও জানত। আমরা দু'জনেই জানতাম এই রাষ্ট্র, এই সমাজ, চারদিকের ওই হিংস্র লোভী ধনিকশ্রেণী তমালকে বেশীদিন বাঁচতে দেবে না। ওর বাঁচাটা ওদের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক, ওদের অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক। সর্বশক্তি দিয়ে ওরা তাই বিপদমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

আজ দু'মাসও হয়নি, বেইমানেরা মন্ত্রীসভা ভেঙেছে। এরইমধ্যে শহরে-গ্রামে শ্রমিক-কৃষকের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে ওরা। আরো রক্ত ঝরানোর জন্য তৈরি হচ্ছে। প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ আসছে। মিলিটারি তৈরি থাকছে। এ রাজ্যকে কেন্দ্রের উপনিবেশ করে পুলিশ-মিলিটারির তাঁবুর পেছনে প্রতিক্রিয়ার শক্তি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শিকারের জন্য ওৎ পেতে বসেছে। সুযোগ পেলেই গ্রাম-জনপদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।

এখন মূল-শত্রু আমরা—আমাদের পার্টি।

কারণ আমরা প্রতিশ্রুতি ভাঙিনি। শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেইমানি করিনি। কায়েমিস্বার্থের অনুরোধে পুলিশ পাঠিয়ে গণ-আন্দোলন দমন করিনি। আমরা সবসময় সব আন্দোলনের সামনে থেকেছি। ফ্রন্টসরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছি। আমাদের পার্টির নেতৃত্বে কৃষক বেনামজমি দখল করেছে, শ্রমিক তার মজুরি বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের বুক জুড়ে রকমারি

আন্দোলনের ঝোড়োহাওয়া বইতে শুরু করেছে। গ্রামের মানুষ হাতে হাতে অস্ত্র ধরতে শিখেছে।

মানুষকে আমরা প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটিগুলো চিনিয়ে দিয়েছি। আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখিয়েছি। পাল্টা আঘাতে শোষণের দুর্গ ভাঙ্গতে বলেছি।

আমরা তাই পয়লানম্বরের শত্রু হয়ে গেছি! আমাদের রক্তের জন্য মণিশঙ্কর আর তার নতুন বন্ধুরা তাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই অঞ্চলে সেই আক্রমণের প্রথম বলি হ'ল তমাল।

হ্যাঁ, আমি জানতাম, আমার মন সবসময়ই বলত, ও এমনি করেই মরবে। এইরকম মৃত্যুই ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। এ অবধারিত, অনিবার্য। শুধু তমাল কেন, এরপর ওরা হয়ত অশোকের দিকে নজর দেবে। তারপর সুব্রত, হিমানীশ, সুকুমার। লড়াইটা আর একটু জমে উঠলে আমার দাদাও বাদ যাবে না।

এমনি করে আমাদের আরো অনেককে মারতে মারতে যখন রক্তের ঋণ আর হত্যার পাপ আকাশপ্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে তখন উল্টে ওরাই মরতে শুরু করবে। সেদিন সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে, অশোক যেমন বলে, শ্রেণীশত্রুর রক্ত নিয়ে হোলিখেলা শুরু হয়ে যাবে! সে-খেলার ডাক যাবে ঘরে ঘরে, ক্ষেতেখামারে, কলেকারখানায়। হাতে হাতে মশাল জ্বালিয়ে লক্ষ মানুষ অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসবে। শহীদের রক্তঋণ রক্ত দিয়ে শোধ করার পালা শুরু হবে। তারপর রক্তের সেই আবির-রাঙা আঙিনায় ফুটবে মুক্তির গোলাপ। সেদিন ওদের কবর খোঁড়ার জন্য একটা মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সেই শেষ-লড়াইয়ের আগে আজ যে-লড়াই শুরু হয়েছে তাতে রাজপথে পুলিশ-মিলিটারির গুলিতে, অন্ধকারে গোপনশত্রু-আততায়ীর হাতে কিছু কিছু তমাল অশোককে মরতে হবে। এ নিয়ে আমি ভেবে কি করব। আমি চোখের জল কেন ফেলব।

ইতিহাসের চাকা ঘুরে চলেছে সামনের দিকে, আমি কি তার গতিরোধ করতে পারি ?

হিমানীশের সঙ্গে অন্ধকার মাঠ ভেঙ্গে দাদা একরকম দৌড়ে চলে গেল। আমি আর মা নিঃশব্দে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার কিছু করার নেই। এত রাত্রে আমি একা একা দাদার পেছনে ছুটতে পারি না। শিখা হলে পারত। পারত কেন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ছুটে গেছে। ও খুব সাহসী মেয়ে। ভয় কাকে বলে জানে না। প্রথমবার বেইমানেরা যখন ফ্রন্ট-মন্ত্রীসভা ভাঙল তখন সারা-রাজ্যের সঙ্গে এই শহরেও তুমুল বিক্ষোভ হয়েছিল। আমরা, মেয়েরাও, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কোর্টকাছারি ঘেরাও করেছিলাম। তখন শিখা একজন মুন্সেফের এজলাশে লাল-শালু-ঘেরা উঁচু জায়গায় উঠে চেয়ারে বসে পড়েছিল। একটা হাতুড়ি দিয়ে টেবিল ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'এটা গণআদালত। এখানে প্রফুল্ল ঘোষের বিচার হবে!'

ছেলেরা চিৎকার করে উঠেছিল, 'আসামী প্রফুল্ল ঘোষ, বেইমান হা-জি-র—'

পুলিশ কোর্ট-কম্পাউণ্ডে ঢুকে লাঠিচার্জ করেছিল। গ্রেপ্তারও করেছিল অনেক। কিন্তু শিখাকে ধরতে পারেনি।

আমি শিখা নই। অন্ধকারে গোলমালের মধ্যে আমি একা কোথাও যেতে পারি না। এখন সারারাত আমাকে অস্থিরতায় ভুগতে হবে।

একটু আগে মুচিপাড়া থেকে নিতাই বাগ্‌দীরাও ছুটে চলে গেল। ওরাও খবর পেয়ে গেছে। ওদের হাতে তেলে-রোদে-পাকানো লম্বা লম্বা লাঠি। আজ একটা মারামারি লাগবে হয়ত। তমালকে যারা খুন করেছে তাদের ওরা ছেড়ে দেবে না। এখুনি সমস্ত শহরের বুক থেকে কোলাহল উঠছে। আসল ঝড়টা এসে পড়ার আগে

গাছপালা দুলে দুলে যেমন শব্দ করে তেমনি। আর একটু পরেই ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়ে যাবে। দেশে এখন রাষ্ট্রপতির শাসন। ফল কি দাঁড়াবে কে জানে।

আমি মা'র মুখের দিকে তাকাতে মা আমার হাতটা ধরে ফেলল, 'না, তুই আজ যেতে পারবি নে। তুই ঘরে চল, নন্দি।'

আমি কাঁপাগলায় অস্ফুটে বললাম, 'কোথাও যাব না, হাত ছাড়।'

তারপর একটু থেমে অন্ধকারে কান পেতে মানুষজনের কোলাহল শুনতে শুনতে যেন নিজের মনেই বলে উঠলাম, 'গিয়েই বা আর কি হবে!'

মা আবার হাত ধরে টানল। আমি আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। খুব বিষণ্ন গলায় মাকে যেন মিনতি করলাম, 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও মা। আমি এখানে একটু বসি—'

আকাশের এখানে ওখানে অনেক তারা। সরু চাঁদের গা ঘেঁষে একফালি হালকা মেঘ। কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। বদ্ধ গুমোট গরম। আমার ঘাড়-গলা ঘামে ভিজে উঠছে। হাত-পা জ্বালা করছে। অথচ ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা। আমার শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে।

ক্রমশ কোলাহল বাড়ছে। যেন শ্লোগান দিচ্ছে কারা। নদীর উপর দিয়ে ট্রেন পার হয়ে যাওয়ার মত গুমগুম শব্দ। এখানে ওখানে মশাল জ্বলে উঠছে। আকাশে তার কাঁপা কাঁপা লালচে আভা। এখানে বসেও হাজার মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা যেন ফুলতলির দিকে ছুটে যাচ্ছে।

এই শহর রাতেরবেলায় এমন করে আগে কোনোদিন জেগে ওঠেনি। কিংবা না, ভুল হ'ল। এই কিছুদিন আগেও এমনি করে একবার চমকে উঠেছিল। দক্ষিণের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে এসেছিল মানুষেরা। কম করেও পাঁচ হাজার কৃষক। অনেক শহর অনেক গ্রাম পরিক্রমা

করে তারা আসছে। তাদের হাতে লাঠি বর্শা বল্লম, কাঁধে-ঝোলানো গামছা-কাপড়ের ছোট ছোট বোঁচকা, মুখে-চোখে গভীর প্রত্যয়, তীব্র ঘৃণা। পনেরোই মার্চের মিটিঙে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতার ব্রিগেড গ্রাউণ্ডে যাচ্ছে তারা। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন। সেই বেইমানি তারা রুখবে। রাজধানীর রাজপথে দাঁড়িয়ে ধিক্কার দেবে। ব্রিগেডে গিয়ে প্রতিজ্ঞা নেবে। তিনদিন আগে থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে ওদের। পথে আসতে আসতে ক্রমে বড় হয়েছে মিছিল। তারপর আরো বড়। হাতে হাতে লালঝাণ্ডা নিয়ে পদ্মার ঢেউয়ের মত ফুলে-ফেঁপে ফুঁসতে ফুঁসতে আসছে। দু'পাশের গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে দেখেছে সেই দৃশ্য। শহরের মানুষেরা ছুটতে ছুটতে পথের ধারে এসে ভিড় করেছে। ধাবন্ত মিছিল থেকে উত্তাপ নিয়ে গলায় গলা মিলিয়েছে।

তারপর মধ্যরাতে মিছিল ঢুকল এই শহরে। সারা শহর যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। দু'পাশের দরজা-জানালা খুলে গেল। ঘুমন্ত মানুষ তড়িঘড়ি উঠে ছুটে গেল বাইরে। তারপর এক অসম্ভব খুশির আবেগে গলা-ছেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'কমরেড্ এসে গেছে, জাঠা এসে গেছে। বলুন কমরেড, বলুন, ই-ন-কি-লা-ব—'

আমরা তৈরি ছিলাম। সারাদিন ধরে বাড়ীতে বাড়ীতে রুটি করা হয়েছে ওদের জন্য। চাঁদা তুলে অল্পস্বল্প মিষ্টি কেনা হয়েছে। কাগজের ঠোঙায় রুটি-মিষ্টি ভরে আমরা প্রায় একশজন কর্মী বড় রাস্তার দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলাম। ঝুড়ি থেকে খাবারগুলো তুলে দিয়েছি ওদের হাতে। ওরা একটুও না থেমে সেই প্যাকেটগুলো নিয়ে সামনের দিকে ছুটে গেছে। আরো পাঁচমাইল গিয়ে স্বরূপনগরের মাঠে রাতের মত ওরা বিশ্রাম নেবে। তারপর সূর্য উঠলে আবার ছুটে যাবে কলকাতার দিকে। আমাদের এলাকার অধিকাংশ কর্মী স্বরূপ-নগর চলে গেছে। কলকারখানা থেকে গেছে শ্রমিকেরা। সেখানে এই ধাবমান মিছিলকে যত্নের সঙ্গে, উষ্ণতার সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য সব তৈরি হয়ে আছে।

সেদিন মধ্যরাতের আকাশ ওদের শ্লোগানে শ্লোগানে যেমন চিরে যাচ্ছিল, পায়ের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিল এই এলাকার মাটি, আজও তেমনি উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কোথায় যেন মিল আছে এদের। সেদিন মানুষ ছুটে গিয়েছিল শোষক শ্রেণীর বেইমানিকে রুখতে। আজও মানুষ ছুটছে সেই বেইমানদের আক্রমণেরই মোকাবিলা করতে। তমালের রক্ত ওরা কিছুতেই বৃথা যেতে দেবে না।

ওদের চিৎকারে আমার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করছে। আমি তমালের মুখটা বারবার মনে করার চেষ্টা করছি। পারছি না। কিছুতেই আলাদা হয়ে, একক হয়ে সেই মুখটা ভাসছে না। আমি যতবারই চেষ্টা করছি ততবারই চোখের সামনে সেদিনের সেই পাঁচহাজার মানুষের ছুটন্ত মিছিলটা ভেসে উঠছে। সেই মানুষগুলোর রাগ ক্ষোভ ঘৃণার সঙ্গে হাতে হাতে উদ্যত অস্ত্রের ঝকমকানি আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। সেই তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লোগানগুলো আমার কানের মধ্যে এসে ফেটে পড়ছে। তমাল সেই মানুষগুলোর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না!

আমি কি তমালকে ভালবাসি?

একদিন দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছিল, 'তুই তমালকে বুঝি ভালবাসিস, নন্দি?'

আমি বলেছিলাম, 'না দাদা, আমি জানিনা। আমি কিছু জানি না।'

আমি এখনও কি জানি?

ভালবাসা কি? ভালবাসা কার নাম? তার রূপ কি? ধর্ম কি? তমালের মত মানুষদের কি কখনো ভালবাসা যায়? কেউ কি ওদের ভালবাসে? যে অর্থে আমরা, মেয়েরা, ভালবাসা বলি? ভালবাসা তো

আমাদের কাছে সাংসারিক আশ্রয়, শারীরিক সুখ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ! তমাল কি তা দিতে পারে ? ওর নিজেরই তো কোনো আশ্রয় নেই, উপার্জন নেই, জীবনের তিলমাত্র নিরাপত্তাও নেই ! ওকে কেমন করে ভালবাসা যায় ? মাঝিহীন নৌকায় চেপে কে চায় বর্ষার নদী পাড়ি দিতে ?

না, এখনও আমি জানি না, তমালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি !

কিন্তু ভালবাসা না হোক, তমালের সঙ্গে আমার একটা কিছু আছে। যদি কোনো সম্পর্কই না থাকবে তাহলে আজ আমি যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে এলাম কি করে। গাছের পাতা আপনি নড়ে না, জলে ঢেউ আপনি জাগে না, সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে ভয়ের কাঁটাগুলো আপনি সাহসের ফুল হয়ে ফোটে না। কোথাও না কোথাও যোগাযোগ তো একটা থাকেই !

না, আমার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই।

আমি খুবই সাধারণ, দরিদ্র ঘরের মেয়ে। ছোটবেলা থেকে অভাবে অনটনে মানুষ। সে অভাব যে কত তীব্র কত মর্মান্তিক বাবা তেমন জানতেন না, দাদাও না। জানতাম শুধু আমি আর আমার মা। মাস গেলে মাইনের টাকাটা বাবা মা'র হাতে তুলে দিতেন। তারপর থেকে মা আর আমার রকমারি পরিকল্পনা শুরু হ'ত। নানাদিক কাট ছাঁট করে, এটা রেখে, ওটা বাদ দিয়ে একমাসের বাজেট রচনা। দাদার প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ রাখা হ'ত বেশী। কেননা দাদাই আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের সুখ শান্তি, আমাদের জীবন-মরণ নিরাপত্তার গ্যারিন্টি। আমরা সবসময় সতর্ক থেকে, সন্তর্পণে দাদার প্রয়োজন মিটিয়ে যেতাম। অভাবের যে মোটাসোটা কালো বেড়ালটা সব সময় আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় তার নগ্ন কুৎসিৎ চেহারাটা কখনোই দাদাকে দেখতে দিতাম না।

অভাবের জন্যই স্কুল ছাড়ার পর আমার আর কলেজে পড়া হ'ল না। বাবা এখানে ওখানে বিয়ের সম্বন্ধ শুরু করলেন। কারো

পাত্রী পছন্দ হ'ল না, কারো সঙ্গে পণে বনল না, কেউ দাদার সঙ্গে বদল চাইল, আমরা রাজি হ'লাম না। আমার বয়স বাড়তে লাগল। বাবার মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ঘন হ'ল। মা মুখ কালো করে ঠাকুর-পুরুৎ-গণকের বাড়ী যাতায়াত শুরু করল।

আর এদিকে সমস্ত ব্যর্থতার জন্য নিজেকে দায়ী করে আমি আমার নিজের সংসারেই অপরাধী হয়ে থাকলাম। কুড়ি একুশ বছর মাত্র বয়সে, আমার মুখে যখন প্রথম যৌবনের লাবণ্য টলমল করার কথা, তখন এক গভীর গোপন লজ্জায় আমার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে থাকল ; মন আড়ষ্টতা পেল। আমি আগের মত হাসতে, কথা বলতে ভুলে গেলাম।

দাদা আমার অবস্থা বুঝল। একদিন বাবাকে বলল, 'ওর বিয়ে-টিয়ে এখন থাক বাবা। ও কলেজে পড়ুক।'

বাবা বললেন, 'খরচ কে দেবে ? তোমার অনার্সের টাল সামলাতেই আমি হিমসিম খাচ্ছি।'

দাদা বলল, ঠিক আছে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। আমার পুরনো বইগুলোও আছে।'

বাবা বললেন, 'তা দিতে পারলে দিক।'

দাদা বরাবরই ভাল ছাত্র। ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। দাদার পুরনো বইগুলো নিয়ে আমি শুরু করলাম। মাঝে মাঝে ও আমাকে ইংরেজি বাংলা দেখিয়ে দিল। আমি পরীক্ষা দিয়ে আই-এ পাশ করলাম। তারপর বদলি হয়ে বাবা এই শহরে এলেন। দাদা এম-এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল। আমার এক বছর নষ্ট হ'ল।

দেশের বাড়ী-ঘর বিক্রি-করে-আনা-টাকার হাজার দুই তখনো অবশিষ্ট ছিল। অভাবের সংসারে এ টাকাও খরচ হয়ে যায় ভয়ে বাবা আবার বিয়ের জন্য ছুটোছুটি শুরু করলেন। তাঁর মুখে বয়সের ভার ও দুশ্চিন্তার রেখা ঘনতর হ'ল। এই শহরে ভাল গণক-টনক আছে কিনা মা তার সন্ধান নিতে শুরু করল।

আমি লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হওয়ার পরিবর্তে মনে মনে এবার ক্ষুব্ধ হ'লাম। আমাদের অভাব ও দারিদ্র্য, আমাদের বিবাহ-ব্যবস্থা, আমাদের সমাজে প্রচলিত নানারকম সংস্কার ও ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে আমার মনে একধরণের অসহায় বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। আমি বাবাকে, নিজেকে, আমাদের সংসারটাকে এই দীনতা ও অপমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটা কিছু করতে চাইলাম।

একদিন দাদাকে বললাম, 'মেয়েদের কোনো ছোটখাটো কাজ নেই এ শহরে ?'

দাদা অবাক হয়ে বলল, 'কি কাজ ?'

'সে কি আমি জানি। তুই খুঁজে দেখ।'

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর মতলবটা কি খুলে বল দেখি ? তুই চাকরি করবি, আর আমি বুঝি সেই পয়সায় পড়ব ? তা হবে না নন্দি, বরং তুই এখানকার কলেজে ঢুকে পড়।'

'কলেজে ঢুকব ? খরচ কে দেবে ? সংসারের অবস্থা জানিস ?'

দাদা অল্পকাল চুপ করে থেকে বলল, 'আমি দেব তোর খরচ।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুই কোথায় পাবি ?'

দাদা বলল, 'কেন ? একটা টিউশনি করব। জানিস না, আমি বি-এ হনস্‌ ইন ইংলিশ ? চাকরির বাজারে না থাক, টিউশনির বাজারে আমার একটা ডিমাণ্ড আছে !'

আমি বললাম, 'না দাদা, তোর পড়ার ক্ষতি হবে।'

'না, এমন কি আর হবে।' বেশ ভেবে ভেবে দাদা বলল, 'তিনটেয় আমাদের ক্লাস শেষ হয়। পাঁচটা পর্যন্ত থাকব লাইব্রেরিতে। তারপর ধর সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা—'

আমি তবু আপত্তি করলাম। দাদা হেসে বলল, 'রোজ যেতে হয় না রে। সপ্তাহে তিন-চার দিন। দেখিস আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব।'

আমি রাজী হলাম। কিন্তু বাবা রাজী হতে চাইলেন না। খরচটা

দাদা দেবে শুনেও না। তাঁর একটা ভয় হ'ল, দাদার পড়ার ক্ষতি হবে। দুই নম্বর ভয় দাঁড়াল, আমি বি-এ পাশ করলে আমার জন্য এম-এ পাশ পাত্র দেখতে হবে। তাদের টাকার দাবিটা নিশ্চয়ই বহরে যথেষ্ট বড় হবে। দাদা অনেক করে বোঝাল। আমিও মাকে ধরে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত মা'র মধ্যস্থতায় আপোষ রফা হ'ল। ঠিক হ'ল, নতুন সেসন এলে আমি কলেজে ভর্তি হব।

এই সময়ই আমাদের বাড়ীতে তমাল এল একদিন।

বোধ করি সেই প্রথম আসা।

কি-একটা মিটিঙের কাজে এ পাড়ায় এসেছিল; দাদার সঙ্গে ঘরে এল। আমি চা দিতে এসে দেখলাম। খুবই সাধারণ চেহারা। দাদার মত রোগাটে ধরণের। একটু বেশী লম্বাই। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, রুক্ষ। গোলছাঁদের মুখটা রোদে-জলে ভিজে-পুড়ে তামাটে। চোখ দুটো যা একটু উজ্জ্বল। কাঁধে ঝোলানো একটা খয়েরি রঙের ব্যাগ। হাতে একরাশ কাগজপত্র। সব মিলিয়ে যেন ভদ্রগোছের একজন ফিরিঅলা!

আমার কোনো কৌতূহল হ'ল না। এমন অবিন্যস্ত আগোছালো চেহারায় আকর্ষণের কি-ই বা থাকতে পারে!

দাদা আলাপ করিয়েও দিল না। আমাদের মত গরীব কেরানির সংসারে ও-সব রেওয়াজ বিশেষ নেই। আমি চা নামিয়ে চলে এলাম।

তমাল চলে গেলে দাদাকে বললাম, 'কে রে লোকটা?'

দাদা বলল, 'আমার বন্ধু!'

আমি বললাম, 'সে কি! তোর আবার বন্ধু-বান্ধব হ'তে শুরু করল কবে থেকে? ও-সব বালাই তো তোর ছিল না!'

দাদা হেসে বলল, 'সেদিন ট্রেনে আলাপ হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে পড়ে।'

'এম-এ পড়ে? ওরে বাবা! দেখলে তো বোঝা যায় না। যেন শ্মশান থেকে উঠে এসেছে, এমন চেহারা।'

'তাহ'লে ও আমার শ্মশানবন্ধু। খুব সাংঘাতিক ছেলে। কমিউনিস্ট—'

'কি বললি? কমিউনিস্ট?'

'হ্যাঁ রে। পোস্টার লেখে, বক্তৃতা দেয়, ভোট করে। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটিতে দাঁড়িয়েছে—'

শুনে তখন আমার কৌতূহল হ'ল।

কমিউনিস্ট কাদের বলে, কমিউনিজম কি, সে-সব বলতে গেলে আমি তখন কিছুই জানি না। শুধু ভাসা ভাসা অস্পষ্ট একটা ধারণা—আমার আই. এ. কোর্সের ইতিহাস বই থেকে জন্মানো। আমি শুধু জানি, রাশিয়া বলে একটা দেশে কমিউনিস্টরা রাজাদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। চীনেও ওইরকম কি একটা হয়েছে। এখন ভিয়েৎনামে ওরা নাকি খুব লড়াই করছে।

আর জানি, এ-দেশেও কমিউনিস্টদের একটা দল আছে। ভোটের সময় তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ে, অন্যসময় ধান চাল কেরোসিনের দাম কমানোর জন্য যত নীচুতলার মানুষ জুটিয়ে স্ট্রাইক করে, মিছিল করে। স্কুলে পড়ার সময় আমি দু'তিনবার ধর্মঘট দেখেছি। বহরমপুরে থাকার সময় একটা বড় মিছিল দেখেছি।

এই সরকার ওদের সহ্য করতে পারে না। কলকাতায় ওদের মিছিল বেরুলেই পুলিশ ছুটে এসে লাঠি চালায়, কি যেন একটা গ্যাস ছোঁড়ে, তারপর গুলি চালায়। তখন ওরা রেগে গিয়ে চারদিকে ঢিল পাটকেল ছুঁড়তে থাকে, ট্রামে বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়, হরতাল ডাকে।

আমাদের রেডিও নেই। খবরের কাগজও আসে না। শুধু কলকাতায় বা অন্যকোথাও যখন খুব গোলমাল হয় তখন বাবা কখনো-সখনো কাগজ কিনে আনেন। আমি মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখি। বইয়ের মলাট দেবে বলে কাগজখানা দাদা যত্ন করে তুলে রাখে।

ওইসব কাগজে নানারকম ছবি বেরোয়। পুলিশের লাঠিচালানোর

ছবি, ট্রামবাস পোড়ার ছবি, গুলি খেয়ে পড়ে-থাকা কোনো পুরুষ বা মেয়ের ছবি।

কাগজের ওপর চোখ পড়লে মা বলে ওঠে, 'ইস্, গাড়ীটা কেমন জ্বলছে দেখ! একেবারে দাউ দাউ করে!'

বাবা বিড়ি ধরিয়ে বলেন, 'বেশ করছে জ্বলছে। দিক সব জ্বালিয়ে। কচুর গবরমেণ্ট! কোথায় জিনিসের দাম কমাবে, তা না, হনুমানের ল্যাজের আগুনের মত কেবল বেড়েই চলেছে।'

একটুপরে আর একটা ছবি দেখে মা বলে, 'আহা রে, দেখ, দুধের বাচ্চাটাকে কেমন গুলি করেছে।'

বাবা দেখেশুনে বলেন, 'দুধের বাচ্চা? কালকেউটের বাচ্চা সব! এই বয়সেই পেট্রল ঢেলে ট্রামবাস পোড়াতে শিখে গেছে। গুলি করবে না পুলিশ? ঠিকই করেছে!'

ওই ক'টা কাগজ দেখে বা বাবার কথা শুনে কোনো কিছু সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা হয় না। ওই কমিউনিস্টরা কি চায়, কেনই-বা এত ট্রামবাস পোড়ায়, লাঠি খায়, গুলি খায়, আমি তার কিছুই বুঝি না।

দাদার বন্ধুটির কথা ভেবে আমি তাই অবাক হই। দাদা কেন ওকে 'সাংঘাতিক' বলল ভাবতে থাকি। কি আছে ওর মধ্যে? কথাবার্তা শুনে বা চেহারা দেখে কই, সাংঘাতিক কিছু বলে তো মনে হ'ল না?

এরপর আরো দু'তিনদিন তমাল এল আমাদের বাড়ীতে। আমি খুব স্পষ্ট করে ওকে দেখলাম। কিন্তু কখনো কোনো কথা হ'ল না। দাদার সঙ্গে ওর কি কথাবার্তা হয়, কি বোঝায়, আমি আড়াল থেকে শোনার চেষ্টা করলাম।

তারপর বেশ কিছুদিন ও আর এল না। খুব সম্ভব দাদা বারণ করেছিল। কেন না তমালের আসা-যাওয়া নিয়ে বাবা একদিন রাগা-রাগি করেছিলেন। আমি শুনেছি। তমাল আমাদের সাংসারিক

নিরাপত্তা, বাবার চাকরি, দাদার ভবিষ্যৎ—সববিষয়েই নাকি বিপজ্জনক। বাবা খুব জোর দিয়ে এসব কথা বলেছিলেন। দাদা চুপ করে শুনছিল। আমার কেমন ভয় ভয় করছিল।

কিন্তু এর ফলে ওই নিষিদ্ধ মানুষটা সম্পর্কে আমার আগ্রহ যেন আরো বেড়ে গেল। আমি সারাদিন অনেকখানি সময় ধরে তমালের মুখটা ভাবতে চাইতাম। ওর কথাগুলো মনে করতাম। আমার বুকের ভেতরে কিরকম দুরুদুরু একটা কাঁপুনি উঠত। হাতের কাজ ভুলে আমি কখনো অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম।

খুব সম্ভব এটাই আমাদের স্বভাব। যেখানে নিষেধের বেড়া উদ্যত হয় সেখানে মন তাকে ভাঙতে চায়। বাচ্চা ছেলেদের যেমন, আচারের বোয়েমটা যতই গোপন জায়গায় লুকোতে থাকে, তাকে খোঁজার ও পাওয়ার জিদ ততই প্রবল হয়ে ওঠে। আর মেয়েদের কৌতূহল, কে না জানে, বরাবরই একটু বেশী!

অনেকদিন তমাল না আসায় একদিন আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর সেই শ্মশানবন্ধুটা কি করছে রে? দেখা হয় না?'

দাদা খুব বিরক্ত হয়ে তাকাল আমার দিকে, 'কেন? তোর কি দরকার?'

বললাম, 'এমনি—'

'এমনি?' দাদা রাগ রাগ গলায় বলল, 'না-কি খবর নিচ্ছিস, আমি এখনো ওর সঙ্গে মিশি কি না! বাবার হয়ে স্পাইং করছিস?'

দাদার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হ'ল না। কিন্তু বেশ বুঝলাম, দাদা এখনো তমালের সঙ্গে মেশে। নাহ'লে এমন করে ও রেগে উঠত না।

এর মধ্যে দাদার টেবিলে একদিন তমালের নাম স্বাক্ষরিত দুটো বই দেখলাম। 'মার্কসবাদের গোড়ার কথা', আর 'কমিউনিজম কাহাকে বলে?' দাদাকে কিছু না বলে বইদুটো আমি পড়তে শুরু করলাম।

সামান্য বুঝলাম, অনেককিছুই আ-বোঝা থাকল। তাতে আমার আরো জিদ চেপে গেল। আমি আবার পড়লাম। আবার।

আমার স্বভাবটা কোনো কোনো ব্যাপারে ওইরকমই জেদি। রান্না করার সময় মাঝে মাঝে একএকটা ডাল কিছুতেই সেদ্ধ হয় না। ফুটছে তো ফুটছেই। আমার রাগ ধরে যায়। হাতার পিঠ দিয়ে ঠেসে ঠেসে ডালগুলো গালিয়ে দিই। তাতেও না হ'লে পাটায় ফেলে পিষে দিই। যেন রাগ করেই একটা দানাও আস্ত থাকতে দিই না।

বারবার পড়ে কিছু বুঝলাম। দাদা আবার কবে বই আনবে সেই আশায় থাকলাম। কিন্তু দাদা এরপর থেকে ইংরেজি বই আনতে লাগল। মাথামুণ্ডু একবর্ণও বুঝলাম না। শুধু অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে মাঝেমধ্যে সেগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে দাদার জ্বর হ'ল।

সুকুমার যাচ্ছিল ওষুধ আনতে—ডাক্তারবাবুকে নিয়ে তমাল এসে হাজির হ'ল। অনেকদিন পরে আমাদের বাড়ীতে আবার ওই নিষিদ্ধ মানুষটাকে দেখে বাবার কথা ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হ'ল। কিন্তু আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অনুভূতি প্রখর ও সজাগ হয়ে উঠল। প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে গোপন মৃদু একটা শিহরণ আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম।

অবিশ্রান্ত বকতে বকতে অদ্ভুতধরণের মানুষ সদাশিবডাক্তার রোগী-দেখা সেরে চলে গেলেন। আমি তমালের জন্য চা নিয়ে আসতে এই প্রথম দাদা আলাপ করিয়ে দিল, 'আমার বোন।'

তমাল সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল, 'জানি। পড়াশুনা করেন না আপনি?'

আমি কিছু বলার আগে দাদাই বলল, 'ভাবছি, নতুন সেসনে কলেজে ভর্তি করে দেব।'

'ভাল। আর মাস খানেকের মধ্যেই তো সেসন শুরু হবে।'

চোখ নামিয়ে নিয়ে তমাল আবার ডাক্তারবাবুর কথা বলতে শুরু করল।

আমি নিঃশব্দে ফিরে এলাম। তমালের সেই স্বচ্ছ উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার বুকের গভীরে যেন মোমবাতির স্নিগ্ধ শিখার মত স্থির নিষ্কম্প হয়ে জ্বলতে লাগল।

নৈহাটী থেকে ফিরে এসে বাবা সেদিন খুব একটা বকাবকি করলেন না। বরং 'কমিউনিস্ট ছোঁড়াগুলো লোকের উপকার করে বেড়ায়' বলে তমালদের যেন একটু প্রশংসাই করলেন। কিন্তু আবার দু'দিন যেতে না যেতে কি হ'ল বাবা খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার চাকরিটা আর থাকল না, খোকার মা!'

মা ভয় পেয়ে বলল, 'কেন? কি হয়েছে গো?'

বাবা বললেন, 'হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! তোমার ওই সুপুত্তুর, লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে আজকাল কমিউনিস্টদের মিটিং শুনে বেড়াচ্ছে! গৌর চাটুজ্যে নিজের চোখে দেখেছে—'

মা বলল, 'কাদের মিটিং বললে?'

বাবা বললেন, 'কেন শুনতে পাওনি? ওই তমালদের—'

মা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তমাল তো বেশ ভাল ছেলে! সেদিন খোকার জ্বর শুনে ডাক্তার নিয়ে ছুটে এল!'

বাবা আরো রেগে উঠলেন, 'ওসব ভড়ং! তুমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, কি বুঝবে? ওরা অমনি ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।'

মা বলল, 'বেশ তো, খোকা বড় হয়েছে। তুমি ওকে বুঝিয়ে বল।'

'বোঝানোর কিছু নেই! সাফ কথা বলে দিচ্ছি, আর যেন না মেশে ওদের সঙ্গে।'

তারপর প্রসঙ্গ পালটে বাড়ীঅলাকে নিয়ে পড়লেন, 'শালা গৌর চাটুজ্যেটাও হয়েছে তেমনি। কার ছেলে মিটিঙে যাচ্ছে, কার মেয়ে সিনেমায় যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ানো স্বভাব। কেন বাপু, তোর তাতে কি? তোর বউ যে চেয়ারম্যান অধর হালদারের ঘরে—'

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। অপ্রস্তুত মুখে গামছাখানা টেনে নিয়ে কলতলার দিকে চলে গেলেন।

সেই নিষিদ্ধ মানুষটা আর কখনো আমাদের বাড়ীতে আসবে না ভেবে গভীর বিষণ্ণতায় মনটা ডুবে গেল। ও এত সাংঘাতিক, এত ভয়ানক কি করে হ'ল—আমি আবার ভাবতে চাইলাম।

সেসন শুরু হ'তে আমি কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। নতুন ডিগ্রি-কোর্স চালু হয়েছে তখন। পুরনোটাও আছে। আমি ওল্ড-কোর্সের থার্ড ইয়ারে ভর্তি হ'লাম।

স্কুলের কথা ছেড়ে দিলে জীবনে এই প্রথম আমার বাইরে আসা।

তিনচারদিন ক্লাস করেই মনে হ'ল যেন বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমার চারদিকে প্রসারিত সুন্দর স্বচ্ছ জীবন, গ্লানিমুক্ত, অপমানমুক্ত! খাঁচা-ছাড়া পাখির মত বিশাল কলেজের এখানে ওখানে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বাগান দেখলাম, খেলার মাঠ দেখলাম, সুন্দর সিঁড়িবাঁধানো পুকুর দেখলাম। দোতলায় লাইব্রেরিরুমে গিয়ে আলমারিতে ঠাসাঠাসি বই দেখে অবাক হ'লাম। মস্তবড় কমনরুমে নানারকম খেলার সরঞ্জাম দেখে খুশি হয়ে উঠলাম। ক'দিন না যেতেই ধারণা হ'ল মনের দিক থেকে আমি হঠাৎ বুঝি অনেক বড় হয়ে গেছি!

আমাদের কমনরুমে তিনচারটে খবরের কাগজ আসত। মন দিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করলাম। বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কোনোকিছু লেখা থাকলে আমি খুঁটিয়ে পড়তাম।

কিন্তু তাতে কিছু জানা হ'ত না। উল্টে মন খারাপ হয়ে যেত। আমি দেখতাম, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কাগজগুলো নানারকম বিরুদ্ধ কথা ছাপাচ্ছে। এমন সব খবর, যাতে করে ওদের সম্পর্কে কারো ভালো ধারণা হওয়ার কথা নয়। বাবার মত এই কাগজগুলোও যেন দলবেঁধে বলতে চাইছে, ওরা বিপজ্জনক, ওরা ভয়ানক, ওরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। কেন জানি না পড়তে পড়তে একসময় আমার রাগ হয়ে যেত। কাগজগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম। তমালের ক্লান্ত-শীর্ণ মুখটা এইসময় আমার মনে পড়ত।

একদিন পায়ে পায়ে লাইব্রেরিতে উঠে গেলাম। যে-সব আলমারিতে বাংলা বই সাজানো আছে সেগুলো মনোযোগে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে লাইব্রেরিয়ান নীলকণ্ঠবাবু হেঁকে বললেন, 'এই, তুমি কি বই খুঁজছ?'

আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'এদিকে এসো—'

কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন, 'নতুন ভর্তি হয়েছ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কার্ড করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি বই নেবে?'

আমি কোনোকিছু না ভেবে বলে ফেললাম, 'কমিউনিস্টদের উপর কোনো বাংলা বই—'

'কমিউনিস্ট!'

যেন সাপের ল্যাজে পা দিলেন নীলকণ্ঠ! আঁতকে উঠে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন। তারপরই অবিরাম প্রশ্ন—নাম কি, বাবার নাম কি, বাবার পেশা কি, আগে কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আছি, কয় ভাইবোন, দাদার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো যোগ আছে কিনা, হঠাৎ কেন ও বই আমি খুঁজছি—

জেরার চোটে ঘেমে উঠলাম। আমার বুক শুকিয়ে দম আটকে এল। শেষে নীলকণ্ঠবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'ওসব আজেবাজে বই কেন খুঁজছ? ও-সব পড়তে হবে না! গান্ধী পড়, অরবিন্দ পড়, রামকৃষ্ণ পড়! ওই দেখ, ওই জানলার কাছে আলমারিতে—'

ছাড়া পেয়ে আমি একরকম দৌড়ে বাইরের বারান্দায় চলে এলাম। এতক্ষণে আমার মনে হল, নীলকণ্ঠবাবুকে ওইসব বইয়ের কথা বলা উচিত হয়নি। তমালেরা সত্যি সত্যি যদি বিপজ্জনক হয়ে থাকে তাহ'লে ওদের বিষয়ে যার-তার কাছে কিছু বলাটাও নিশ্চয়ই

বিপজ্জনক। আমি খুব বোকামি করলাম। এতে বাবার বা দাদার কিছু ক্ষতি হতে পারে। কেন যে বলতে গেলাম!'

সিঁড়ির কাছে চলে এসেছি এমন সময় কে আবার ডাকল, 'শোন!'

তাকিয়ে দেখি সায়েন্সের সেই প্রফেসারটি। এই ক'দিনে আমি মোটামুটি অনেককে চিনেছি। এঁকেও চিনতে পারলাম। তমালদের মতই বয়স হবে। প্যাণ্টসার্ট পরা, চোখে চশমা। এতক্ষণ লাইব্রেরিতে কাউন্টারের ওপাশে বসে কি-একটা মোটা-বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। বইটা হাতে নিয়েই উঠে এসেছেন। ওঁর নাম মোহিত দত্ত। সবাই সংক্ষেপে বলে এম-ডি।

ওঁর ডাকে আমি আবার ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

এম-ডি আরো কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'ইউ আর এ ফুল! একটুও বুদ্ধি নেই তোমার!'

আমি খুব আহতভঙ্গিতে এই তরুণ অধ্যাপকটির দিকে তাকালাম।

উনি এবার হেসে ফেললেন। একইরকম চাপাগলায় বললেন, 'কলেজ-লাইব্রেরিতে এসে ওসব বই কি চাইতে আছে? আর কখনো চাইবে না। তোমাকে নিয়ে তাহ'লে অনেক ঝামেলা হবে।'

'কি ঝামেলা হবে?'

'নানারকম। এই ধর, পার্সেন্টিজ শর্ট করিয়ে দেওয়া, টেস্টে আটকে দেওয়া....এইসব আর কি! ঠিক আছে, এখন যাও! পরে কথা হবে।'

সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনে যেন চকিত হয়ে উঠলেন এম-ডি। আর কিছু না বলে দ্রুত নীচে নেমে গেলেন।

ভয়ে ভাবনায় বিমর্ষ হয়ে আমিও নামতে লাগলাম। কলেজে ঢুকে এই ক'দিনে আমি যে প্রশস্ত বিপুল মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিলাম—হঠাৎ যেন তার উপর একখণ্ড বড় পাথর গড়িয়ে পড়ল। সমস্ত মন অজানা একটা আশঙ্কায় ভরে উঠল।

একদিন কলেজে যাওয়ার পথে তমালকে দেখলাম।

আমাদের বাসা থেকে কলেজটা অনেক দূরে। সুভাষকলোনীর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই কলোনীটা পূর্ববঙ্গের মানুষেরা করেছে। একতলা ছোট ছোট বাড়ী। কোনোটার টিনের বেড়া, টালির ছাদ। কোনোটার পাকা দেয়ালের ওপর টিন নামানো, কোনোটার ভিৎ পর্যন্ত পাকা, বাকি অংশে বাঁশের বেড়া, টিনের ছাউনি। বাড়ীর সামনে-পেছনে কলা-সুপুরি-নারকেল গাছ। টিনের বা টালির ছাদে লতানো লাউ কুমড়া। বাড়ীগুলোর দিকে তাকালে খুব অস্পষ্টভাবে দেশের বাড়ীর কথা আমার মনে পড়ে যায়। কুয়োতলার পাশে বড় বড় মান-কচুর পাতা, তার গা ছুঁয়ে একটা করমচার গাছ, তার পাশে জামরুল গাছ। দিনরাত সেই গাছটায় উঠে দাদা জামরুল খুঁজে বেড়াত, আমি নীচে আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমার বুড়ীঠাকুমা উঠোনের রোদে বসে তেঁতুলের বিচি ছাড়াতে ছাড়াতে চিৎকার করত, 'এই মুখপুড়া নাইম্যা আয়, নাইম্যা আয়! পইড়্যানি ঠ্যাঙ্‌ ভাঙ্গে! অ খুকার মা—'

সুভাষকলোনীর মাঝামাঝি-জায়গায় একটা স্কুল আছে। কলোনীর মানুষেরাই করেছে। ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। হরিপদবাবু স্কুলের প্রেসিডেন্ট, তমাল নাকি সম্পাদক। দাদার মুখে শুনেছিলাম।

স্কুলটাকে এখন ক্লাস টেন পর্যন্ত তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

একদিন দেখলাম, পুরনো টিনের চালার পাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে নতুন স্কুলঘরের ভিৎ কাটা হচ্ছে। একপাশে মাঝারি গড়নের টাকমাথা হরিপদবাবু, অন্যপাশে ছিপছিপে লম্বা তমাল, দু'জনে দাঁড়িয়ে কাজের তদারকি করছে। ওপাশে স্কুল চলছে। ছেলেমেয়েরা দৌড়ঝাঁপ করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে তমাল সামান্য হাসল। নিতান্তই সৌজন্যের হাসি। এর উত্তর কিভাবে দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে আমি রাস্তাটুকু পার হয়ে গেলাম।

স্কুলবাড়ীর ভিৎটা না-ওঠা পর্যন্ত তমালকে আমি আরো ক'দিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। একদিন দেখলাম, ও নিজের হাতে ইঁট এগিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিন মনে হ'ল, মিস্ত্রির সঙ্গে লোহা ধরে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে বাঁকা করছে। আরেকদিন, মস্তএক জলের টিন ধরে কিসে যেন জল ঢালছে। কাঠফাটা রোদে তমালের এই কাজগুলি আমার খুব ভাল লাগল। মনে হ'ল, ও খুব কর্মিষ্ঠ, খুব পরিশ্রমী। অনেকটা আমার বাবার মত। এই বুড়োবয়সেও বাবা হাটবাজার করছেন, সারা শহর খুঁজে কেরোসিন আনছেন, কয়লা আনছেন, তিন-মাইল দূরের কোন্ গ্রামে চালের দর মণপ্রতি আটআনা কি একটাকা কম, খোঁজ রেখে, থলেয় ভরে পাঁচ-সাতসের বয়ে আনছেন।

আর দাদা যেন তার উল্টো। একগ্লাস জল গড়িয়ে খেতেও আপত্তি। আসলে ছোটবেলা থেকেই ও ভীষণ আদুরে। আমি আর মা তোয়াজ দিয়ে দিয়ে আরো অকর্মণ্য করেছি। দাদাও যেন বুঝে গেছে, দিন-রাত বইপড়া ছাড়া বিশ্বসংসারে ওর আর কিছু করার নেই। ও যা কিছু করবে পাশ করে চাকরি নেবার পর। দাদার সঙ্গে তমালের একটুও মিল নেই কিন্তু বাবার সঙ্গে ওর যেন কোথায় একটা মিল আছে। কলেজে ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে আমি এই মিল-অমিল নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

একদিন সামান্য ক'টা কথা হ'ল তমালের সঙ্গে।

আমরা সেদিন মুখোমুখি পড়েছিলাম। তমাল সাইকেল চালিয়ে আসছিল। আমাকে দেখে নেমে পড়ল। সেই উজ্জ্বল চোখ, যাতে মনে হয় একটা নিষ্ঠুর কৌতুক সবসময় খেলা করছে, আমার মুখে স্থাপন করে বলল, 'কলেজে আপনার হাফ্-ফ্রি-শিপ্টাও হ'ল না তাহলে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি কি করে জানলেন?'

তমাল বলল, 'শিখার কাছে শুনলাম। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। কমনরুমে অল্পস্বল্প আলাপ হয়েছে। তাছাড়া শিখার কথা আমি আগেও শুনেছিলাম। ও একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে রাস্তায় পড়ে জখম হয়েছিল। ওকে দেখতে এসেই ডাক্তার-বাবু আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। শিখা তমালদের দলের মেয়ে। এইকারণে ওর সম্পর্কে একটু কৌতূহলও জেগেছিল। একদিন কমনরুমে ওকে দেখলাম। একটু ডাঁটালো চেহারা, গভীর শ্যামল রঙ, মাথায় একরাশ অবাধ্য চুল কোনোরকমে গুছিয়ে বেণীবাঁধা। থার্ড ইয়ার সায়েন্সে পড়ে। আমার সঙ্গে দু'একটা কথা হ'ল। কিন্তু তমালদের বিষয়ে আমি একটা কথাও বললাম না। সেদিন লাইব্রেরি থেকে ফেরার পর মুখে তালা দিয়েছিলাম।

আমি একসময় মুখ তুলে বললাম, 'আমার হাফ্-ফ্রি কেন হ'ল না?'

তমাল যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে বলল, 'আপনার প্রয়োজনটা যে খুব বেশী! এই দেশের ওই নিয়ম। যাদের দরকার তাদের কিছু হয় না। যাদের দরকার নেই, তারাই সব পায়।'

তারপর একটু হেসে সেই নিষ্ঠুর কৌতুকটাকে কটাচোখের মণিতে আরো তীব্র করে তমাল বলল, 'আপনার হ'ল না, কিন্তু চেয়ারম্যান অধর হালদারের মেয়ে কমলার বরাবরই ফুল-ফ্রি! ও বোধহয় গাড়ীতে যাতায়াত করে বলেই—'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ভেবেছিলাম রেজাল্ট তেমন ভাল নয় বলে আমার কিছু হ'ল না। কিন্তু কমলাদির কেন ফুল-ফ্রি হবে? ওকে আমি চিনি। হাতকাটা ব্লাউজের উপর দামী দামী শাড়ী জড়িয়ে কলেজে আসে। গলায় মোটা সোনার চেন চকচক করে। কারণে অকারণে হাতের ঘড়িতে সময় দেখে। ও তো শুনেছি কম্পারমেণ্টালে আই-এ পাশ করেছে!

তাহ'লে? এ কেমন নিয়ম!

তমালের কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে কলেজে গেলাম। একবার মনে হ'ল, সেদিন লাইব্রেরিতে কমিউনিজমের উপর বই চেয়েই আমি বিপদ করিনি তো? মোহিতবাবু তো বললেন, এ নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। পার্সেন্টিজ শর্ট করিয়ে দিতে পারে, টেস্টে আটকে দিতে পারে। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আমার হাফ্-ফ্রি-শিপের দরখাস্তটা বাতিল হয়ে গেল না তো?........কিন্তু মোহিতবাবু গায়ে পড়ে কেন উপদেশ দিতে এলেন? ওর কি স্বার্থ? উনি কি তমালদের লোক? আর ঢ্যাঙা ট্যারা-চোখ ওই নীলকণ্ঠবাবুটা? ও কি মণিশঙ্করের লোক? গৌর চাটুজ্যে বা বাবার অফিসের ওই বড়বাবুর মত? এই শহরে মণিশঙ্করেরা কত লোক ছড়িয়ে রেখেছে? কেন রেখেছে? কি আশ্চর্য সব ব্যবস্থা!

একদিন সকালে কলকাতা যাওয়ার আগে দাদা আমাকে ডেকে খুব নীচু গলায় বলল, 'নন্দি, তোর কাছে দুটো টাকা হবে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি করবি?'

দাদা বলল, 'থাকলে দে। ক'দিন পরে টিউশনির টাকা পাব। তখন দিয়ে দেব!'

'কি করবি বললি না?'

'কাউকে বলিস না, ওই তমাল চেয়েছে—'

সেই বিপজ্জনক নিষিদ্ধ মানুষটার নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুকেন্দ্র সজাগ হয়ে উঠল। আমি সোজাসুজি দাদার মুখের দিকে তাকালাম, 'কেন রে?'

'ওই যে সুভাষকলোনীর স্কুলটা বাড়ানো হচ্ছে—তার চাঁদা!' যেন অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে দিতে হচ্ছে এমন মুখের ভাব করল দাদা। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ওকে চাঁদা দিবি কি দাদা? ও যে একটা কমিউনিস্ট! বাবা যে তোকে বারণ করেছেন ওর সঙ্গে মিশতে?'

দাদা বিরক্ত হয়ে মাথা ঝেঁকে বলে উঠল, 'করুন গে। আমি ওসব

কমিউনিস্ট-টমিউনিস্ট বুঝি না! তমাল খুব ভাল ছেলে—আমার বন্ধু! টাকা থাকলে দে, না থাকলে বল চলে যাই।'

দাদার রাগ দেখে হাসি পেল। যেন একটু সাহসও পেলাম। সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তমালের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আমি ভয়ে ভয়ে আছি। সেই ভয়টা কাটল। বুঝলাম, দাদার সঙ্গে তমালের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তমালকে দাদা ভালবাসে।

বাবা তাহ'লে মিথ্যেই ওকে বিপজ্জনক বলেন! ও যদি সত্যি বিপজ্জনক হবে তাহ'লে দাদা কেন ওর সঙ্গে মিশবে, ওকে ভালবাসবে! রাত জেগে ওর দেওয়া বই পড়বে কিংবা স্কুলফাণ্ডে চাঁদা দেবে! দাদার পড়াশুনা তো কম নয়, ও তো অনেক পড়েছে, অনেক জেনেছে। জেনেবুঝে ও কি ঘরে কোনো বিপদ ডেকে আনতে পারে? আসলে বাবা খুব ভীতু মানুষ। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কেউ হয়ত ভুল বুঝিয়ে ভয় খাইয়ে দিয়েছে তাঁকে। সেই ভয় থেকে তিনি ওসব বলে যাচ্ছেন। একদিন দাদা তাঁর ভয় ভেঙে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তাও হ'ল। দাদাই কিছু ভুল করছে না তো? ও তো চিরকাল বইমুখে কাটাল। জীবনের সংসারের কতটুকু বোঝে? কতটুকু মানুষ চেনে? তমালের সঙ্গে মেলামেশার জন্য বাবার চাকরিটা যদি সত্যি সত্যি চলে যায়, আমরা তাহ'লে কোথায় যাব? কি খাব? আমাদের কোথাও যে একছটাক জমিও নেই।

কিন্তু তমাল কি কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে?

ওরা কি কারো চাকরির পক্ষে, সংসারের পক্ষে, জীবনের পক্ষে সত্যিই ক্ষতিকর?

তাহ'লে দাদার সামান্য জ্বর শুনে তমাল কেন ডাক্তার নিয়ে ছুটে আসবে? আমার হাফ্-ফ্রি হয়নি শুনে কেন দুঃখ করবে? ওর ভাই অশোক কেন আমাদের কনসেসন নিয়ে কলেজে আন্দোলন করছে? কেন কমলাদির নামে পোস্টার দিয়েছে?

আসলে ওরা বড়লোকদের শত্রু। ওই মণিশঙ্কর, গৌর চাটুজ্যে,

অথর হালদারদের শত্রু। ওরা তাই কমিউনিস্টদের দেখতে পারে না। ডাঙার বাঘ, জলের কুমীর মনে করে। একদিন এই বাড়ীতে বসে তমাল তো দাদাকে বলেছিল, বড়লোকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে! তাছাড়া দাদার টেবিল থেকে সেদিন ওই যে বাংলা বইদুটো পড়লাম, তাতেও তো এই কথাই লেখা আছে। কমিউনিস্টরা ধনীদের উচ্ছেদ চায়, শোষণ দূর করতে চায়, কৃষকরাজ শ্রমিকরাজ কায়েম করতে চায়। সে রাজত্ব রাশিয়ায় হয়েছে, চীনে হয়েছে।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ তো কমিউনিস্ট ছিলেন না, তবু তিনি রাশিয়া ঘুরে এসে বলেছেন, সোনার দেশ। তাহ'লে? বাবা কেন তমালের নাম শুনে রেগে ওঠেন? বাড়ীতে আসতে নিষেধ করেন? দাদাকে মিশতে বারণ করেন? তমাল আমাদের কি ক্ষতি করবে? আমরা তো বড়লোক নই!

বাবা বলেন, 'ওরা কংগ্রেসের শত্রু। এখন কংগ্রেসের রাজত্ব। কমিউনিস্টদের ওরা পছন্দ করে না।'

সেদিন তমালও বলল, 'এই দেশে ওই নিয়ম! এখানে বড়লোকেরা সব পায়। গরীবেরা না খেয়ে থাকে।'

তাহ'লে কংগ্রেসের রাজত্ব কি বড়লোকদের রাজত্ব?

কিন্তু আমরাই তো ভোট দিয়ে ওদের ক্ষমতায় পাঠাই। আমরা, দেশের যত গরীবেরা। তাহ'লে? গরীবের ভোটে বড়লোক কি করে ক্ষমতায় আসে? গরীবরা কেন শাসনক্ষমতায় যায় না?

ভাবতে ভাবতে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে উঠল। আমি যেন ধাঁধায় পড়ে গেলাম। কিন্তু কাকে কি জিজ্ঞেস করি! কলেজে মুখ খোলার উপায় নেই—নীলকণ্ঠরা ওৎ পেতে বসে আছে। রাস্তায় তমালের সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই—গৌর চাটুজ্যেরা রিকশা নিয়ে ঘুরছে। বাড়ীতে বাবা তমালের নাম শুনলেই রেগে ওঠেন। অথচ ধাঁধার উত্তর না পেলে মনটা শান্ত হয় কি করে!

একদিন বাজার থেকে ফিরে বাবা বললেন, 'শুনছ, সরষের তেলের দাম আরো আটআনা বাড়ল। আর মুশুরির ডালও চারআনা।'

মা'র মুখ কালো হয়ে গেল, 'কেন, বাড়ল কেন? গতমাসেই তো একবার বেড়েছে?'

আমি বাজার তুলতে তুলতে বললাম, 'রোজ রোজ জিনিসের দাম বাড়ে কেন, বাবা?'

গেঞ্জি খুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাবা বললেন, 'বাড়বে না! যত চোর-জোচ্চুরের রাজত্ব!'

বাবার মুখ থেকে বহুবার শোনা ওই কথাকে আজ বিনা-জেরায় ছেড়ে দিলাম না, বললাম, 'চোর-জোচ্চুরের রাজত্ব বলছ কেন, বাবা? রাজত্ব তো কংগ্রেসের।'

বাবা বললেন, 'ওই হ'ল! একই কথা!'

'কিন্তু আমরা যে ওদের ভোট দিই?'

'দিতে হয় দিই। ভোটের সঙ্গে দামের কি সম্পর্ক?'

'বা রে, আমরা কি তাহ'লে জেনে বুঝে চোর-জোচ্চুরদের ভোট দিই?'

একটু থমকে অবাক হয়ে বাবা আমার মুখ দেখলেন। তারপর বেশ ভেবে ভেবে বললেন, 'না, সবাই কি আর চোর! কিছু ভাল লোকও আছে। আসলে ওই ব্যবসাদারগুলোকে শায়েস্তা করা দরকার।'

মা রান্নাঘর থেকে বলল, 'কে শায়েস্তা করবে? সরষের মধ্যেই তো ভূত!'

আমি বললাম, 'তাহলে তো কমিউনিস্টরা ঠিকই বলে, বাবা! এ হ'ল বড়লোকের রাজত্ব, এখানে গরীবের কোন স্বার্থ নেই!'

বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে রূঢ় ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকলেন, 'এ সব কথা কে শেখাল তোকে?'

বললাম, 'কলেজে পোস্টার পড়েছে। আমি দেখেছি।'

'কিসের পোস্টার?'

'আমাদের ইউনিয়ন-ইলেকশনের।'

'পড়ুক। ওসব তোর দেখার দরকার নেই।'

তারপর একটু থেমে বাটি থেকে আঙুলের ডগায় তেল নিয়ে কানের ফুটোয় ঘষতে ঘষতে বললেন, 'ওরে, যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ। আমরা যে গরীব, চিরকাল সেই গরীব—'

কলেজ-সংসদ-নির্বাচনে আমার রাজনীতির হাতেখড়ি হ'ল। অবশ্য একে যদি হাতেখড়ি বলা যায়। একদিন কমনরুমে কমলাদি কাছে ডেকে খুব মাতব্বরি ঢঙে বলল, 'তুমি দেখছি খুব স্মার্ট-মেয়ে, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াও!'

আমি কমলাদির শরীর থেকে চাঁপাফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বোধ হয় সেন্টের গন্ধ। অভ্যাস না থাকায় আমার গা গুলিয়ে উঠছিল। আমি একটু সরে বসে বললাম, 'হ্যাঁ কমলাদি, এই কলেজটা আমার খুব ভাল লাগছে। ঘুরে ঘুরে তাই সব দেখি।'

'এর আগে কোন্ কলেজে পড়তে?'

'কোথাও না। এই প্রথম ঢুকলাম।'

'ও, তাই!'

কমলাদি পাশের মেয়েটির দিকে তাকাল। চোখে চোখে কি যেন কথা হ'ল। তারপর বলল, 'আমরা তোমাকে থার্ড-ইয়ারে মেয়েদের গ্রুপে ক্যাণ্ডিডেট্ করতে চাই।'

'কিসের ক্যাণ্ডিডেট্?'

'ও, তুমি তো আবার এসব কিছু বোঝ না। নীলু ওকে বুঝিয়ে দে।'

নীলু অর্থাৎ নীলিমা নির্বাচনী ব্যাপারটা আমাকে সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করল। কমলাদি বলল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। এই কলেজ-ইউনিয়ন জন্ম থেকেই আমাদের দখলে। তোমার এ্যাগেন্স্টে ওরা ক্যাণ্ডিডেট্ই খুঁজে পাবে না!'

'কারা?'

'ওই অশোকের পার্টি! কমিউনিস্টদের দালাল সব—'

আমি চমকে কমলাদির মুখ দেখলাম। ওর মোটা খসখসে গলায় 'দালাল' শব্দটা অদ্ভুত শোনাল। তারপর কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গ উঠতে তমালের কথা মনে পড়ল। স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই শুষ্ক দীর্ঘ রৌদ্রতাপদগ্ধ মানুষটা! কথা বলার সময় যার উজ্জ্বল চোখে তীব্র কৌতুক মোমবাতির শিখার মত ঝকমক করে। যে আমার দাদার নিষিদ্ধ বন্ধু। যার চোখে চোখ রাখলে ভয়ে ভাবনায় আমার বুকের ভেতরটা শির শির করে ওঠে!

সেই ফ্রি-শিপের ব্যাপারটা নিয়ে কমলাদির উপর একটু বিতৃষ্ণা তো ছিলই—ও তমালদের সহ্য করতে পারে না দেখে সেটা আরো বাড়ল। আমি যেন বুঝতে পেরে গেলাম, ওই কমলাদি বা নীলিমা—ওরাও মণিশঙ্করেরই লোক!

বললাম, 'না, কমলাদি, ওসব ঝামেলায় আমি নেই। বাবা রাগ করবেন।'

অবহেলায় ঠোঁট বেঁকিয়ে কমলাদি বলে উঠল, 'কে তোমার বাবা?' কি করেন? ঠিক আছে, আমি আমার বাবাকে দিয়ে অফিসে একটা ফোন করিয়ে দেব।'

আমি তবু বললাম, 'না, কমলাদি, আমার ওসব ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগে না? আচ্ছা, সে আমরা বুঝব!'

একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে ছেড়ে ওরা অন্য মেয়েকে নিয়ে পড়ল। আমি ভিতরে ভিতরে একটা অসহায় রাগে জ্বলতে লাগলাম। আমার উপর এমন অশোভন এমন অশালীন জোর-জুলুম মা-বাবাও কখনো করেন না!

কমলারা সরে যাওয়ার পর সেইদিনই শিখা এল আমার কাছে। হলুদের ছোপধরা হাতে ছুরি কাঁচি চালিয়ে ও ব্যাঙ পায়রা গিনিপিগ কাটে। কোমরে সাদা কাপড় জড়িয়ে আগুন জ্বেলে কাঁচের যন্ত্রপাতি নিয়ে 'প্র্যাকটিক্যাল' করে। ওকে দেখলেই আমার কেমন অবাক

লাগে। তাছাড়া ও তমালদের দলের মেয়ে! তমালও একদিন বলছিল ওর কথা। ওর সঙ্গে তমালের কি সম্পর্ক?

শিখা প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ওই ধুমসিগুলো কি বলছিল? নিশ্চয়ই ভোটের কথা?'

আমি হেসে ফেললাম, 'হ্যাঁ।'

'আপনি কি বললেন?'

'কি বলব?'

'ঠিক আছে, আজ ফেরার পথে আমাদের বাড়ী যাবেন একবার?'

'কেন?'

'এখানে বলা যাবে না। আসুন না? তমালদারা থাকবে। তমালদার সঙ্গে আপনার দাদার তো খুব ভাব!'

'কে বলল?'

শিখা একটু চাপা হাসল, 'আমরা জানি।'

আমার আবার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সবাই মিলে আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে কেন। কি আছে আমার মধ্যে। আমি তো খুব সাধারণ কেরানি ঘরের মেয়ে। এসব ভোট-ফোটের মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ফেলা কেন। আমি এসবের কি বুঝি?

কিন্তু কলেজ ছুটির পর শিখাদের বাড়ীতে আমি গেলাম। কেন গেলাম খুব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। কিছু ভেবে অথবা কিছুই না ভেবে, নিতান্ত অনিচ্ছায় অথচ ক্ষীণ একটা ইচ্ছার সুতো ধরে, অনেকখানি মোহগ্রস্তের মত শিখাদের বাড়ীতে পৌঁছলাম। তমালকে অনেকদিন দেখিনি, আজ সে ও-বাড়ীতে উপস্থিত থাকবে—শুধু এই কথাটা আমার মনে ছিল।

সুভাষকলোনীর শেষপ্রান্তে রেললাইনের ধারে শিখাদের বাড়ী। ছুটো মাত্র ঘর। ইঁটের দেয়ালের উপর টিনের চালা। পরিচ্ছন্ন তকতকে উঠোন। চারপাশে রকমারি গাছপালা। দেশভাগের পর

এই জমিটুকু নিয়ে বাড়ী করেছে। এখন বাবা বেঁচে নেই। দুই দাদার বড়জন দুর্গাপুরে কাজ করে, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ওখানেই থাকে। মেজদা কাজ করে স্টেট্-ট্রান্সপোর্টে—সে এখান থেকে যাতায়াত করে। তাছাড়া বাড়ীতে আছে মা, এক বিধবা পিসী।

বাইরের ঘর বাদ দিয়ে শিখা আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। বলল, 'এই দেখ অশোক, নন্দিতাদিকে ঠিক ধরে এনেছি!'

আমি দেখলাম, ঘরে শুধু অশোক না, আরো পাঁচ-ছয়জন ছেলেমেয়ে বসে আছে। সবাই একআধটু মুখচেনা, কলেজে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছি। অশোককে খুব সামনে থেকে দেখলাম। তমালের মত লম্বা কিন্তু তেমন রোগা না। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। রুক্ষ মুখ, অবিন্যস্ত চুল। দৃষ্টিতে একটা অসহিষ্ণু রাগ-রাগ ভাব।

একটি মেয়ে বলল, 'আপনি এখানে বসুন, নন্দিতাদি।'

শিখা বলল, 'না মন্দিরা, ও আজ নতুন এসেছে। ওকে চৌকিতে বসতে দে।'

আমি লজ্জিতভাবে মন্দিরার পাশে খালি মেঝেতেই বসে পড়লাম। অশোক লক্ষ্য করে বলল, 'না, আমাদের অনুমান ভুল হয়নি। মনে হয়, আপনি একদিন মাঠেময়দানে কাজ করতে পারবেন।'

আমি ওর কথার উত্তর দিলাম না। বাইরের বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। আমার সারাটা জীবন কেটেছে চার দেয়ালের বন্দীদশায়। আমার মন ঘরকুনো, জড়তাগ্রস্ত। এতগুলো অপরিচিত ছেলের সামনে বসে আমি ঘামতে লাগলাম। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি, অন্যায় হয়েছে, ভীষণ অন্যায়। বাবা জানতে পারলে রাগ করবেন। দাদাও খুশি হবে না নিশ্চয় কেন যে আমি শিখার কথা শুনতে গেলাম—

এইসময় আরো কে একজন এল। আমি মাথা তুলে তাকালাম। না, তমাল নয়, অন্য একজন। অশোকের পাশে জায়গা নিয়ে বসল।

শিখা বলল, 'এবার মিটিঙের কাজ শুরু কর, অশোক।'

শিখা অশোকের নাম ধরে ডাকছে, এটা আমার আশ্চর্য লাগল। যদিও একসঙ্গে একক্লাসে পড়ে, তবু এত বড়, প্রায় আমার দাদার বয়সের কাছাকাছি একটা ছেলেকে সমবয়সি মেয়েরা কি ওইভাবে নাম ধরে ডাকতে পারে? আমি তো শিখার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হব, কিন্তু আমি ও-ভাবে অশোকের নাম ধরে ডাকার কথা কখনো ভাবতে পারি না। শিখার সঙ্গে অশোকের সম্পর্ক কি? ওদের মধ্যে কি ভালবাসা আছে? শুনেছি ভালবাসাবাসি থাকলে মেয়েরা ওইভাবে ছেলেদের নাম ধরে ডাকে।

কিংবা ওরা সবাই বোধ হয় কমিউনিস্ট! কমিউনিস্টরা কি এইভাবে কথা বলে? শিখা কি তমালকেও নাম ধরে ডাকে নাকি? আমি একবার অশোক আর একবার শিখার মুখ দেখতে লাগলাম।

অশোক বলল, 'সামনেই আমাদের নির্বাচন। এই নির্বাচনে আমরা কি ভাবে লড়ব তা ঠিক করার জন্যই এই মিটিং। এই কলেজে আমাদের সংগঠন খুব দুর্বল। অবশ্য এই অঞ্চলেই আমরা পিছিয়ে আছি। তাহলেও অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। বাস-কনসেসন চালুর আন্দোলনে আমরা অনেক ছেলেকে সামিল করতে পেরেছি। আমাদের প্রভাব অনেক বেড়েছে। আশা করা যায় এবারের ইউনিয়নে আমরা চার পাঁচটা আসন বেশী পাব।'

অশোকের পাশে যে বসেছিল সে বলল, 'চার পাঁচটা কেন, সাত আটটা হতে পারে।'

অশোক বলল, 'আসন বাড়ার চেয়েও বড় কথা—সংগঠন আরো মজবুত করতে হবে। আমাদের আরো পরিশ্রম করতে হবে। এ বছর প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর বাড়ী যাব আমরা। আমাদের বক্তব্য বুঝিয়ে বলব। কাগজপত্র পৌঁছে দেব। এ কাজের জন্য সবাইকে এক একটা এলাকা ভাগ করে নিতে হবে।'

অশোক বলে যাচ্ছিল। আমি লক্ষ্য করছিলাম।

হাত নেড়ে একটু বক্তৃতার ঢঙে কথা বলা অভ্যাস ওর। শব্দ-

গুলিও খুব দ্রুত উচ্চারণ করে। ওর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে চোয়াল শক্ত হয়ে যায়।

তমালের অভ্যাস কিন্তু অন্যরকম। আমাদের বাড়ীতে যে ক'বার এসেছে, দাদার সঙ্গে বসে কথা বলেছে বা তর্ক করেছে, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, বাঁ হাতটা ডান হাতের কনুইয়ের কাছে রেখে, গালটা ডান হাতের মুঠোয় নামিয়ে দিয়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে কথা বলে ও। শব্দগুলো আস্তে আস্তে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে। শুনলেই মনে হয়, কথাগুলো বানানো নয়, বই পড়া নয়—ভেতর থেকে ঠেলে-ওঠা। একটা গভীর বিশ্বাস শব্দগুলিকে যেন ছুঁয়ে থাকে।

মিটিঙের কাজ চলছে এমনসময় বাইরে সাইকেল থামার শব্দ হ'ল।

শিখা উঁকি দিয়ে দেখে বলল, 'তমালদা এসে গেছে।'

শোনামাত্র আমি প্রবলভাবে চমকে উঠলাম। এইমাত্র তমালের কথা ভাবছিলাম—তারজন্যই কিনা জানি না। অথবা এই মানুষটা সম্পর্কে সেই প্রথম দিন থেকে মনে যে কৌতূহল দানা বেঁধে উঠছিল. ক্রমে তা ঘন হয়ে এই ক'মাসে কোনো আকর্ষণের রূপ নিয়েছে কিনা তাও বলতে পারব না। কিন্তু তমাল এ-ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে খুব সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতে গিয়ে যেন আরো বেশী আড়ষ্ট করে ফেললাম!

তমাল কিন্তু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখতে পেল, 'আরে, নন্দিতাকেও ধরে এনেছ!'

তমালের মুখে আমার নাম এই প্রথম উচ্চারিত হতে শুনে কানের ভেতরটা ঝিন্ ঝিন্ করে উঠল, বুকের মধ্যে কেমন শিরশিরানি জাগল। আমি মৃদু গলায় প্রতিবাদ করলাম, 'ধরে আনেনি তো, আমি নিজে এসেছি।'

'নিজে এসেছ? বাঃ, দলে আরেকজন মেম্বার বাড়ল আমাদের।'

অশোকের পাশে জায়গা নিয়ে বসল তমাল। আমার কথা শুনে ও যে খুব খুশি হয়েছে তা একপলক ওর মুখের দিকে তাকিয়েই

বুঝতে পারলাম। আসলে তমালকে খুশি করার জন্যই হয়ত কথাটা বলেছি আমি। ধরে আনার কৃতিত্ব শিখার, নিজে আসার গৌরব আমার। ও-কথা বলে আমি তমালের কাছে নিজেকে হয়ত গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু কেন? আমি এখানে আসা না-আসার কি বুঝি? আমি তমালের পার্টির, তার আদর্শের, কর্মনীতির কতটুকু জানি? শিখা আমাকে নিয়ে এসেছে বললে কি ক্ষতি হত? তমালের সঙ্গে শিখার একটাকিছু সম্পর্ক ধরে নিয়ে আমি কি এখুনি শিখাকে ঈর্ষা করতে শুরু করলাম?

এমনসময় শিখা বলল, 'জান তমালদা, আজ কমলারা ওকে পাকড়াও করেছিল। ক্যাণ্ডিডেট্ করার মৎলব।'

তমালের চোখে সেই পরিচিত কৌতুকের দীপ্তি দেখা গেল, 'নন্দিতা কেন ওদের ক্যাণ্ডিডেট্ হবে? ওর বাবা কি জমিদার, না ধানচালের চোরাকারবারী!'

ঘরে যারা ছিল সবাই হেসে উঠল। আমিও হাসলাম।

তমাল বলল, 'এ বছর কারো ক্যাণ্ডিডেট্ হয়েই কাজ নেই ওর। নতুন ঢুকেছে কলেজে, সব দেখুক, জানুক, মেলামেশা করুক।'

শিখা বলল, 'আমাদের সংগঠনের মেম্বার করে নেব ওকে।'

'তা করো। কিন্তু তার চেয়েও জরুরী কিছু পড়াশুনা। আচ্ছা নন্দিতা, তোমার দাদা তো আমার কাছ থেকে অনেক বই নেয়?'

আমি সহজভাবে স্বীকার করলাম, 'ওসব ইংরেজি বই, আমি বুঝতে পারি না।'

'ঠিক আছে। অশোক তোমাকে বাংলা বই দেবে। এখন আবার শুরু হোক—'

মিটিঙের কাজ চলছে এমন সময় নজরে এল দরজার কাছে বছর দশেকের রোগা কালো একটা ছেলে তমালের মুখের দিকে হাঁ করে

তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমার দেখাদেখি শিখাও ওর দিকে তাকাল।

তমাল বুঝতে পেরে বলল, 'ও আমাদের সাহেব! বাড়ী যাবে, তাই সাইকেলে তুলে নিয়ে এসেছি।' সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চুপ করে বসে থাক ওখানে। আর একটু পরেই যাব।'

ছেলেটা একান্ত অনুগতের মত দরজার কাছে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। তমাল আবার সংগঠনের কথায় ফিরে এল।

সেই দিনই অশোক দু'খানা বই দিল আমাকে। 'সমাজতন্ত্রে নারীর স্থান' ও 'কংগ্রেসী কুশাসনের দশ বছর'। অশোকের নির্দেশে সুব্রত ওর পকেট থেকে রসিদ বই বের করে নাম ঠিকানা লিখে হাতে দিয়ে বলল, 'আজ থেকে আমাদের ছাত্র-সংগঠনের মেম্বার হলেন আপনি।'

উঠে যাওয়ার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি ফেলে হাসতে হাসতে তমাল বলল, 'আমাদের নতুন কমরেড্, লাল সেলাম!'

শোনামাত্র আমার সারা শরীর কেমন কেঁপে উঠল। ভয়ে ভাবনায়, না অন্য কোনো গূঢ় গভীর আবেগে আমি জানি না। আমার হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে স্পন্দিত হ'ল। আমার সারা দেহের রক্ত ছলছল করে উঠল। কিছু না জেনে না বুঝেও আমার মুখের পেশী শক্ত হ'ল। আমি খুব স্পষ্ট করে, খুব তীব্র করে তমালের মুখ দেখলাম।

ও তখনও হাসছিল।

কমলাদি আমার উপর রেগে গেল। কিন্তু আমি কিছুতেই ওদের ক্যাণ্ডিডেট্ হতে রাজি হলাম না। আমার হাফ্-ফ্রি কেন, ফুল-ফ্রি হয়ে যেতে পারে—এটা জানার পরেও না। শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে কমলাদি বলল, 'ভোটটা আমাদের দেবে তো? না কি তাও দেবে না?'

নীলিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'আচ্ছা জেদি মেয়ে বাবা তুমি!'

আমি আর কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলাম।

দেখতে দেখতে কলেজের নির্বাচন এসে গেল। এখানে ওখানে পোস্টার পড়ল। ক্লাস-লেকচারিং শুরু হ'ল। আমাদের সংগঠনের পক্ষে অশোক আর সুব্রত, ওদের পক্ষে প্রসাদ আর তিলক, ক্লাস ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতে লাগল। আমি সব বক্তৃতাগুলো মন দিয়ে শুনলাম। পোস্টারগুলো খুঁটিয়ে পড়লাম। হ্যাণ্ডবিলগুলোও যত্ন করে বাড়ী নিয়ে এলাম।

এর মধ্যে শিখাদের বাড়ীতে মিটিঙ হ'ল একদিন।

আমি অশোককে বললাম, 'আর দুটো বই দেবেন আমাকে।'

অশোক বলল, 'ও দুটো শেষ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'না, শুধু পড়ে গেলেই তো হবে না। বুঝতে হবে। কেমন বুঝেছেন তার পরীক্ষা হবে।'

'কে পরীক্ষা নেবে, আপনি?'

অশোক হাসল, 'কেন, আমার উপর আস্থা নেই নাকি?'

আমিও হাসলাম, 'আপনি যা রাগী! কাল প্রসাদকে অমন করে মারতে গিয়েছিলেন কেন?'

'ওরা আমাদের পোস্টার ছিঁড়েছিল কেন?'

'তাই বলে অমন তেড়ে যাবেন? ওরা তো দলে ভারি, যদি সবাই মিলে আপনাকে মারত?'

'মারত? আমাকে?' অশোকের চোখ মুহূর্তে জ্বলে উঠল, সমস্ত মুখটা অসম্ভব কঠিন হয়ে গেল, বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'পারত না! একজন কমিউনিস্ট দশটা প্রতিক্রিয়াশীলের হাত ভেঙে দিতে পারে।....কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে আপনি ভয় পেলেন কেন? আমাদের পথটা তো বৈষ্ণবের নয়। একদিন আসবে যখন সারা দেশ জুড়ে রক্তের হোলিখেলা শুরু হয়ে যাবে।'

আমি এবার সত্যি ভয় পেয়ে বললাম, 'রক্তের হোলিখেলা! কি সাংঘাতিক!'

সেই জ্বলন্ত চোখ আর রাগরাগ মুখ নিয়ে অশোক যেন আমাকে ধমকে উঠল, 'আপনি দেখছি ভীষণ ভীতু। এমন ভীতু হলে তো চলবে না। জানেন কি, ভিয়েৎনামে মেয়েরা রান্নাবান্না আর ছেলে মানুষ করার ফাঁকে ফাঁকে রাইফেল হাতে লড়ছে? মর্টার থেকে গুলিগোলা ছুঁড়ে শত্রুর বিমান ধ্বংস করে দিচ্ছে? বুকে মাইন বেঁধে হাসতে হাসতে শত্রুর সাঁজোয়া গাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে?'

শুনে আমি অবাক হয়ে অশোকের মুখ দেখলাম।

ভিয়েৎনাম! শুধু ওই নামটাই আমার শোনা। আমি জানি না পৃথিবীর মানচিত্রে কোথায় ভিয়েৎনাম। কতটুকু সেই দেশ, কেমন সেই দেশ। সেখানে এমন কি লড়াই, যার জন্য ঘরের মেয়েদের রান্না ফেলে রাইফেল হাতে ছুটে যেতে হয়। গাছপালার আড়ালে কামানের মুখ লুকিয়ে শত্রুর বিমান নিশানা করে গোলা ছুঁড়তে হয়। একহাতে নবজাত শিশুর দোলনা ঠেলতে ঠেলতে অন্যহাতে চোখে দূরবীন ধরে বোমারু বিমানের আনাগোনা লক্ষ্য করতে হয়। সেই আশ্চর্য দেশ আর আশ্চর্য মানুষদের আমি প্রায় কিছুই জানি না।

আমার মুখচোখ দেখে অশোক যেন বুঝল। আমার অজ্ঞতা নিয়ে ব্যঙ্গ করল না। তমালের মতই মুখখানাকে গভীর আবেগমণ্ডিত করে বলল, 'হ্যাঁ, সে এক অবাক দেশ, অবাক তার মানুষ। আমাদের ইতিহাস তার কথা লেখে না। আমাদের ভাড়াটে কাগজ তার কথা ছাপে না। আমাদের বুর্জোয়া নেতারা তার কথা ভাবলে শিউরে ওঠে। আমি একটা বই দেব আপনাকে—'

'ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ।'

ও-ঘরে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দাদা পড়ছে লেনিন আর স্তালিনের রচনাবলী। এ ঘরে আমি মা-বাবা-দাদার চোখ ফাঁকি দিয়ে পড়ছি 'ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ'।

দাদার মনের পরিবর্তনের সংবাদ আমি সবই টের পাচ্ছি। বুঝতে পারছি ওর মধ্যে একটা আলোড়ন চলছে, ভয়ানক রকমের একটা ভাঙ্‌-চুর হচ্ছে। কিন্তু আমার মনের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। সংসারের চাল ডাল তেলের হিসাবের সঙ্গে যুক্ত আমরা, ঘরের কোন্ পুরুষই বা আমাদের খবর রাখে!

রুদ্ধশ্বাস আবেগে সারারাত জেগে বইটা শেষ করলাম। ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষের এক অসাধারণ ইতিহাস। পড়তে পড়তে বুকের রক্ত ছলছল করে ওঠে, সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বনজঙ্গল পাহাড়ে ঘেরা সেই আশ্চর্য দেশের আশ্চর্য মানুষগুলি যেন চোখের সামনে এসে নড়ে চড়ে বেড়ায়। তাদের কাঁধে রাইফেল, মুখে নির্ভয় প্রতিজ্ঞা, চোখে মমতার দৃষ্টি। তাদের নেতা চাচা হো, এক সরল অনাড়ম্বর বৃদ্ধ, গায়ে মোটা সুতিরজামা, পায়ে টায়ারের চটি—বজ্রমুষ্টি আকাশে তুলে স্থিরনেত্রে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। লাল টকটকে এই সূর্যকে ভিয়েৎনামের মাটিতে তিনি কখনো নিভতে দেবেন না!

বই শেষ করার পরে মনে হয়, এই ঘর-সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী আমি পার হয়ে গেলাম। বুঝি-বা আমিও এই দেশের রণক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করে মৃদুতালে একটা যুদ্ধের বাজনা বাজতে থাকে। বাকি রাতটুকু আর কিছুতেই ঘুম আসে না।

কলেজ-নির্বাচনে কিছু বেশী আসন পেলেও আমরা পরাজিত হলাম। প্রসাদ, তিলকেরা শহরে মিছিল বের করল। শিখার মেজদা কলকাতা থেকে ফিরে বলল, 'এবারও পারলি না তোরা, কি-রে!' শিখা মুখিয়ে ওঠে বলল, 'কি করে পারব! ওরা অফিসে আদালতে বাবা-কাকাদের দিয়ে ফোন করায়, গার্জেনদের চাকরি খেয়ে নেবার হুমকি দেয়! ভোটের দিন অর্ধেক ছেলে তো ভয়েই আসে না কলেজে।'

সমীর হাসতে হাসতে বলল, 'তোরা কোনো কাজের না! আমাদের ইউনিয়নে দেখ, অষ্টপ্রহর পত পত করে উড়ছে লাল নিশান।'

এই সময় তমাল এল।

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আসার জন্য হাঁফাচ্ছে। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'অশোক আর সুব্রত আছে এখানে? নেই? কোথায় ওরা?'

আমরা ঘর থেকে বাইরে এলাম। সমীর বলল, 'কেন, কি হয়েছে?'

'হয়নি এখনো, হতে পারে। ওরা এলে এখানে আটকে রাখিস, সমীর।'

যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল তেমনি চলে গেল তমাল।

আমি শিখার দিকে তাকালাম। ওর মুখ শুকিয়ে উঠেছে। অশোকের কথা ভেবে আমারও দুশ্চিন্তা হ'ল। ও যা অসহিষ্ণু আর মারমুখি—মিছিলের সামনাসামনি পড়লে একটা কাণ্ড করে ছাড়বে। হাতের নাগালে পেলে ওরা আজ অশোককে মারতেও পারে। সেদিন কলেজে প্রসাদ তো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'ঠিক আছে, ইলেকশনটা যাক। তারপর শালা তোর মুখের চেহারা পাল্টে দেব।' ভাগ্যি ভাল অশোক শুনতে পায় নি। শুনলে ওর উপর হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ত! অশোককে দেখলেই বোঝা যায়, তমালের মত সহিষ্ণু নয়। দশদিক ভেবে ঠাণ্ডা-মাথায় সবসময় কাজ করতে পারে না। ওর মধ্যে একটা বন্যতা আছে, আর সেই ভাবটা ওর কথাবার্তায়, চোখের দৃষ্টিতে সবসময় ফুটে ওঠে। কিছুতেই চাপা থাকে না। অথচ তমাল ঠিক ওর উল্টো। ভেবে ভেবে কথা বলে, ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়, সহসা উত্তেজিত হয় না। ওর মুখে, পাথরের প্রাচীন মূর্তিগুলোতে যেমন, তেমনি এক নিঃশব্দ কঠিনতা স্থিরভাবে বিরাজ করে। ঈষৎ-কটা চোখের মণিতে চাপা বিদ্রূপের ছটা রূপোর কাজললতায় রোদ পড়ার মত ঝকমক করে। তমালকে মনে হয় যেন একটা ধারালো

তরবারি, মোলায়েম খাপের মধ্যে নিঃশব্দে ঢাকা। অশোক যেন একটা খোলা বর্শা, সবসময়ই কিছু গেঁথে ফেলার জন্য উদ্যত।

ওদের দুইভাইয়ের এই দুইরূপ কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। আমরা নারী, পুরুষের রূপ ধরতে আমাদের চোখ খুব সজাগ। বেশী সময় নেয় না!

কিংবা তাই কি? এই এতদিনে তমালের মনের কতটুকু বুঝেছি আমি? কি বুঝেছি? আর শুধু তমাল কেন, আমি আমার নিজের মনেরই বা কতটুকু বুঝেছি? কেন বারবার শিখাদের বাসায় ছুটে আসি, কিসের আকর্ষণে, কিসের লোভে—আমি কি খুব পরিষ্কার করে তা জানি? আমি কি তমালকে ভালবাসতে চাই? ওই রৌদ্রতাপদগ্ধ রুক্ষ জগতের নিষিদ্ধ মানুষটাকে? যার চাল নেই, চুলো নেই, আশ্রয় নেই, নিরাপত্তা নেই? যে একটা পরিপূর্ণ ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমান, ভবঘুরে? এমন মানুষকে কেউ কি ভালবাসে! আমরা, মেয়েরা, যে অর্থে ভালবাসা বলি?

আমার মন বোঝাবুঝির পালা শেষ হতে না হতে অনেকখানি সময় গড়িয়ে গেল।

সাধারণ-নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে খাদ্য নিয়ে ঝোড়ো হাওয়া উঠল একটা। এই শহরে মিটিং মিছিল হ'ল। কলেজ ছুটির পর শিখাদের বাড়ীতে এসে সুব্রত, হিমানীশ, মন্দিরাদের সঙ্গে সাদা কাগজে লাল কালি দিয়ে পোস্টার লিখলাম, 'শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার, তোদের প্রাসাদে জমা হ'ল কত মৃত মানুষের হাড়, হিসাব কি দিবি তার?'

তমাল আমার লেখার প্রশংসা করল। পাশে বসে বলল, 'এটা কার কবিতা, তুমি জান?'

আমি বললাম, 'জানি, কিশোর-কবি সুকান্তর!'

তমাল ভুরু কুঁচকে বলল, 'কিশোর? সুকান্ত যদি কিশোর তবে এদেশে বুড়ো কবি কে? ওই যারা ফুল লতা পাতা পাখি নিয়ে পদ্য লেখে, তারা?....না নন্দিতা, সুকান্ত এদেশের এক প্রবীন কবি, চক্রান্তকারীরা তাকে কিশোর বানিয়ে রাখতে চায়।' বলতে বলতে মুখখানাকে আরো গম্ভীর করে আবৃত্তি করল তমাল—

'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলিতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই,
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই!'....

আবৃত্তি থামিয়ে বলল, 'এটা কি কোনো কিশোরের কবিতা?'

আমি পরিষ্কার কিছু না বুঝেও একদৃষ্টে তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওই খাদ্যের দাবিতে কলেজে ধর্মঘট করাতে গিয়ে প্রসাদদের হাতে সামান্য আহত হ'ল অশোক। গ্রাম থেকে কৃষকমিছিল এনে এস-ডি-ও-র বাংলো ঘেরাও করার অপরাধে পুলিশ তমালকে ধরে নিয়ে গেল।

বাড়ীতে বসেও এসব খবর পেতাম। এ-কথা ও-কথার ফাঁকে দাদাই একসময় বলে ফেলত। ততদিনে তমাল ওর মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। ওর চোখ মুখ থেকে অকর্মণ্য আদুরে ভাবটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। দিন দিন গম্ভীর আর উত্তেজিত হয়ে উঠছে দাদা।

একদিন বললাম, 'মনে হয় তুই-ও একজন কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছিস।'

দাদা বলল, 'কিসে বুঝলি?

আমি বললাম, 'তোর মুখ দেখে।'

'মুখে কি লেখা উঠেছে ?'

'হ্যাঁ। তুই কেমন রাগী-রাগী হয়ে যাচ্ছিস।'

দাদা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ রে নন্দি, তমাল যে বইগুলো দিয়েছে, দারুণ দারুণ সব কথা লেখা আছে ওতে। পড়তে পড়তে রক্ত গরম হয়ে যায়।'

বললাম, 'বেশী গরম করিস না। পুলিশ পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে।'

দাদা অবাক হয়ে বলল, 'তুই এত কথা শিখলি কোত্থেকে ?'

আমি হেসে ফেললাম, 'কলেজে পড়ছি না ? প্রায় একবছর হয়ে গেল !'

'ও, তাই !' খুব সরল বিশ্বাসে দাদাও হেসে উঠল। আমি যে শিখাদের বাড়ীতে নিয়মিত রাজনীতির ক্লাস করি, পোস্টার লিখি, মিটিং করি—তার কিছুই দাদা টের পেল না।

অশোককে মারার খবর শিখার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। ধর্মঘটের দিন কলেজ যাওয়া আমার বারণ ছিল। পরের দিন গিয়ে শুনেছি। শিখা বলছিল, মস্ত বড় ইঁটের টুকরো নাকি ছুঁড়েছিল ওরা। মাথায় লাগলে ঘিলু বেরিয়ে যেত, বুকে পড়ায় বেঁচে গেছে। সেই অবস্থায় অশোক ছুটে গিয়েছিল ওদের দিকে। কিন্তু সুব্রতরা ধরে ফেলে। প্রসাদরা কলেজের ছাদের উপর থেকে ইঁট ছুঁড়ছিল। সিঁড়ি ভেঙ্গে সেখানে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ওরা তাই দূরে সরে এসেছিল।

অশোকের বুকে চোট লেগেছে। এখন ক'দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। শিখা যখন বলছিল তখন রাগে ওর মুখ থমথম করছিল। ভেতরে ভেতরে চাপা আক্রোশে যেন ফুঁসছিল। গভীর কালো চোখের মণি থেকে আক্রমণকারীর প্রতি ঘৃণা আর অশোকের প্রতি নিবিড় ভালবাসা যেন ছিটকে পড়ছিল। আমি খুঁটিয়ে শিখার মুখ দেখছিলাম। ততদিনে আমার জানা হয়ে গেছে, শিখা অশোককে ভালবাসে। অশোকও শিখাকে।

কিন্তু অশোক যা-ই করুক, শিখা কি বুঝে ভালবাসল ওকে? ও যে তমালের চেয়েও বেশী বিপজ্জনক, বে-পরোয়া, বে-হিসেবি। শিখা কি ওকে নিয়ে কোনোদিন ঘর বাঁধতে পারবে?

বিকেলে কলেজ থেকে একসঙ্গে ফিরছি, একটা মোড়ের কাছে এসে শিখা বলল, 'আমি পার্টিঅফিসে যাব, অশোককে দেখতে। তুমি যাবে?'

আমি ইতস্তত করলাম, 'যাব?'

শিখা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'থাক, নন্দিদি। গিয়ে কাজ নেই।'

এইসময় বেল্ বাজিয়ে একটা রিক্সা আমাদের পাশে এসে পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম, কলেজের মোহিতবাবু। আমরা আরো সরে গেলাম। চারদিকে একটু তাকিয়ে চলন্ত রিক্সা থেকে মোহিতবাবু বললেন, 'শিখা, তোমাদের অশোক কেমন আছে?'

শিখা জবাব দিল, 'ভাল। তেমন কিছু লাগে নি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

রিক্সা আমাদের পার হয়ে চলে গেল। আমার কি যেন সন্দেহ হ'ল। অনেকদিন আগে সেই লাইব্রেরির ঘটনা মনে পড়ল। বললাম, 'শিখা, মোহিতবাবু কি তোমাদের লোক? কমিউনিস্ট?'

শিখা চকিত হয়ে চারদিকে তাকাল। স্পষ্ট করে কিছু বলল না। শুধু একটু হাসল।

এর দু'তিন দিন পর কোর্টের কাছে তমাল গ্রেপ্তার হ'ল। তার খবর পেলাম দাদার কাছ থেকে। বিকেলে একটু ঘুরেফিরে এসে বলল, 'একগণ্ডা লোককে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ্, সঙ্গে তমাল।'

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললাম, 'কেন রে?'

'আর কেন!' রাগ-রাগ মুখে দাদা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য মিছিল নিয়ে কোর্ট ঘেরাও করেছিল, তাই।'

দাদাকে উত্তেজিত দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম না।

রাত্রে বিছানা ঠিক করতে এসে দেখলাম, দাদা জানালা দিয়ে অন্ধকার সুভাষকলোনীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

বললাম, 'তুই পড়ছিস না যে?'

দাদা বলল, 'ভাল লাগছে না। ওই তমালটার জন্য—'

আমি অল্পকাল চুপ থেকে বললাম, 'আচ্ছা দাদা, জেলে নিয়ে গিয়ে খুব মারধর করে, পাথর ভাঙ্গায়, ঘানি টানায়, না রে?'

দাদা বলল, 'অসম্ভব কি! কমিউনিস্টদের ওরা কি মানুষ বলে মনে করে!' একটু থেমে পড়ার বইটা খুলতে খুলতে আবার বলল, 'এদেশে কমিউনিস্ট যে হয়েছে থানা-পুলিস তার পেছনে তো লেগেই আছে! একদিন হয়ত রাস্তায় গুলি খেয়ে মরবে, কিংবা স্রেফ লাঠি দিয়ে পিটিয়েই থেঁৎলে দেবে শরীরটা—'

শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। হাত পা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। দাদা কিছু বুঝতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকালাম অন্ধকার আকাশের দিকে। তমালের মুখটা মনে করার চেষ্টা করলাম। তারপর অশোকের মুখটা। ঝন ঝন শব্দে মনের অনেকগুলো তার যেন একসঙ্গে ছিঁড়ে গেল। খুব দুর্বল অবসন্ন ভাবে চিন্তা করলাম, একি করছি আমি! কার টানে, কিসের টানে ছুটে যাচ্ছি শিখাদের বাড়ী! যে ডাল ঝড়ে ভাঙার জন্য সবসময় তৈরী হয়েই আছে তাতে কোন্ পাখি বাসা বাঁধতে চায়?

কিন্তু তখুনি শিখার মুখটাও মনে পড়ে গেল। ও তো অশোককে ভালবাসে! কিসের জোরে কোন্ সাহসে ভালবাসে? ওরা দুজনে একই পার্টির, একই রাজনীতির অন্তর্গত হয়ে এক নৌকার যাত্রী হয়েছে বলে? আমি কি তাহলে আমার পরিচিত সংসারের বাঁধাধরা গণ্ডীতে থেকে একটা নিষিদ্ধ মানুষের দিকে বার বার হাত বাড়াচ্ছি বলে বার বারই

হাত পুড়িয়ে ফিরে আসছি। মনের দিক থেকে শিখা সেই গণ্ডী পার হয়েছে বলেই কি নির্ভয় হয়েছে ?

শিখাকে একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে, কি দেখে কি বুঝে ভালবাসল অশোককে। ভালবাসা বলতে ও কি বোঝে !

সাধারণ নির্বাচনও এসে গেল।

দল বেঁধে ভোটের কাজে নেমে পড়ল সবাই। শিখাদের বাড়ী ছোটোখাটো একটা অফিস হয়ে উঠল। দিন রাত পোস্টার লেখা হয়, ভোটারদের নাম নম্বর লিখে স্লিপ তৈরি করা হয়। সুভাষকলোনীর অবিনাশ, হিমানীশরা আসে। আমাদের পাড়ার সুকুমার আসে। তমালও আসে মাঝে মাঝে। আর তার খোঁজ করতে আসে রকমারি লোক। কোনো কোনো দিন আমিও থাকি। বাবা মাকে লুকিয়ে গোপনে কাজ করার মধ্যে উত্তেজনা আছে। সেই উত্তেজনা আমাকে টানে। তাছাড়া আছে ওই রৌদ্রদগ্ধ মানুষটা—যার ঈষৎ কটা চোখে কৌতুকের তীব্র ছটা মোমবাতির শিখার মতো দপ দপ করে। যেন এই দেশের বিধি-বিধান-ব্যবস্থার গোঁজামিলটা ধরা পড়ে গেছে তার কাছে, কৌতুকের ভঙ্গিটাও তাই নিখুঁত, শাণিত—কাছাকাছি আসা মাত্র রক্তের মধ্যে কেমন ঝড় ওঠে। তার তীব্র তিক্ত আস্বাদ নেওয়ার জন্য মন ছটফট করে। আমি সুযোগ পেলেই এ বাড়ী চলে আসি।

ভোটের সময় নানারকম ঘটনা ঘটে।

একদিন দেখি, সুভাষকলোনীর স্কুলের পাশ দিয়ে গৌর চাটুজ্যে যাচ্ছেন রিক্সায় করে, জনা বারো ছেলে ছুটছে তার পেছনে। তারা বেশ চেঁচিয়ে বলছে, 'গৌর চাটুজ্যে মুর্দাবাদ ! জগৎ দাস জিন্দাবাদ !'

ও-পাশে অবিনাশ ধমকাচ্ছে, 'এই ফণী, এই রাধু, এই সুফল—'

গৌর চাটুজ্যের রিক্সা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে আর মাঝে মাঝে ঘাড়

ঘুরিয়ে তিনি শাসাচ্ছেন, 'দেখে নেব, সব শালাকে দেখে নেব। আজই গিয়ে লাইট কেটে দেব, জল কেটে দেব, একটা মেথরও ঢুকবে না এ পাড়ায়—'

একদিন সন্ধ্যার মুখে অশোক এল উত্তেজিত হয়ে। তমালকে বলল, 'এই যে দাদা, আজও ওরা পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছে।'

তমাল বলল, 'কারা ?'

'আবার কারা! ওই ভোলা গণশারা। সাহেবকেও ধরে মেরেছে!'

'সাহেবকে ? কেন ? ও কি করল ?'

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল তমাল। কটাচোখে চাপা-আগুন ঝিকমিক করতে লাগল। অশোক ছটফটে গলায় বলে উঠল, 'জগৎদা অফিসে ছিল, তাই! নইলে গণশার হাত ভেঙ্গে দিতাম।'

তমাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল, 'না অশোক, এত সহজ ব্যাপার না। অনেকদিন ধরে অনেক শিশু অনেক নারী খুন করে ওরা হাত শক্ত করেছে, ওই কালোহাত একদিনে ভাঙ্গা যায় না। জগৎদা ঠিকই বলেছেন, পাল্টা আঘাত দিতে হলে শক্ত করে সংগঠন গড়ে তোল্।'

অশোক সন্তুষ্ট হ'ল না, চেঁচিয়ে বলল, 'তোদের দিয়ে কিছু হবে না! মার খেয়ে তোরা মরে যাবি!'

এর পরেরদিন বিকেলে সদাশিব ডাক্তার যাচ্ছিলেন শিখাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে। বারান্দায় লোকজন দেখে অভ্যাসমত বকবকিয়ে উঠলেন, 'তোরা কে রে ? কি করছিস এখানে ?....ওই যে এক ছোঁড়া কমিউনিস্ট! কি করছিস্ বাবা ? ভোট ? দিস্ বাবা, মণিশঙ্করকে দিস একটা ভোট—'

অশোক একলাফে বারান্দা থেকে রিক্সার সামনে এসে দাঁড়াল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

সদাশিবডাক্তার দু'হাত বুকের কাছে এনে ছড়িয়ে বললেন, 'না

বাবা, তোর সঙ্গে কোনো কথা নেই। তোকে দেখলেই আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়!'

অশোক বলল, 'আপনি তো খুব মণিশঙ্করের ভোট করে বেড়াচ্ছেন, ওদিকে মণিশঙ্করের লোকেরা আমাদের পোস্টার ছিঁড়ছে, কর্মীদের শাসাচ্ছে, সকালে ফুলতলির একবালকে ধরে মেরেছে। এসব কিছুর খবর রাখেন?'

ডাক্তারবাবু একটু যেন গম্ভীর হলেন, 'কারা করছে এসব?'

'অনেকেই আছে, ভোলা আর গণশা ওদের লীডার।'

'হুঁ! চৌধুরী মশায়ের দুই নন্দী ভৃঙ্গী! বলব, আজই বলব চৌধুরী মশাইকে! এবার রাস্তাটা ছাড় বাবা, আমার বুক ধড়ফড় করছে।'

অশোক সরে দাঁড়াল। সদাশিব তার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে ছড়া কাটলেন, 'ভোটের বাজি, চড়কবাজি, ফেরেববাজি, গুণ্ডাবাজি!.... চল্ বাবা, জোরে চল্! ভাত খাস না? কি করেই বা খাবি? ক'টাকা কামাস রোজ? এই হতভাগা—'

ডাক্তারবাবু চলে গেলে অশোক বারান্দায় উঠে এল। রাগ রাগ মুখ করে বলল, 'পাগল ডাক্তার! সেয়ানা পাগল! সব বোঝে! দাদা আবার বলে, কনট্রাডিকশন আছে! কচু আছে! চিরকাল ও মণিশঙ্করের ভোট করবে—'

ভোটের দু'দিন আগে তমাল এল আমাদের বাড়ী। বাবাকে বলল, 'চারটে ভোট আপনার বাড়ীতে। সব ক'টা কিন্তু চাই।'

বাবা বললেন, 'কি হবে ভোট দিয়ে? চাল ডালের দাম কমাতে পারবে?'

তমাল বলল, 'সব পারব না। সংবিধানটাই বাধা দেবে। আসল গলদ যে ওখানেই।'

বাবা বললেন, 'এ গলদ আর কবে দূর হবে? পনেরো বছর তো স্বাধীন হলাম আমরা—'

তমালরা চলে যাওয়ার একটু পরেই একখানা জীপ গাড়ীতে দলবল নিয়ে এলেন গৌর চাটুজ্যে। বাবাকে ডেকে বললেন, 'ভোট যেন নষ্ট করবেন না। গুণে গুণে সব মণিশঙ্করের বাক্সে ফেলবেন! এই শহরের রাস্তাঘাট স্কুলকলেজ কলকারখানা যা দেখছেন সবই ওঁর। ওঁর দানের তুলনা হয় না!'

বাবা বললেন, 'জানি, সব জানি, কিন্তু চাটুজ্যেমশাই, আমার রান্নাঘরের জানালাটা....?'

'হয় নি এখনো? কি মুস্কিল!' যেন বিষম লজ্জিত হলেন গৌরহরি। সোনার তারে বাঁধানো দাঁত মেলে হাসলেন, 'ভোটটা যাক্, করে দেব! এই এরা সব সাক্ষী রইল। কিন্তু আসল কথাটা যেন মনে থাকে মিত্তিরমশাই।'

ভোটের দিন বাবা বললেন, 'তোর মা'র গিয়ে কাজ নেই। তুই যেতে চাস, যা। কিন্তু খবর্দার মণিশঙ্কর ছাড়া আর কাউকে ভোট দিবি নে। ব্যালটে নম্বর থাকে, নামের পাশে টিক্ মেরে সেই নম্বর লিখে রাখে ওরা, তারপর বাক্স খুললেই সব জানতে পারে। দু'টো ভোটে কাজ করেছি আমি—ওসব চালাকি জানা আছে আমার।'

রাস্তায় দাদা বলল চুপি চুপি, 'তুই কাকে ভোট দিবি রে?

বললাম, 'বাবা বলেছে, মণিশঙ্করকে—'

'খবরদার না।' চাপা গলায় ধমকে উঠল দাদা, 'ওরা বড়লোক, আমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক? তুই জগৎবল্লভকে ভোট দিস।'

'আচ্ছা!'

দাদা হেসে বলল, 'দেখিস, ব্যালটের উল্টোপিঠে যেন ছাপ মেরে বসিস না। তাহ'লে কিন্তু বাতিল—'

সুভাষকলোনীর স্কুলবাড়ীতে ভোটকেন্দ্র খোলা হয়েছিল। আঙুলের ডগায় কালির ছাপ নিয়ে জীবনে এই প্রথম আমি ভোট দিলাম।

সেইদিনই বিকেলে শিখাদের ওখানে তমালের সঙ্গে দেখা হতে ও অল্পহেসে ঠাট্টা করে বলল, 'কি নন্দিতা, কাকে ভোট দিলে?'

আমি দেখলাম, তমালের শরীর আরো শুকিয়ে উঠেছে, মুখে-চোখে ঘন ক্লান্তির ছাপ, চুলগুলো রুক্ষ তামাটে। ভোটের কাজে এ ক'দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মিটিং করতে হয়েছে। মিছিল করতে হয়েছে। কতদিন ঠিকমত স্নান হয়নি, খাওয়া জোটে নি—কে জানে। ওর ক্লান্ত শীর্ণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা অসম্ভব মমতায় টনটন করে উঠল। ওর পরিহাসের উত্তরে আমি কিছু না ভেবেই মৃদুস্বরে বললাম, 'আপনাকে।'

'আমাকে! আমি তো দাঁড়াই নি!' বলতে বলতে তমাল সেই ক্লান্ত দীর্ঘ চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করল। ওর মুখ থেকে হাসির আভাটুকু মুছে গিয়ে সুন্দর একটা গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠল। আমার চোখ থেকে কি-যেন সে খুঁটিয়ে পড়ে নিতে চাইল।

সেই দৃষ্টির সামনে সহসা লজ্জিত হয়ে চোখ নামালাম। আমার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। হাত পা ঘেমে সারা শরীর কাঁপতে লাগল। আমি দেখলাম, শিখাও একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর রাস্তায়। শিখা ডাকল, 'নন্দিদি, চলে যাচ্ছ নাকি? শোন—'

আমি শুনলাম না। পরিবর্তে হিমানীশদের বাড়ীর উঠোনে সজনে গাছের ডালে কি একটা পাখী তীব্র সুরেলাগলায় অবিরাম ডেকে চলেছে, তা শুনতে শুনতে সুভাষকলোনী পার হয়ে গেলাম। ডাকটা খুব চেনা মনে হ'ল অথচ পাখিটার নাম আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না!

তারপরই সেই ভয়ঙ্কর সময়গুলো এসে গেল।

কমনরুমে রোজ কাগজ পড়তাম। যুদ্ধের খবর দেখে চমকে উঠলাম।

দুশ্চিন্তায় মা'র মুখ সবচেয়ে বেশী কালো হ'ল। বাবা বাজার

থেকে এলে বলল, 'হ্যাঁ গো, সবাই বলছে যুদ্ধ লেগেছে? জিনিসপত্রের দাম আবার বাড়বে তো?'

বাবা বললেন, 'বাড়বে কি, বাড়তে শুরু করেছে। এই দেখ না, আজ একটা দেশলাই কিনলাম, একপয়সা বেশী। কি ব্যাপার, না, বারুদ সব যুদ্ধে চলে যাচ্ছে!'

মা বলল, 'চাল ডালের দামও বাড়বে তাহ'লে?'

'বাড়বেই তো! কাল থেকেই বাড়তে শুরু করবে! আরে, যুদ্ধ লাগলে ব্যবসাদারগুলোরই তো পোয়াবারো।'

'আমার সংসার তাহ'লে কি করে চলবে?'

'সংসার?' বাবা যেন মা'কে ব্যঙ্গ করলেন, 'সংসারের কথা ভাবতে হবে না খোকার মা, দেশের কথা ভাবো!'

মা রেগে চেঁচিয়ে বলল, 'দেশ মাথায় থাকুক। আমার ছেলে মেয়েরা না খেয়ে শুকিয়ে মরলে দেশ ধুয়ে কি আমি জল খাব?'

বাবা বললেন, 'সে কথা কে ভাবে? রাজা যায় রাজার মত, প্রজারা যায় পেছনে পেছনে। রথের চাকায় কে মরল, কে বাঁচল, রাজা কি তার খবর রাখে?'

মা বলল, 'না রাখলে চলবে কেন? এখন তো আর সাহেবদের রাজত্ব নয়, স্বাধীন দেশ—'

'স্বাধীন দেশ? ধু-স্!' বাবা ঠোঁট উল্টে কি-রকম মুখভঙ্গি করলেন। তারপর বিড়ি মুখে নিয়ে অভ্যাসমত গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে বললেন, 'একটু আগুন দাও দেখি উনুন থেকে, আর দেশলাই খরচ করব না—'

কলেজ থেকে মিছিল বেরুল একদিন। সামনে কয়েকজন অধ্যাপক, পেছনে প্রসাদ, তিলক, কমলাদিসহ নীলকণ্ঠবাবুরা, তারো পেছনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর দল।

হাঁটতে হাঁটতে ছেলেরা শ্লোগান দিল, 'কমিউনিস্ট-চীন—নিপাত যাক, নিপাত যাক!'

মেয়েরা গান গাইল, 'সকলদেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি....'

বাবা প্রতিরক্ষা ফাণ্ডে পাঁচটাকা চাঁদা দিয়ে এলেন।

শুনে মা যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, 'কি আক্কেলে এতগুলো টাকা দিয়ে এলে তুমি? এখন সারামাস আমার চলবে কি দিয়ে?'

বাবা মিন মিন করে বললেন, 'তুমি কিছু বোঝ না। না দিলে ওই বড়বাবুটা কমিউনিস্ট বলে আমার চাকরি ধরে টান মারত।'

'আহা, কি তোমার চাকরি! মাস গেলে লাখ টাকা ঘরে আনছ! ঝপাং করে দিয়ে এলে অতগুলো টাকা!'

'অত কি দিতাম! মোটে এক টাকা দিতাম। কিন্তু ওই খোকার জন্য। ও-যে তমালের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে একটা কুচ্ছিৎ কাণ্ড করে রেখেছে! বড়বাবুটা সব খবর রাখে—'

'তাহ'লে দু'টাকা দিলেই পারতে! পাঁচটাকা কোন আক্কেলে দিতে গেলে?'

গজ গজ করতে করতে মা রান্নাঘরে ঢুকল। মাসের শেষে সেই টাকা ক'টার অভাব আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম!

শিখাদের বাড়ীতে অশোক একদিন বলল, 'বুঝলে সমীরদা, সব বুজরুকি—'

সমীরও ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ, ওদের কিছু চক্রান্ত আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

তমাল বলল, 'না বোঝার কি আছে? একটা অজুহাত সৃষ্টি করে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো ধ্বংস করার পরিকল্পনা। সঙ্কটে পড়লে শোষকশ্রেণী এমন অনেক যুদ্ধ, অনেক দাঙ্গার সৃষ্টি করে, আর তার সাহায্যে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পেতে চায়। এ কৌশল কিছু নতুন নয়।'

অশোক বলল, 'সোজা কথায়, আমাদের শায়েস্তা করার মতলব। দেখছ না, চারদিকে কেমন জাল ফেলেছে, কাগজগুলো কেমন মিথ্যের খই ফুটিয়ে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, উত্তেজিত করছে—'

হঠাৎ তমাল যেন আমাকে দেখল, 'এই যে নন্দিতা, শুনলাম তুমিও ওদের মিছিলে যাও নি? কেন যাও নি? কি বুঝেছ তুমি?'

আমি তমালের চোখে মুহূর্তকাল চোখ রেখে আবার নামিয়ে নিলাম। ওর প্রশ্ন আমাকে আহত করেছে এটা যেন বুঝতে পারল তমাল। একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'না, মানে, তুমি যাবে না আমরা জানতাম। কিন্তু কেন যাওনি তাও তো বুঝতে হবে। আসলে চীন হ'ল কমিউনিস্ট কান্টি্র, সমাজতান্ত্রিক দেশ। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্যকোনো দেশকে অধিকার করার জন্য আক্রমণ করতে পারে না। আমাদের সীমান্ত জুড়ে আজ যা চলছে এর মধ্যে সত্য যতটা আছে তার অনেক বেশী আছে মিথ্যার আবরণ। আসলে এই ব্যাপারটা আমাদের বুর্জোয়া সরকার আর তার সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুদের একটা ষড়যন্ত্র—'

তমাল বলে গেল। সেই পরিচিত অভিনিবিষ্ট ভঙ্গিতে। চোখের মণিতে মোমবাতির শিখা জ্বেলে, গভীর প্রত্যয়ে, নিবিড় বিশ্বাসে। আমি অপলকে মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিটি বর্ণ বিশ্বাস করলাম। বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অসাধারণ মেয়েদের কথা জানি না, আমাদের মত সাধারণ মেয়েদের হৃদয় চিরকালই আগে আগে যায়, বুদ্ধি তার পেছনে গুটিসুটি আসে। অনেকটা বড় জাহাজের পেছনে ছোট লঞ্চের মত। আমরা বুদ্ধি দিয়ে যা পাই, তাকে হৃদয় যতক্ষণ না গ্রহণ করে, বিশ্বাস করি না। কিন্তু হৃদয় দিয়ে একবার যা গ্রহণ করি তাকে বুদ্ধি দিয়ে আর বিশ্লেষণ করি না, পূর্ণতর করি।

এসব এমন স্পষ্ট করে সেদিন অনুভব না করলেও আজ বুঝতে পারি, দাদা পার্টিকে পেয়েছে ওই বুদ্ধির বেড়া ডিঙিয়ে। আমি পার্টিকে পেয়েছি মনের বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে।

আমার জীবনে তমাল সেই বিশ্বাসের প্রথম আশ্রয়। একদিন তমালই ছিল আমার পার্টি, কিন্তু এখন সমস্ত পার্টিই আমার তমাল।

আজ তাই মিছিলের হাজার মুখ থেকে তমালের মুখটাকে আমি আলাদা করে নিতে পারি না। সব একাকার হয়ে যায়।

ক'দিন যেতে না যেতে তমাল-অশোকের কথাগুলো সত্য হয়ে উঠতে লাগল। চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। এই শহরের পার্টিঅফিস আক্রান্ত হ'ল একদিন। জগৎবল্লভবাবু আর অশোক আহত হ'ল। কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তা হাঁটিয়ে পুলিশ থানায় নিয়ে গেল জগৎবল্লভকে। অশোক গা-ঢাকা দিল।

আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'ল। কোনোরকম সন্দেহ না করে বুঝলাম, দেশপ্রেমের এই বিপুল উচ্ছ্বাস, এ বড় মলিন, বড় সঙ্কীর্ণ। এর পেছনে কোথাও-না-কোথাও গভীর কিছু চক্রান্ত আছে। আছে একটা হীন ষড়যন্ত্র।

সন্ধ্যার দিকে দাদাও বলল ওই কথা।

একটু আগেই কলকাতা থেকে ফিরেছে। চোখ মুখ থমথমে। ক্লান্ত উদভ্রান্ত চেহারা। যেন ভেতরে ভেতরে ঝড় বইছে। আমি ভয় পেয়ে বললাম, 'দাদা, তোর কি জ্বর এসেছে?'

দাদা ঘাড় নাড়ল।

'তবে? কি হয়েছে?'

'কিছু ভাল লাগছে না। আজ ইউনিভার্সিটিতে ওই জয়শঙ্করেরা এমন মারল তমালকে—'

শোনামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল। মাথায় রক্ত ছুটে এল। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সারা শরীর কাঁপতে লাগল। কিন্তু এই প্রথম শিখার মত আমারও চোখ জ্বলে উঠল। রাগে ঘৃণায় মুখের পেশী শক্ত হয়ে গেল। আমি তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললাম, 'ওদের আর কত মারবে ওরা? কেন মারবে এমন করে?'

দাদা নিজেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, আমার এই ভাবান্তর লক্ষ করল না। হাতের মুঠো শক্ত করে বলল, 'সব মিথ্যা, সব ভণ্ডামি! দেশপ্রেম না ছাই! যত সব খুনী, স্মাগলার, ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারের

দল! তমাল যা বলে তাই ঠিক, ওদের পার্টি যা বলে তাই

আমি দেখলাম দাদার চোখে আগুন। কিন্তু আমার চোখের আগুন দাদা দেখল না!

তার ক'দিন পরে পুলিশ এসে গেল আমাদের বাড়ীতেও। দাদার কাছে আমি পুরোপুরি ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু বাড়ী সার্চ করে ওরা কিছুই পেল না।

তখন এই অঞ্চলে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। সুভাষ-কলোনী তমালদের শক্ত ঘাঁটি। তার অনেকগুলো বাড়ী সার্চ হয়েছে। হরিপদবাবু আর শিখাদের বাড়ী দু'বার করে সার্চ হয়েছে। সমীরদাকে কলকাতার ইউনিয়ন অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। সুব্রত গা ঢাকা দিয়েছে। প্রতিরক্ষা ফাণ্ডে একদিনের বেতন দিতে অস্বীকার করায় মোহিতবাবুর নামে 'চীনের দালাল' বলে পোস্টার পড়েছে। তাকে কলেজ ছাড়তেও বলা হয়েছে। তা নিয়ে কলেজে গোলমাল চলছে।

এই অবস্থায় একটু রাত্রির দিকে সুকুমার এল। বয়স কম হ'লে কি হয়, মুখখানাকে প্রবীনের মত গম্ভীর করে বলল, 'নন্দিতাদি, গোপন কথা আছে!'

আমি ওকে ঘরে এনে বললাম, 'কি কথা?'

সুকুমার বলল, 'কাল আপনাদের বাড়ী সার্চ হবে।'

শুনে আমি চমকে উঠলাম, 'কে বলল?'

'শিখাদিরা খবর পেয়েছে। বইপত্র ইস্তাহার যা আছে আমাকে দিন।'

'তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?'

'সেসব ঠিক হয়ে আছে!'

সুকুমার তমালদেরই ছেলে। ওকে অবিশ্বাস করার কারণ ছিল না। আমি দাদার টেবিল থেকে বইপত্র ইস্তাহার গুছিয়ে ওর হাতে

দিলাম। আমার কাছে যা ছিল তাও দিলাম। বাজারের থলেয় ভরে ও মুচিপাড়ার দিকে চলে গেল।

পুলিশ এসে খুঁজে-পেতে চলে যাওয়ার পর রাগে দুঃখে অপমানে যা মুখে আসে তাই বলে বাবা আমায় গালাগাল করলেন। দাদা আমাকে কলেজে ঢুকিয়েছিল আর সে-কারণেই আমার পাখা গজিয়েছে বলে দাদাকেও বকলেন। তারপর 'চাকরিটা দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাবে' এইরকম একটা ধারণা নিয়ে সর্বস্বান্তের মত মুখ করে অফিসে চলে গেলেন। তারপর মা কিছুক্ষণ আমাকে নিয়ে রইলেন। মা বাবার পাট চুকলে আমি দাদার জন্য তৈরি হ'লাম।

দাদা পড়ার টেবিলে আয়না রেখে গালে সাবান ঘষছিল। আমি ঘরে ঢুকতে মুখ গম্ভীর করে বলল, 'বইগুলো কোথায় সরালি ?'

দাদার গলায় স্বাভাবিকতা দেখে আমি এতক্ষণে কোথাও যেন একটু আশ্রয় পেলাম। মাথা নীচু করে বললাম, 'কাল সুকুমার এসেছিল। নিয়ে গেছে।'

'সুকুমার ? ওই স্কুলের ছেলেটা ?'

'হ্যাঁ।'

'হুঁ।....তমালরা কোথায় আছে তুই জানিস ?'

'না, দাদা।'

'সত্যি বলছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'শিখারা জানে ?'

'জানি না।'

'জানলেও বলে নি নিশ্চয়। তাই পুলিশ এখানে এসেছিল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সাবান-ঘষা গালে খর খর করে ব্লেড টানতে লাগল দাদা। আমি চলে আসছিলাম। তখন আবার ডাকল, 'নন্দি—'

'কি ?'

'এখন আর শিখাদের ওখানে যাবি না।'

'আচ্ছা।'

আবার নিস্তব্ধতা। আবার দাড়ি কাটার খর খর শব্দ। আমি আবার চলে আসছিলাম। দাদা হঠাৎ ঘুরে তাকাল আমার দিকে, 'নন্দি, তুই সত্যি সত্যি ওদের কাউকে ভালবাসিস নাকি? ওই অশোক বা তমালকে?'

লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি চুপ করে একটা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দাদা আবার বলল, 'সত্যি করে বল, তোর কোনো ভয় নেই।'

আমি স্তিমিত বিষণ্ণ গলায় বললাম, 'শিখা অশোককে ভালবাসে।'

'আর তুই তমালকে?'

আমি কেঁপে উঠে বললাম. 'না, দাদা।'

'কি না?'

'আমি জানি না।'

'কি জানিস না?'

'আমি কিছুই জানি না। তুই বিশ্বাস কর—'

দাদা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখ দেখল। তারপর যেন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে রে, নন্দি!'

বাবা অফিস থেকে ফেরার পথে থানায় বণ্ড সই করে এলেন। তারপর বাড়ী এসে আবার চিৎকার। কিন্তু এবার আক্রমণের মূল লক্ষ্য আমি নই, থানা পুলিশ, 'কি পাওয়া গেল আমার বাড়ীতে? হাতি না ঘোড়া? না চীনের ছাপ মারা এ্যাটম বোমা? কোত্থেকে কি খবর শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছে! দিতাম পকেটে ভরে দুটো টাকা ওমনি সুড় সুড় করে উল্টোমুখো হাঁটা ধরত। হাড়বজ্জাতের দল সব! যা দেখি, ধর দেখি ওই চালকলঅলাগুলোকে—'

মা বলল, 'ওই ওদের হাতেই তো পাঁচ-পাঁচটা টাকা দিয়ে এলে সেদিন।'

বাবা বললেন, 'ভুল করেছি। খুব ভুল করেছি। পাঁচ পয়সাও দেওয়া উচিত না ওদের। ডিফেন্সের নামে যত গৃহস্থ-বাড়ী চড়াও হয়ে হামলা করা!' তারপর একটু থেমে আমার দিকে চোখ পড়তেই, 'তোকে কেটে আমি দু'খানা করব! কলেজে যাওয়ার নাম করে লোকের বাসায় আড্ডা মারা! আবার শুনছ গো, ভালবাসা—তোমার মেয়ে ভালবাসা করেছে!'

মা ক'পা এগিয়ে এসে বাবাকে ধমকে উঠল, 'আঃ, চুপ কর তুমি! কেউ শুনতে পেলে এখুনি পাঁচকান হবে। বিয়ে দিতে হবে না মেয়ের? আর পুলিশের কথারই বা দাম কি? ওরা অমন হাজার গণ্ডা বানিয়ে বলে।'

'বলেই তো!' বাবাও সঙ্গে সঙ্গে, 'হাজার বার বলে! জাল জোচ্চরি ফুলিশ—তিনে মিলে পুলিশ। চোর চুরি করে গৃহস্থকে ধরে জেলে পোরে! ওদের আমি চিনি না? সেই যে গো সেবার নলহাটিতে থাকার সময়—'

জরুরীঅবস্থা ও ভারতরক্ষা-আইনের নাগপাশে মোড়া সময় একটু একটু করে এগুতে লাগল। কাগজ থেকে প্রতিদিন আমরা কমিউনিস্টদের অন্তর্ঘাতী কাজের খবর পেতে থাকলাম। দেশজুড়ে যেখানে যা কিছু ঘটতে লাগল তমালেরাই তার জন্য ষোলোআনা দায়ী থাকল। এমন কি, রেলের ফিশ্‌প্লেট সরানো, ব্যাঙ্কের টাকা চুরি, কাপড়ের গুদামে আগুন, খেলার মাঠে হাঙ্গামা—এই সবকিছুর জন্য কমিউনিস্টরাই দোষী সাব্যস্ত হ'ল। লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বললেন, কমিউনিস্টরা যে চীনের চর তা শীগ্‌গিরই তিনি প্রমাণ করবেন। তাঁর 'শ্বেতপত্র' তৈরীর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

আমরা একবর্ণও বিশ্বাস করলাম না। আমি না, দাদাও না। তমাল আমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল তাতে কোথাও এতটুকু চিড় ধরল না। আমরা জানলাম, এ ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। এদেশের গরীবের বিরুদ্ধে বড়লোকদের চক্রান্ত। শ্রমিক-কৃষকের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের চক্রান্ত। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। খয়েরি-রঙের ঝোলা-কাঁধে তমালের সেই দীর্ঘ শীর্ণ তাপদগ্ধ চেহারার পাশে প্রতিরক্ষার বাণী-সম্বলিত প্রধানমন্ত্রীর ছবিটা আমাদের কাছে নিতান্ত ম্লান মনে হতে লাগল।

এমন কি বাবা যে বাবা, তিনিও একদিন কাগজ পড়তে পড়তে বলে ফেললেন, 'দূর-দূর, কাগজঅলারা সব বানিয়ে লেখে! লুটপাট, দাঙ্গা, হাঁস চুরি, গরু চুরি—সব কমিউনিস্ট! কোনদিন শুনব বাঁজা-মেয়ের ছেলে হয় না তার দোষও ওই চীনের দালালদের! ওদের ধরার আগে ওই রাবণের-গুষ্টি চোরাকারবারী-ভেজালদারগুলোকে শায়েস্তা কর দেখি! দেশের জন্য হাপুসকান্নার অর্থ টা বুঝি!'

শুনতে পেয়ে নিরীহ-গোছের মুখ করে দাদা বলল, 'কি হ'ল বাবা?'

কাগজখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'কি আবার হবে। সরষের তেল বাজার থেকে উবে গেছে। নুটু সাহা দাম হাঁকছে পাঁচটাকা—'

দাদা বলল, 'হাঁকবেই তো! এখন আর আন্দোলন করার কে আছে? তমালরাই তো ওসব করত—'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'ওসব কথা ছাড় খোকা! দেখছিস তো, কেমন ছেঁকে তুলছে! কপালজোরে আমার চাকরিটা বেঁচে গেছে, এখন পেন্সন নিয়ে না গোলমাল করে!'

দাদা চুপ করে গেল। একটুপরে বাবা আবার বললেন, 'ওৎ পেতে বসে আছে সব। একটু লাল রং দেখেছে কি অমনি ঘ্যাঁ-চ্! নন্দিদের মাস্টারটার কেমন চাকরি চলে গেল? কেউ পারল আটকাতে?'

বাবার কথায় মোহিতবাবুর মুখটা মনে পড়ে গেল। সেই সরল সাদাসিধে মানুষটি, যিনি একদিন লাইব্রেরির বারান্দায় আমাকে চাপা-গলায় সাবধান করেছিলেন। কমিউনিস্ট সন্দেহে তাঁর চাকরি চলে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ, কিন্তু কিছু করার নেই। নীলকণ্ঠবাবুরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ মুখ খুললে 'দেশদ্রোহী' ছাপ মেরে জেলে চালান করে দেবেন। দেখেশুনে শিখার মত সাহসী মেয়েরাও চুপ করে গেছে।

কিন্তু কলেজ ছাড়ার আগে মোহিতবাবু একটা কাজ করে গেছেন। কলকাতা থেকে কয়েকহাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে এনেছেন। কলেজ-ফাণ্ডের হাজার হাজার টাকা কিভাবে চোরা-পথে মণিশঙ্করের ঘরে উঠে যাচ্ছে তার নিখুঁৎ হিসাব আছে ওতে। সেই হ্যাণ্ডবিল সারা মহকুমায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই নিয়ে পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে চাপা উত্তেজনা। ক্রুদ্ধ মণিশঙ্কর পুলিশ লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, মোহিতবাবুও বেপাত্তা।

জরুরীঅবস্থার মধ্যে আমার পরীক্ষা শেষ হ'ল। দাদারও হ'ল। শিখা পরীক্ষা দিতে পারল না। সুব্রত বা অশোকের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। আর তমাল? সেই নিষিদ্ধমানুষটা কোন্ নিষিদ্ধ-জগতে নির্বাসিত থাকল আমরা কেউ জানলাম না।

দাদা চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে—এইসময় বাবা মারা গেলেন। এক-রকম হঠাৎ-ই। এক বিকেলে রিক্সায় করে বাড়ী ফিরলেন। তাঁকে রিক্সায় আসতে দেখেই আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে বাবা বললেন, 'বুকের সেই পুরনো ব্যথাটা! শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে—'

দাদা ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। ঘরে কোথায় পুরনো ঘি আছে মা খুঁজতে লাগল। আমি বুকে হাত ঘষে দিতে লাগলাম। বাবা জিব বের করে মাঝে মাঝে ঠোঁট চাটতে লাগলেন, আর একটু পর পর

বলতে লাগলেন, 'শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। খোকা? খোকা কোথায় গেল? উঃ, মা, মাগো—'

সদাশিববাবুকে না পেয়ে দাদা যখন অন্য ডাক্তার নিয়ে এল তখন বাবার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চোখের মণিদুটো স্থির, শক্ত। খাড়া নাকটা একপাশে ভেঙ্গে পড়েছে। মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। থেকে থেকে আমার শুধু ঠাকুমার মুখটা মনে পড়ছে!

ঠাকুমার বড়ছেলে, আমার বাবা, মরে গেল। অথচ সেই বুড়ী জানতেও পারল না!

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে দাদা বলল, 'একটা চাকরি দরকার নন্দি। এখুনি, এই মুহূর্তে।'

কিন্তু চাকরি কি চাইলেই পাওয়া যায়? কলে-কারখানায় ক্রমাগত ছাঁটাই চলছে। স্কুলকলেজে গ্র্যাণ্ট আসা বন্ধ। সরকারি অফিসগুলোতে লোক নেওয়া বারণ। সবদিকেই সরকারের খরচ কমানোর চেষ্টা, কারণ প্রতিরক্ষা খাতে অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে। দাদা কাগজ দেখে পাগলের মত দরখাস্ত ছুঁড়তে লাগল। একটারও জবাব এলো না।

একদিন বললাম, 'আমিও তো চাকরি করতে পারি। আমার জন্যও দেখ না?'

দাদা রেগে উঠল, 'দাঁড়া হতচ্ছাড়ি, একে রাধে রাঁধে না তায় তপ্ত আর পান্ত!'

ক'দিন পরে সুভাষকলোনীর হরিপদদা এলেন। স্কুলের প্রেসিডেণ্ট উনি। বয়স্ক মানুষ। ময়লা ধুতির উপর আধময়লা পাঞ্জাবি। মাথা-জোড়া টাক। কলকাতায় একটা সওদাগরি অফিসে কাজ করেন। অবসর সময়ে স্কুলের দেখাশোনা।

দাদাকে বললেন, 'শিখাদের কাছে তোমাদের কথা শুনেছি। ওরা তো আসে এখানে?'

দাদা বলল, 'বাবার কাজকর্ম ওরাই তো সব করেছে।'

হরিপদদা বললেন, 'চাকরি খুঁজছ? আমি তোমাদের দু'জনকেই কাজ দিতে পারি।'

দাদা অবাক হয়ে বলল, 'কি রকম?'

হরিপদদা বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু মাইনে পাবে কিনা বলতে পারছি না।'

দাদা আরো অবাক হ'ল, 'সে আবার কি কাজ?'

হরিপদদা হাসলেন, 'কলোনীর মাঠে স্কুলটা দেখেছ নিশ্চয়? আমরা তৈরি করেছি। এখন টেন্ পর্যন্ত চলছে। ভেঙে না দিলে হায়ার সেকেণ্ডারি হবে।'

'ভাঙার কথা কেন বলছেন? কারা ভাঙবে?'

'আমাদের সবকিছু যারা ভাঙছে—ওই মণিশঙ্কররা! সুভাষ-কলোনীর লাউগাছটার উপরেও ওদের রাগ। পুলিশ এসে উনুনের ছাই পর্যন্ত ঘেঁটে পরীক্ষা করে। সব যে কমিউনিস্ট!'

তারপর একটু একটু করে সব বললেন হরিপদদা। ক'দিন আগে পুলিশ এসে স্কুলবাড়ীটাও সার্চ করে গেছে। হেড্‌মাস্টার বাইরের লোক। পুলিশের ধমকধামক খেয়ে চাকরি ছেড়ে পালিয়েছে। আরো তিনজন শিক্ষক একমাস ধরে আসছেন না। শোনা যাচ্ছে, মণিশঙ্কর তাদের অন্য জায়গায় কাজ দিয়েছেন। এখন থাকার মধ্যে শিখা, অবিনাশ আর হিমানীশ। কিন্তু তিনজনে কি হবে? প্রায় দু'শ ছেলে-মেয়ে স্কুলে। সব ক্লাস 'কভার' করা যাচ্ছে না। হিমানীশ তো ধরতে গেলে ছেলেমানুষ, শিখাও তাই। ডামাডোলের বাজারে এই কমিউনিস্ট-স্কুলে নতুন লোক আসতে সাহস পাচ্ছে না। স্কুল বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

অথচ এটা তো একটা চ্যালেঞ্জ?

তমাল-জগৎবল্লভের বিরুদ্ধে মণিশঙ্করদের চ্যালেঞ্জ। সুভাষকলোনীর তিনহাজার খেটে-খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে একদল মুনাফাখোরের

চ্যালেঞ্জ। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের চ্যালেঞ্জ। আমরা কি তার মোকাবিলা করব না? হেরে গিয়ে স্কুলের দরজায় তালাবন্ধ করব? কি বলবেন জগৎদা, যখন ফিরে আসবেন জেল থেকে? সুব্রত অশোকেরা কি বলবে, যারা দরজায় দরজায় ঘুরে এই স্কুলের জন্য চাঁদা তুলেছে? কি বলবে তমাল, স্কুলের জন্য নিজের হাতে যে ইঁট-বালি বয়েছে, জল টেনেছে?

বলতে বলতে যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন হরিপদদা। তাঁর প্রৌঢ় মুখে রক্ত ছুটে এল, উত্তেজনায় চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বড়আকারের নস্যির ডিবেটা চৌকির উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'বল, তোমরাই বল, কতগুলো চোর-বাটপাড়ের কাছে আমরা কি হেরে যাব?'

দাদা একমুহূর্ত দ্বিধা করল না। একটুও ভাবল না। বলে উঠল, 'না, হরিপদদা, স্কুল কেন উঠে যাবে? আমি কাজ করব। তমালরা না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাব না।'

আমি বলে উঠলাম, 'দাদা, আমিও করব!'

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে খুব খুশি হয়ে হরিপদদা বললেন, 'জানতাম, তোমরা এই কথাই বলবে। তমাল যাদের সঙ্গে মেশে তাদের সে চিনতে ভুল করে না। তাহ'লে কাল থেকেই স্কুলে যাবে তোমরা। ভেবো না, একেবারে ফাঁকে পড়বে না। মাস গেলে যখন যেমন আদায় হয় ভাগবাঁটোয়ারা করে পাবে সবাই।'

যথারীতি স্কুলের ক্লাস শুরু হ'ল। দাদা ইংরেজির এম-এ, হেড্‌মাষ্টার। আমি সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, ইতিহাস ও বাংলা পড়াই। অবিনাশ ও শিখা অঙ্ক করায়। হিমানীশ যায় নীচু ক্লাসে। দক্ষিণের নতুন ঘরে ক্লাস করার সময় তমালের সেই রৌদ্রতাপদগ্ধ চেহারাটা মনে পড়ে। কলেজে যাওয়ার পথে এখানে কতদিন দেখেছি তাকে। মিস্ত্রি মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে লোহা কাটছে কিংবা জল টানছে। সেদিন ভেবেছি ছেলেমানুষি। ভেবেছি, লোক-দেখানো কাজ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আসলে তা ছিল প্রবল ভয়ঙ্কর একটা

জিদ। এই স্কুলকে ভাঙার জন্য মণিশঙ্করেরা যত বেশী হিংস্র হয়েছে—তমালেরা তত বেশী জেদি হয়ে ইঁটের পর ইঁট গেঁথে এর ভিৎ পাকা করে তুলেছে। আর শুধু তমাল কেন, সুভাষকলোনীর সমস্ত মানুষের মুখেই এই জিদটা যেন প্রতিজ্ঞার রেখা হয়ে ফুটে আছে। ক'দিন বন্ধ থাকার পর আবার চালু হয়েছে শুনে কতলোক যে ঘুরে ফিরে স্কুল দেখতে এল। দাদার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করল। পরামর্শ দিল, উপদেশ দিল। তারপর যাবার সময় দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সবাই এক কথা বলে গেল, 'দেখবেন মাস্টার—আর যেন বন্ধ না হয়। তাহলে জগৎমশাই এলে আমরা আর মুখ দেখাতে পারব না। তার উপর তমাল আছে, অশোক আছে—'

দাদা হেসে সবাইকে নমস্কার করে বলল, 'না, না, আর বন্ধ হবে না! তমালরা না ফেরা পর্যন্ত আমরা ঠিক চালিয়ে যাব।'

এই বাড়ীর দরজা-জানালায়, আসবাব-পত্রে, বই-কাগজে সর্বত্র তমাল ছড়িয়ে আছে। দু'দিন না যেতেই এই স্কুল যেন আমার কাছে গভীর এক ভালবাসার বস্তু হয়ে গেল। আমার সমস্ত অস্তিত্ব এই স্কুলের সঙ্গে এক হয়ে জড়িয়ে গেল।

একদিন ছুটির পর টিচার্সরুম ঝাঁট দিচ্ছি দেখে দাদা এসে বলল, 'এ কি রে নন্দি, মতি কোথায় গেল?'

আমি বললাম, 'সে তো তিন দিন ছুটি নিয়েছে। দেখছ না, হিমানীশ ঘণ্টা বাজাচ্ছে?'

দাদা একটু ভেবে বলল, 'আমাদের আরো একজন লোক দরকার। বাচ্চাগোছের হলেও চলবে। আচ্ছা, আমি দেখছি।'

এর দু'দিন পরে গোলগাল মুখের কুচকুচে-কালো সেই সাহেবকে ধরে নিয়ে এল। রাঘবের দোকানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ওর পক্ষে আর লোক রাখা সম্ভব নয়। অথচ তমাল দিয়ে গেছে বলে সাহেবকে ছাড়াতেও পারছিল না। দাদার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল।

এখন একটু বড় হয়েছে সাহেব। হাতে পায়ে সামান্য মাংস

লেগেছে। চোখে-মুখেও একটা শহুরে ভাব। দাদা ওকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'পালা করে এক এক বাড়ীতে খাবি আর স্কুলে মতির সঙ্গে শুয়ে থাকবি। পারবি তো?'

সাহেব ঘাড় নাড়ল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে স্কুল বাড়ীটা দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, 'তমাল-দাদাবাবু কোথায় লুকিয়েছে?'

দাদা হেসে বলল, 'কেন? তার খোঁজে কি দরকার?'

সাবেব বলল, 'এমনি।'

দাদা অল্প হেসে বলল, 'তুই বুঝি খুব ভালবাসিস তমালকে?'

সাহেব উত্তর দিল না। ফোলা ফোলা চোখ করে দাদার দিকে চেয়ে থাকল। আমার মনে পড়ল, তমাল প্রায়ই ওকে সাইকেলের সামনে কিংবা পেছনে বসিয়ে মা'র কাছে নিয়ে যেত। তমালও নিশ্চয়ই খুব ভালবাসে সাহেবকে।

'ভালবাসা' শব্দটা মনে মনে উচ্চারিত হতে সমস্ত চেতনা জুড়ে কেমন বিষণ্ণতা দেখা দিল। আর তখুনি বুকের গভীরে অনেক দিন আগের একটি অচেনা পাখির ডাক শুনলাম। হিমানীশদের উঠোনে সজনে গাছের ডালে পাখিটা ডাকছিল। তার কি নাম, আমি এখনো জানি না!

ক'দিন স্কুল চলার পর একদিন পুলিশের জিপ্ গাড়ী এসে থামল। সেই হিরণ্ময় ঘোষাল হাতে সিগেরেট, বগলে টুপি নিয়ে গট গট করে দাদার ঘরে ঢুকলেন। আমরা সবাই গিয়ে ভিড় করে দাঁড়ালাম। ছেলে-মেয়েরাও উঠোনে-বারান্দায় জড়ো হ'ল।

হিরণ্ময় আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুড্ গড, এ যে দেখছি একেবারে চাঁদের হাট বসে গেছে! রাজ্যের যত কমিউনিস্ট এক জায়গায় জড়ো হয়েছে!'

দাদা কঠিন গলায় বলল, 'এটা স্কুল। আপনি কি জন্য এসেছেন বলুন।'

হিরণ্ময় বললেন, 'আপনারাই তো টেনে এনেছেন মশাই! লোকে

বলছে 'জাতীয়সঙ্গীত' দিয়ে এই স্কুলের কাজ নাকি শুরু হয় না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম রিপোর্টটা নিয়েই যাই।'

দাদা বলল, 'তাহলে স্কুল শুরুর সময় আসবেন। দেখবেন ছেলেরা কি গায়।'

হিরণ্ময় আর ঘাঁটাঘাটি করলেন না। দু'একটা প্রশ্ন করে গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্কুল-কলেজে পুলিশ ঢোকা, চলবে না, চলবে না।'

তাদের থামাতে আমরা বাইরে এসে অবাক হয়ে দেখলাম, সাহেবও তার কালো রোগা হাত আকাশে ছুঁড়ে সমানে চিৎকার করছে, 'চলবে না, চলবে না।'

বিকেলে হরিপদদা এসে বললেন, 'ভয় পেও না। এখন ধরাধরি একটু কমে আসছে। স্কুল-বসার আগে 'জনগণমন' চালিয়ে যাও। ছেলেমেয়েদের বেশ গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে গাইতে বলবে যেন থানা পর্যন্ত গলা পৌঁছয়।'

আমি একটু একা পেয়ে বললাম, 'তমালদা কোথায়, আপনি জানেন?'

হরিপদদা খুব তীক্ষ্ণ চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে কি যেন দেখলেন। লজ্জা পেয়ে আমি মাথা নীচু করে আঙুলে শাড়ীর আঁচল জড়াতে লাগলাম।

হরিপদদা বললেন, 'জানি না। আর জানলেও বলতাম না। এখন সময় খুব খারাপ। ওদের কথা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

একদিন শিখাদের বাড়ীতে ভয়ানক একটা কাণ্ড হ'ল।

রেললাইনের ধারে ওদের বাড়ী। কোনো পুরুষমানুষ নেই। একটু রাতের দিকে ছোট পাঁচিল টপকে কারা যেন উঠোনে নামল। পায়ের

শব্দে শিখা বাইরে এল। ও খুব সাহসী মেয়ে, ভয় না পেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইল। কুকুর বেড়াল হতে পারে. কখনো শেয়াল ওঠে আসে। সামনা-সামনি কিছু না দেখে আরো একটু এগিয়ে পাঁচিলের ধার পর্যন্ত গেল। ওদিকটায় কলাগাছের ঝাড়। ছায়া ছায়া অন্ধকার। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। শিখা চেঁচিয়ে বলল, 'কে, কে ওখানে?' অন্ধকার থেকে একজন লাফ দিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। দুরন্ত সাহসে দাঁত বের করে হেসে বলল; 'তোমার শ্বশুর বাড়ীর লোক। বউ নিয়ে যেতে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা গলা খিক খিক করে হেসে উঠল।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল শিখা। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তারপরই আত্মরক্ষার আদিম তাড়নায়, অন্ধ শক্তির আবেগে মরিয়া হয়ে লোকটার গালে মারল এক চড়। খুব সম্ভব লোকটা মদ খেয়েছিল। শিখার চড়ের ধাক্কাটুকু সামলাতে পারল না। একদিকে টলে পড়ল। চড় মেরেই চিৎকার শুরু করল শিখা, পরিত্রাহি চিৎকার। আশে-পাশের বাড়ী থেকে লোকজন ছুটে এল। তারপর দেখতে দেখতে সুভাষকলোনীর দেড় দু'শ মানুষ লাঠি বর্শা বল্লম হাতে চারদিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে ধরা গেল না।

শিখা একজনকে সন্দেহ করেছিল। আগেও কয়েকবার ওর পেছনে আসতে দেখেছে তাকে। তার নাম বুঝি গণেশ। হিমানীশ তার নামে থানায় ডায়েরি করতে গেল।

একে সুভাষকলোনী তায় শিখাদের বাড়ী তায় আবার হিমানীশ! হিরণ্ময় ঘোষাল উল্টে তাকেই চেপে ধরলেন, 'যারা এসেছিল তারা পার্টির লোক নয় তো? তমাল নয় তো? অশোক কিংবা সুব্রত নয় তো? ওরা নিশ্চয়ই আসে রাতে রাতে? কি বলছেন, আসে না? কি করে জানলেন? আপনি ও-বাড়ীতেই রাত কাটান নাকি? জানি, সব জানি! ওই বাড়ীর মেয়েটা তো আপনাদের রক্ষিতা বললেই হয়!'

আমাদের বাড়ী থেকে শিখাদের বাসাটা অনেকটাই দূর। রাত্রে আমরা কিছু টের পাই নি। পরের দিন স্কুলে দাদার কাছে সব বলতে গিয়ে শিখার মত মেয়েও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, 'এই অপমান আর কতদিন সহ্য করতে হবে অলকদা? আর কতদিন?'

আমি দেখলাম দাদার চোখে সেই পুরনো আগুন! আরো তীব্র, আরো শাণিত। কোন কথা বলতে পারছে না। ঠোঁটদুটো কাঁপছে।

শিখাকে কাঁদতে দেখে আমিও অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম, ওর কোথায় লেগেছে। একদিন আমাকেও আমার মা বাবার সামনে ওই ও-সিটা কুৎসিৎভাবে ওই রকমই একটা কথা বলেছিল। দাদার চোখে এমনি আগুন জ্বলে উঠেছিল।

হিমানীশ যদি অশোক হ'ত তাহ'লে 'রক্ষিতা' শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত হিরণ্ময়ের ঘাড়ে। জিবটা টেনে ধরত। না ছিঁড়ে ছাড়ত না কিছুতেই। তারপর গুলি খেয়ে হয়ত মরত। আর হিমানীশ যদি তমাল হ'ত? তাহ'লে শব্দটা শুনে হয়ত টান টান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। দু'চোখের তীব্র তিক্ত ঘৃণা নিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকত কয়েক মুহূর্ত। তারপর লোকটা যেন স্পর্শেরও অযোগ্য এমনভাবে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিত ওর মুখে। লাঠি গুলি তাহ'লেও চলত। কিন্তু মৃত্যুর পরেও তমালের মুখে সুতীব্র সেই ঘৃণার রেখাগুলো উদ্যত হয়ে থাকত।

হিমানীশ অশোক নয়, তমালও নয়। ও এখনো ছেলেমানুষ। তবু চুপ করে ছিল না। শব্দটা শোনামাত্র সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, 'শিখাদি আমাদের বোন। রক্ষিতা তো আপনারাই—দশবিশ টাকা ঘুষ দিলেই যাদের কেনা যায়। মণিশঙ্কররা যেমন কিনে রেখেছে! এমন কি, ওই গুণ্ডা বদমাশ ওয়াগন ব্রেকারেরাও—'

এরপর হিমানীশকে সারারাত আটকে রেখেছিল ওরা। ভোরের দিকে ছেড়েছে। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। দুই হাতের তেলো রক্ত জমে ফুলে লাল হয়ে আছে। এখন খুব জ্বর।

শুনতে শুনতে দাদার মত আমার চোখও জ্বলে উঠছিল। গরম নিশ্বাস পড়ছিল। শিখার হাতটা আমি শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম।

একটুপরে চোখের জল মুছে শিখা বলল, 'না, ভয়ে ভয়ে আর লুকিয়ে থাকা না, আবার কাজ শুরু করতে হবে আমাদের। সংগঠন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না।'

দাদা বলল, 'হ্যাঁ, শিখা, তমালরা নেই তো কি হয়েছে। আমরা আছি। সংগঠনের কাজ আবার শুরু হো'ক।'

অবিনাশও সায় দিল, 'হ্যাঁ অলকদা, আমি খবর দিচ্ছি সবাইকে।'

পরের দিন রাত্রেই মিটিং ডাকলেন হরিপদদা।

সুভাষকলোনীতে নয়। এখানে সাদাপোষাকে পুলিশের লোক সবসময় ঘুরে বেড়ায়। মিটিং হবে বাগ্দীপাড়ায়, নিতাই বাগ্দীর ঘরে। দাদাকে বুঝিয়ে বললেন, 'চিনে যেতে পারবে তো অলক? কেউ কিন্তু কাউকে ডাকাডাকি করবে না। একা একা বেড়িয়ে পড়বে। তোমাদের বাড়ী থেকে পশ্চিমে নেমে গেলে মুচিপাড়া, তার পরেই বাউরি বাগ্দীদের পাড়া। একটা মস্ত বড় নিমগাছ আছে নিতাইয়ের উঠোনে। তাছাড়া গেলেই শুনতে পাবে ঢোল বাজিয়ে গান চলছে—'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ও-পাড়ার লোকগুলো খুব ভাল, খুব বিশ্বস্ত। জুতো সেলাই, রিক্সাটানা, দিনমজুরি এইসব করে। অবসর সময় বাঁশের কাজ করে, ছাগলের চামড়া দিয়ে ঢাক ঢোল বানায়। জগৎদাকে 'জগৎমশায়' বলে ওরা, খুব মান্য করে। একসময় ছিল, যখন এই সুভাষকলোনী তৈরী হয়নি, আমরাও আসি নি, তখন এই শহরে পার্টিঅফিসের জন্য ঘরভাড়া দিত না কেউ, জগৎদাকে দেখলে সাতহাত তফাতে সরে যেত, সেই তখন জগৎদা ওদের পাড়ায় ঘর নিয়ে থাকতেন! ওদের নিয়ে আন্দোলন করতেন। সেই আন্দোলন এখনও চলছে। ওরা রিক্সা ইউনিয়ন করেছে, ঝাড়ুদার জমাদারদের

ইউনিয়ন করেছে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তার স্বীকৃতির জন্য লড়াই চালাচ্ছে। মণিশঙ্করদের চোখরাঙানিকে আর বিশেষ ভয় করছে না।
....মিটিঙের স্থান হিসেবে পাড়াটা খুব নিরাপদ। রাতের দিকে পুলিশ ঢোকে না ও পাড়ায়। সম্ভবত ভয় পায়। লোকগুলো ভারী বদরাগী তো! অভাবে পড়লে চুরিচামারি করে, ডাকাতিও করে। রাত্রিবেলায় মদ টেনে রক্ত গরম হয়ে থাকে। পুলিশ ঢুকতে সাহস পায় না।
....তাহ'লে ওই কথাই রইল, ঠিক দশটায় চলে যাবে একে একে।'

দাদা আমাকে নিতে রাজি হ'ল না, 'তুই গিয়ে কি করবি?'

আমি জিদ্ ধরে বললাম, 'কেন? শিখা তো যাচ্ছে। তাছাড়া মন্দিরা আসতে পারে।'

দাদা কয়েকমুহূর্ত ভাবল। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন রাজি হ'ল। খাওয়াদাওয়ার পাট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। 'তোদের যা খুশী তাই কর' বলতে বলতে মা দরজা বন্ধ করল।

অন্ধকার রাত্রি। অপরিচিত পাড়া। গাছগাছালির মাথায় বাতাসের শব্দ উঠছে শন্ শন্। নীচু পাড়ার কাঁচারাস্তায় শুয়োরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো ছাগল বা ভেড়া ডেকে উঠছে। বাতাসে কাঁচা চামড়ার গন্ধ। এখানে ওখানে এক আধটা লণ্ঠনের আলো টিম টিম করছে।

কিছুদূর এগুতেই একটা লোক লাফিয়ে এল সামনে। আমরা চমকে উঠলাম। দাদা টর্চ জ্বালল। লোকটা আরো সামনে এসে দাদার মুখ দেখে বলল, 'ও, মাস্টরবাবু! ওই সোজা চলে যান, ঢোল বাজছে—'

একটু এগিয়ে দাদা বলল, 'আমাদের লোক।'

আমি বোকার মত প্রশ্ন করলাম, 'ওরা এত মদ খায় কেন! কি বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল!'

দাদা আমাকে ধমকে উঠল, 'তবে সারাদিন খেটে খুটে কি খাবে? আঙুরের রস? ওই দেশিটা খায় বলে ওরা বেঁচে আছে!'

আর কথা বললাম না। চুপচাপ হেঁটে নিতাইয়ের বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম।

উঠোনে নিমগাছের তলায় চাটাই পেতে বসার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ পঁচিশজন মানুষ এরিমধ্যে জড়ো হয়ে গেছে। এখানে ওখানে গোল হয়ে বসেছে সবাই। শিখা অবিনাশদের দেখা যাচ্ছে। অন্যদের ভাল করে চেনা যাচ্ছে না। ঘরে বাইরে অন্ধকার। নিমগাছের ডালে বাতাসের ঝাপটা। বাইরে রাস্তায় নিতাইরা ঢোল বাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিকট সুরের গান। এ পাড়ায় প্রায়ই এমন হয়। সন্দেহের কিছু নেই।

আমি আর দাদা একটা জায়গা নিয়ে বসে পড়লাম।

এই অদ্ভুত পরিবেশে অজানা আশঙ্কায় আমার বুক ঢিব ঢিব করছিল। কিন্তু সারা শরীরে আশ্চর্য উষ্ণ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। বারবার সেই বইটার কথা মনে পড়ছিল—'ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ'। সেই জলা জঙ্গল পাহাড়ে ঘেরা আশ্চর্য দেশ। প্রতি পদে পদে শত্রুর সঙ্গে লড়াই। মাটির নীচে, পাহাড়ের গুহায় গোপন ঘাঁটি। রাত্রির অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে মুক্তিফৌজের শলা পরামর্শ। গাছের পাতায় শরীর মিশিয়ে শত্রুকে অব্যর্থ লক্ষে বিদ্ধ করা!

এই দেশ, এই মাটি, কাঁচা চামড়ার গন্ধ জড়ানো নিতাই বাগ্দীর এই ঘর-উঠোন-নিমগাছটা যেন আশ্চর্য অন্তর্মিলে আমার কাছে ভিয়েৎনামের রূপ নিচ্ছিল। যেন আমরা এখানে, অন্ধকারে সমবেত মুক্তি সৈনিক, গেরিলাযুদ্ধের এক গোপন কৌশল জানার জন্য মিলিত হয়েছি। আমরা কেউ কাউকে জানিনা, চিনিনা, কখনো দেখিওনি। অথচ আমরা সবাই এক। আমাদের সমস্ত মন এক তারে, এক সুরে বাঁধা। সবাই আমরা আজ এখানে শোষণমুক্তির পাঠ নিতে এসেছি!

আবেগে আনন্দে আমার হাত পা কাঁপছিল। ভয়ে-ভাবনায় বুক

হুর্ হুর্ করছিল। আমার রক্তের মধ্যে খুব মৃদুতালে গুরুগম্ভীর একটা যুদ্ধের বাজনা মন্দ্রিত হচ্ছিল। এ এক আশ্চর্য শিহরণ, অপূর্ব অনুভূতি।

মনে পড়ল, এইরকম শিহরণ ও রোমাঞ্চের স্বাদ আমি জীবনে আর একবার মাত্র পেয়েছি। যেদিন শিখাদের বাড়ীতে অকস্মাৎ তমাল আমার হাতে হাত রেখেছিল, গভীর উজ্জ্বল আকুলতায় আমার চোখে চোখ মিলিয়েছিল—সেদিন। আমার বুকের ভাঁজে ভাঁজে অসহ্য লজ্জা ও ভয়ের সঙ্গে সেদিনও এমনি গভীর গম্ভীর অথচ বিষণ্ণ এক যুদ্ধের বাজনা মন্দ্রিত হয়েছিল।

পার্টিঅফিস আক্রান্ত হওয়ার আগের দিনের ঘটনা।

বিকেলের দিকে শিখাদের বাড়ীর চৌকিটায় শুয়েছিল তমাল। মুখ দেখলেই বোঝা যায় অসম্ভব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। সারাদিন রোদে রোদে ঘুরেছে। ঘাড়ে গলায় ধুলোর আস্তরণ—পা দুটোও ধুলোয় ভরা। ক'দিন দাড়ি কামানো হয় নি। চুলে তেল পড়েনি। শীর্ণ মুখটা আরো বেশী রোগা মনে হচ্ছে। চোখের ভাঁজে কালি পড়েছে। সব মিলিয়ে বড় বেশী অসহায় ও করুণ দেখাচ্ছে তমালকে। একটা হাত মাথার নীচে দিয়ে পায়ের খানিকটা অংশ বাইরে রেখে খালি চৌকিটায় শুয়ে আছে।

ঘরে ঢুকে ওকে এইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলাম। তমালের এমন নিঃসঙ্গ করুণ ভেঙে-পড়া মূর্তি কখনো দেখিনি। সমস্ত মন অসম্ভব মমতায় টনটন করে উঠল।

আমি জানতাম, এইসময় তমাল বা জগৎবল্লভবাবুর উপর অসম্ভব কাজের চাপ পড়েছে। চারদিকে পুলিশী আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে আছে দেশভক্তের দল। কাগজগুলো তারস্বরে কুৎসা প্রচার করে চলেছে। রেডিও খুললে তারই প্রতিধ্বনি। সাধারণ কর্মীরা ভীত, বিভ্রান্ত। এইসময় গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকসমিতিগুলোকে সতর্ক করতে হচ্ছে। অসংগঠিত ইউনিয়নের কর্মীদের বোঝাতে হচ্ছে।

বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীর কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে! দিনে-রাতে এখন কারো বিশ্রাম নেই।

ঘরে শিখাকে না দেখে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর নিঃশব্দে, যেন তমালের ঘুম না ভাঙে এমন সন্তর্পণে, ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ তমাল ডাকল, 'নন্দিতা!'

সেই নির্জন ঘরে সেই নিম্নস্বরের আহ্বানে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তমাল তাড়াতাড়ি উঠে বসে বলল, 'শিখা হরিপদদার বাসায় গেছে। এখুনি আসবে।'

'ও।'

'তুমি আমাদের নতুন কমরেড্, এদিকে এস। কথা আছে।'

আমি আস্তে আস্তে তমালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তমাল বলল, 'বসো নন্দিতা।'

আমি নিঃশব্দে সেই চৌকিটার একধারে বসলাম।

তমাল আমার মুখে তীব্র দৃষ্টি ফেলে শব্দ করে হেসে ফেলল, 'মুখখানা অমন প্যাঁচার মত করে রেখেছ কেন? আমি সত্যি সত্যি কিছু সাংঘাতিক জীব নই।'

আমি চোখ তুলে মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'কে বলে সাংঘাতিক?'

'অনেকেই বলে। ভারতবর্ষের সমস্ত কাগজে দিনরাত তাই ছাপা হচ্ছে। রেডিওতে প্রচার চলছে—'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসে যায়? বাইরে গিয়ে দেখ, দেশের অনেক মানুষই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—আমরা দেশদ্রোহী, স্পাই, বাঘের চেয়েও হিংস্র, মাতৃঘাতী!'

তমালের ক্ষুব্ধ উত্তেজিত গলা শুনে স্পষ্ট করে ওর মুখ দেখলাম। ঈষৎ কটাচোখে সেই পরিচিত বিদ্রূপের শিখা। কিন্তু সারামুখে গভীর বেদনার ছাপ। মনে হ'ল, তমালকে আজ কেউ রূঢ়ভাবে আঘাত দিয়েছে। হয়ত ওইসব কথা বলেই তীব্র কটুভাষায় অপমান করেছে।

সে হয়ত পার্টির কাছাকাছি কোনো লোক, একদা নির্ভরযোগ্য ছিল, তমালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও হতে পারে, এখন দেশপ্রেমের প্রবল বন্যায় ভেসে গিয়ে শত্রুপক্ষ হয়েছে। তমালের ক্ষোভ ও বেদনা আমাকে আহত করল। কিন্তু বলার মত কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। শুধু গভীর সহানুভূতির দৃষ্টি মেলে ওই রৌদ্রতাপদগ্ধ মানুষটার দিকে চেয়ে রইলাম।

একটুপরে তমাল নিজেই বলল, 'না, নন্দিতা, সাধারণমানুষের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। থাকতে পারে না। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এই কুৎসা, এই অপপ্রচারের জবাব একদিন সাধারণমানুষই দেবে। কিন্তু তারজন্য আমাদের অনেক খাটতে হবে, অনেক বেশী পরিশ্রমী হতে হবে।'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'অনেক কিছু করার আছে, নন্দিতা। আর ক'দিন পরেই আমরা হয়ত ধরা পড়ব, নয়ত পালিয়ে বেড়াতে হবে। তখন তোমাদের কাজ শুরু হবে—'

'কি কাজ?'

'তখন পার্টির দায়িত্বে যারা থাকবেন তারা যোগাযোগ করে বলে দেবেন।'

স্থির শান্তগলায় বললাম, 'আমাকে যা করতে বলবেন, করব।'

তমাল গম্ভীর হয়ে বলল, 'করতেই হবে। শোষনমুক্ত সমাজ গড়ার কাজ তো শুধু পুরুষের একার নয়। নারীও আছে তার সঙ্গে। তারাও সংগ্রামের সাথী, সহযোদ্ধা। এই পুরনো জীর্ণ-সমাজ ভেঙ্গে নতুন যে-সমাজব্যবস্থার জন্ম হবে তার ভিৎ কাটবে পুরুষ কিন্তু বনিয়াদ গাঁথার মশলা যোগাবে নারী। নারী-পুরুষের সম্মিলিত শক্তির সামনে প্রবলের অহঙ্কার চূর্ণ হবে। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যা হচ্ছে ভিয়েৎনামে। তুমি পড়োনি সে বই?'

'পড়েছি।'

'শুধু পড়লে তো হবে না। তার কিছু জীবনেও নিতে হবে। সাহসী সৈনিকের মত এগিয়ে আসতে হবে পার্টির কাজে। পার্টিকে ভালবাসতে হবে। মনে রেখো নন্দিতা, এই দেশে, এই সমাজে, সর্বহারার পার্টি ছাড়া আমাদের ভালবাসা রাখার জায়গা আর কোথাও নেই। আর কোথাও থাকতে পারে না।....কি, পারবে না নন্দিতা?' বলে যেন অনেকটা ভাবাবেগেই আমার প্রসারিত কম্পমান হাতের উপর রুক্ষ শীর্ণ হাতখানা স্থাপন করল তমাল। গভীর উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে।

আমার সমস্ত রক্তস্রোত এক অজানা আশঙ্কায় আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি কোথাও যেন মৃদুতালে যুদ্ধের বাজনা বাজতে শুনলাম। বুকের গভীরে অসহ্য আবেগের থরো থরো কাঁপুনি নিয়ে আবিষ্টের মত বললাম, 'পারব। আমিও একদিন পারব।'

মিটিং শুরু করে হরিপদদা বললেন, 'আমাদের পার্টি-সম্পাদক জগৎদা এখন জেলে, তমালের স্থান তাঁর পরেই। কিন্তু সেও আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। এখন পার্টি-পরিচালনার যা কিছু দায়দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়েছে। আমরা পার্টির সভ্য বা সমর্থক যে যেখানে আছি যোগাযোগ করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মিউনিসিপ্যালিটি, বাস, রিক্সা, কাঁচকল ও ময়দাকলের শ্রমিকদের একত্র করে ছাঁটাই বন্ধ ও মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করতে হবে। এখন কিছুদিন চলবে শুধু অর্থনৈতিক লড়াই। তারপর অবস্থা আরএকটু থিতিয়ে এলে তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে রাজনৈতিক দাবি। তখন পাশাপাশি চলবে—চীনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আন্দোলন, আমাদের প্রিয় কমরেডদের মুক্ত করে আনার আন্দোলন—'

এইসময় লম্বা মত কে একজন এল। অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল না। আমি ফিস ফিস করে বললাম, 'দাদা, তমাল কি এসেছে?'

দাদা বলল, 'বুঝতে পারছি না। টর্চ জ্বালব ?'

আমি ভয় পেয়ে বললাম, 'না, দাদা। কেউ সন্দেহ করবে।'

হরিপদদা বললেন, 'এখন কাজ চালিয়ে যাওয়া খুব শক্ত। চারদিকের অবস্থা আমাদের প্রতিকূল। একদিকে দেশপ্রেমের নামে পুলিশী নির্যাতন, অন্যদিকে পার্টির অভ্যন্তরে শোধনবাদীদের চক্রান্ত—এই দ্বিমুখী আক্রমণের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। বিশেষ করে শোধনবাদীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। ওরা ঘরের শত্রু বিভীষণ। দেশপ্রেমের নামাবলী গায়ে দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই জেলায় সংখ্যায় তারা নিতান্ত অল্প হলেও একেবারে শক্তিহীন নয়। তমাল বা অশোককে ধরিয়ে দেবার জন্য তারা চেষ্টা করছে। ইউনিয়ন-কর্মীদের নামে পুলিশে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। আর কিছুদিন পরে পার্টি থেকে নিশ্চয়ই ওদের তাড়িয়ে দিতে হবে। তখন সরকারীভাবে পার্টি হয়ত দু'ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন না হচ্ছে, ওদের সম্পর্কে খুব সজাগ থাকবেন—'

আমি আবার চুপি চুপি বললাম, 'দাদা, শোধনবাদ কি ?'

দাদা বলল, 'বেইমানি। শোষকশ্রেণীর হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বেইমানি। এখন চুপ কর, বাড়ী গিয়ে বুঝিয়ে দেব।'

মিটিং শেষ করে হরিপদদা একজন একজন করে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। আমাদের ভাইবোনকে বাইরের কাজ বিশেষ দিলেন না। বললেন, 'স্কুল টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমাদের। নন্দিতা মাঝে মাঝে মহিলা-সমিতি গড়ার কাজে শিখাকে সাহায্য করবে, আর অলকেশ পণ্ডিতমানুষ, ইস্তাহার লেখার কাজগুলো করবে।'

যারা এসেছিল তারা নিঃশব্দে চলে যেতে লাগল।

আমি দাদাকে বললাম, 'মনে হয় অশোক এসেছিল, আমি যেন গলা শুনলাম।'

পাশ থেকে শিখা বলল, 'না নন্দিদি, ওরা কেউ আসেনি। শুধু সুব্রত এসেছিল মাঠ ভেঙ্গে, আমার পাশেই বসেছিল।'

আমি অল্পকাল চুপ করে থেকে বললাম, 'সুব্রত জানে না, ওরা কোথায় আছে?'

'না, নন্দিদি। শুধু হরিপদদা জানেন। কিন্তু মরে গেলেও উনি বলবেন না কাউকে।'

'তোমাকেও না?'

'না, নন্দিদি।'

হরিপদদার নির্দেশ মত পার্টির কাজ শুরু হ'ল।

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে কয়েকহাজার ছাপানো ইস্তাহার পৌঁছে দেওয়া হ'ল। পার্টির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত কুৎসার জবাব ছিল তাতে। আর ছিল ভবিষ্যৎ কর্মনীতির ঘোষণা।

হিমানীশ ও সুকুমার কলেজ-হোস্টেলগুলোতে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের সংগঠিত করতে লাগল। সুকুমার এখন কলেজে পড়ে। সুব্রতর মতই সক্রিয় কর্মি হয়ে উঠেছে ও। ওদের চেষ্টায় ছাত্রদের একটা বড় অংশ পার্টির কাজে এগিয়ে এল।

গ্লাস-ফ্যাক্টরির একবাল ওর সহকর্মিদের নিয়ে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। বৃন্দাবনের নেতৃত্বে বাসকর্মিরা বিনা ওভারটাইমে আটঘণ্টার বেশী কাজ করতে অস্বীকার করল। নিতাই বাগ্দীর নেতৃত্বে মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার-জমাদার ইউনিয়ন বেতন বাড়ানোর দাবি তুলল।

আর এইসময়ই সুব্রত ধরা পড়ল। গভীর রাতে ফুলতলির শ্রমিক বস্তিতে একবালের ঘরে গিয়েছিল। ফেরার পথে পুলিশ অনুসরণ করে ধরে ফেলল।

তার মাসখানেক পরে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারীভাবে দু'ভাগ হয়ে গেল।

হরিপদদা মিটিং ডেকে বললেন, 'ভালই হ'ল! এবার কাজ করার

সুবিধা হবে। এখন থেকে আমরা মার্কসবাদী আর ওরা অ-মার্কসবাদী! ওরা নাকি প্রগতিশীল পুঁজিপতির ল্যাজ ধরে বিপ্লব করবে! তা বিপ্লব করুক না-করুক লেজুড়বৃত্তি যে করবে তাতে সন্দেহ নেই। তার নমুনা তো এখনই দেখছি! কেমন সুন্দর পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে আমাদের কর্মীদের ধরিয়ে দিচ্ছে! এই-না হলে শোধনবাদ!....শুনছি সদরে ওরা আলাদা অফিস খুলছে। একদিন এই শহরেও হয়ত খুলবে। কিছু কিছু দলছুট তো আছেই—'

আমরা কেউ ভাঙলাম না, দল বদলালাম না, তবু এই শহরে সত্যি সত্যি আলাদা একটা অফিস দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের চেয়ে তিনগুণ বড় সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হল।

মুচিপাড়া থেকে বাঁশের-মোড়া বিক্রি করতে এসে বুড়ো তিনকড়ি বলল, 'পেল্লাই আপিস গো দিদিমণি, আমিও দেখেছি।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'নাম লিখিয়ে ফেল তাহ'লে!'

শুনে বুড়োর কোঁচকানো চোখ আরো কুঁচকে গেল। গম্ভীর মুখে কি ভেবে বলল, 'ও-দলে জগৎমশায় আছেন?'

'না।'

'ওই কালোপানা তমালদাদাবাবু?'

'না।'

'হরিপদমশাই, পেল্লাদের বেটা নিতাই?'

'না।'

'তবে ওটা গরিবের পার্টি হ'ল কেমন করে? ওটার মধ্যি গলদ আছে!' বলে মোড়াগুলো বেঁধে বারান্দা থেকে নেমে গেল তিনকড়ি। এমন রাগ-রাগ ভঙ্গি করে গেল যেন আমি সত্যি সত্যি ওকে ভুল বুঝিয়ে ওই-পার্টিতে টেনে নেবার চক্রান্ত করছিলাম!

জগৎবল্লভ, তমাল বা হরিপদদার প্রতি এই বৃদ্ধ দরিদ্র মানুষটির গভীর বিশ্বাস আমার মনকে নতুন করে নাড়া দিল। আমি যেন ওকেও ভালবেসে ফেললাম। আসলে আমি নিজেও তো ওই বিশ্বাসেরই

শরিক। রাজনীতির চুলচেরা বিচার করে আমি তো পার্টিতে আসিনি। কোথাও একটা বিশ্বাসের আশ্রয় না পেলে কেউ কি আসে?

ওই যে নতুন একটা পার্টি দাঁড়িয়ে গেল—তার সঙ্গে আমাদের পার্টির মৌলিক পার্থক্য কি, আমার কাছে এখনও তা পরিস্কার নয়। শোধনবাদের সমস্যাটাও আমি কখনো খুঁটিয়ে তলিয়ে বিচার করিনি। সেটা করেছিলেন হরিপদদা। হয়ত দাদাও করেছিল। আমি ওই বৃদ্ধ তিনকড়ির মতই হরিপদদার প্রত্যেকটি কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করেছিলাম। কারণ আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, হরিপদদা যা বলেন তা তমালের কথাই বলেন। তমালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। আমার মনের শিকড় বহু আগে থেকে তমালের মনের গভীরে সঞ্চারিত। সেখানে ভূমিকম্পে স্তরবদল না হ'লে এ শিকড় ওঠায় কে!

সময় আরো এগিয়ে গেল।

দেশপ্রেমের বন্যার জল সরে গিয়ে এখানে ওখানে শুকনো ডাঙা দেখা দিল। ভারতবর্ষের আর একটা রাজ্য কেরলে কারারুদ্ধ কমরেডরা নির্বাচনে জয়ী হলেন। সে সংবাদ এই অঞ্চলেও আলোড়ন তুলল। পার্টি-সংগঠনের কাজ আমরা আরো সংহত, আরো দ্রুতগামী করলাম।

দাদা রাত জেগে ইস্তাহার লিখত। খাদ্য নিয়ে, বন্দী মুক্তি নিয়ে। সেসব ইস্তাহার কলকাতা থেকে গোপনে ছাপিয়ে আনা হত। আমরা পোস্টার লিখতাম। হিমানীশ সুকুমাররা তা দেয়ালে সেঁটে আসত। এসব কাজে আরো একজন নতুন কর্মী পেলাম আমরা। সে হ'ল সাহেব। অসম্ভব উৎসাহে হিমানীশদের সঙ্গে পোস্টার কিংবা আঁঠার টিন নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

খাদ্যআন্দোলনের সঙ্গে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়তেই আবার এক নতুন চক্রান্ত শুরু হ'ল।

পাক-ভারতের যুদ্ধ।

আবার চারদিকে সাজ সাজ রব। আবার কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণের চেষ্টা। আবার মিথ্যার বেসাতি, কুৎসার বন্যা। কলকাতার কাছাকাছি একবার বোমা পড়তেই সাইরেন বাজানো চালু হ'ল। রাস্তার বাতিগুলো নিভিয়ে রাখা হ'ল। স্কুলে অনেকগুলো বালির বস্তা এল। সরকারি অফিসের কাঁচের জানালা দরজায় কাগজ সাঁটা হ'ল। 'অধিক ফসল ফলানো'-র সরকারি ডাক শুনে মিউনিসিপ্যালিটির অধর হালদার অফিসের সামনে কাঠাতিনেক খোলা জায়গায় একদিন ঘটা করে আলু বেগুনের বীজ পুঁতলেন। কলকাতার এক নামকরা দৈনিকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছবিসহ সে খবর ছাপা হ'ল।

আর এই সময়ই পাকিস্থানী চর বলে গ্লাস-ফ্যাক্টরির একবাল, বাস ইউনিয়নের ইব্রাহিম, ময়দাকলের মনসুর আলিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে হরিপদদা বললেন, 'এই অজুহাতে কয়েক-হাজার মুসলমানকে ওরা ধরেছে। প্রায় সবাই আমাদের পার্টির কর্মী। কিন্তু এবার খুব সুবিধা হবে না। ওদের দেশপ্রেমের মুখোশ খুলে পড়েছে। বাংলাদেশের মানুষ ওদের চিনে ফেলেছে। এবার পাল্টা আঘাত হানব আমরা।'

বিকেলে মিটিং ডাকা হ'ল ফুলতলিতে। প্রকাশ্য মিটিং। একবাল, ইব্রাহিম আর মনসুর আলিকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে, তাদের মুক্তির দাবিতে। কিন্তু পুলিশ মিটিং বসতে দিল না। দুপুর থেকেই ১৪৪ ধারা জারি করল। বিকেলে হরিপদদাকে ধরে নিয়ে গেল। তমাল-অশোকের খোঁজে শিখাদের বাড়িটা আরো একবার সার্চ করল।

কিন্তু এই পুলিশী-জুলুম এবার কেউ মুখ বুজে সহ্য করল না। সারা অঞ্চলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বন্দীমুক্তির দাবিতে

স্কুল-কলেজে ধর্মঘট হ'ল। খাদ্যের দাবিতে গ্রাম থেকে কৃষকসমিতির মিছিল এল। গ্লাস-ফ্যাক্টরির ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহালের জন্য একদিন কাজ বন্ধ থাকল। বেতনবৃদ্ধির দাবিতে বাসকর্মীরা মণিশঙ্করের সমস্ত বাসের চাকা চব্বিশঘণ্টা অচল করে রাখল। কলেজের নির্বাচনে এই প্রথম ওরা হেরে গেল। সুকুমারের নেতৃত্বে এক বিশাল বিজয়ী মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করল। মাস দুই আটকে রেখে পুলিশ হরিপদদাকে ছেড়ে দিল।

একদিন কলকাতা থেকে ফিরে দাদা বলল, 'জানিস, আজ তমালের সঙ্গে দেখা হ'ল।'

আমার বুক দুলে উঠল, নিশ্বাস বন্ধ করে বললাম, 'কোথায় ?'

দাদা বলল, 'প্রেসে। ও-ও ইস্তাহার নিতে এসেছিল।'

'আর কে ছিল ?'

'অশোক ছিল না। মোহিতবাবু ছিলেন। তোদের কলেজে পড়াতেন।'

'হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলি না, তোর বন্ধু এখন কোথায় থাকে ?'

'না।'

'কেন করলি না ?'

'কি লাভ! ওদের থাকা-খাওয়ার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে ?'

'তবু তো—'

'না নন্দি, পার্টি-কমরেডদের আণ্ডারগ্রাউণ্ড জীবন নিয়ে এত কৌতূহল ভাল না। আর আমি জিজ্ঞেস করলেও ও হয়ত বলত না!'

কোথায় একটা ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেলাম। যেন পুরনো ব্যথায় হাত পড়ল। মুহূর্তের জন্য তমালের রোদে-পোড়া তামাটে মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই ঠিকানাহীন ছন্নছাড়া নিষিদ্ধ জগতের মানুষটা! যাকে আমি হয়ত ভালবাসতে চেয়েছিলাম কিংবা ভালবাসতে চাইনি। শুধু অসম্ভব কৌতূহলের আকর্ষণ নিয়ে কাছাকাছি গিয়েছিলাম,

চোখে চোখ রেখেছিলাম, হাত থেকে হাতের স্পর্শ নিয়ে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিলাম!

এই আকর্ষণটাই ভালবাসা কিনা আমি যদি পরিস্কার করে বোঝাতে পারতাম! যদি নিজে বুঝতাম! আমি এখনো মনে মনে ভালবাসার ঘর নির্মাণের জন্য একটা শক্ত মজবুত ডাল কি খুঁজে বেড়াই —যে ডাল ঝড়ে ভাঙবে না, জলে ভিজবে না? আমি এখনো কি পায়ে আলতার ছাপ কপালে সিঁদুর নিয়ে সেই নৌকায় উঠতে চাই— যার হালপাল দড়িদড়া সব ঠিক আছে? তমালের কাছে আশ্রয়ের সেই নিরাপত্তাটুকু নেই বলেই কি আমি বারবার কাছে গিয়েও ফিরে ফিরে আসি? এই জন্যই কি তার হাতের ছোঁয়ায়, শরীরের গন্ধে আমার বুক সবসময় আশঙ্কায় থরো থরো কাঁপতে থাকে? যদি তাই হবে, ওকে নিয়ে আমার যদি এত ভয়, এত আশঙ্কাই সত্য হবে, তবে আজ আমি সংগঠনের কাজে নামলাম কেন? এখানে ভয় তো প্রতি পদে, বিপদ তো অনেক বেশী!....বাঁচার তাগিদে এসেছি? মুক্তির তাগিদে? তাহ'লে তমাল কি উপলক্ষ মাত্র?

কিন্তু ওই রোদে-পোড়া তামাটে মুখটা মনে পড়লে বুকের ভাঁজে ভাঁজে কেন রক্তপাত হয়? সমস্ত চেতনায় কেন বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে?

এই বিষণ্ণ রক্তপাতের নামই কি ভালবাসা?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঝড় উঠল আবার।

সে বড় ভয়ানক, প্রমত্ত ঝড়।

সেই ঝড়ের দাপটে বাংলাদেশের অন্তরাত্মা ক্রুদ্ধ আবেগে ফুলে-ফেঁপে ফুঁসে উঠল। আগুন জ্বলল বসিরহাট স্বরূপনগর থেকে। মানুষের ক্ষুধার আগুন, ঘৃণার আগুন, ক্রোধের আগুন। বুলেটবিদ্ধ নুরুল ইসলাম আর আনন্দ হাইতের বুক থেকে সেই আগুন দেখতে

দেখতে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। ট্রেনের চাকা বন্ধ হ'ল, স্কুল-কলেজ ছুটি হয়ে গেল, কলেকারখানায় তালা পড়ল। আগুনের দাউ দাউ শিখায় ট্রাম-বাস পুড়ে গেল, দুধের ডিপো জ্বলে গেল, সরকারি অফিস-আদালতের কাগজপত্র ছাই হ'ল।

শুধু পুলিশ দিয়ে সে আগুন ঠেকানো গেল না। কলকাতা, হাওড়া, কৃষ্ণনগরে মিলিটারি নামল। কার্ফু জারি করে দেখামাত্র গুলির আদেশ হ'ল। বিপর্যস্ত সরকারি শাসনযন্ত্র মধ্যযুগের বর্বর বর্গীদের মত ক্ষুধার্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিনের পর দিন কলকাতার রাজপথ রক্তে লাল হতে লাগল।

প্রতিরোধও শুরু হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। যত আক্রমণ তত প্রতিরোধ। ব্যারিকেড হাতে হাতে, পথে পথে, রাজপথে, অলিতে গলিতে। আর এখানে ওখানে সর্বত্র লড়াই, সর্বত্র প্রতি-আক্রমণ। যত মিলিটারি, যত গুলি, যত রক্তপাত, তত আগুন, তত লড়াই, তত ব্যারিকেড। দেখতে দেখতে সমস্ত বাংলা যুদ্ধের সাজে সেজে উঠল।

এই অঞ্চলও বাদ গেল না।

শ্রমিক-কৃষক-সাধারণমানুষের ঘৃণার আগুনে ডাকঘর পুড়ে গেল। এস. ডি. ও'র অফিস তছনছ হ'ল, থানা পুলিশ আক্রান্ত হ'ল। মণিশঙ্কর অধর হালদারদের বাড়ীর চারদিকে পুলিশ পাহারা বসে গেল। আমাদের পার্টিঅফিস একদিন যারা ভেঙেছিল, ছবি পুড়িয়েছিল—সাধারণমানুষ তাদের সবকটা অফিসে আগুন দিয়ে উৎসব করল। জয়শঙ্করেরা ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখার সাহসটুকু পর্যন্ত পেল না!

দাদা এল একদিন ছুটতে ছুটতে, 'নন্দি, শীগ্‌গির জল দে! চোখ জ্বলে গেল!'

বললাম, 'কি হ'ল চোখে?'

দাদা বলল, 'আজ খুব টীয়ারগ্যাস ছুঁড়েছে পুলিশ। লাঠিও চালিয়েছে।'

'সেকি!'

'হ্যাঁ, অবিনাশের মাথা ফেটে গেছে। হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—'

'আর কি হয়েছে?'

'বলছি, বলছি। আগে জল দে—'

একটুপরেই শিখা এল ছুটতে ছুটতে। বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কালকের মিছিলে আমরাও যাব। মহিলা-সমিতির সব মেয়েরা। চলো, বাড়ী বাড়ী ঘুরতে হবে।'

সন্ধ্যার পরে পার্টিঅফিস থেকে মাইক বেরুল।

বাস-ইউনিয়নের সম্পাদক বৃন্দাবন থমথমে ভরাট গলায় ডাক দিল সবাইকে, 'যে যেখানে আছেন, আগামীকালের মিছিলে যোগ দিন। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের উপর পুলিশের লাঠি চালনার গুলি চালনার প্রতিবাদ করুন। নুরুল ইসলাম আনন্দ হাইতের রক্ত ব্যর্থ হতে দেবেন না। শহীদের নামে শপথ নিন, ঘোষণা করুন, এ লড়াই বাঁচার লড়াই—এ লড়াই জিততে হবে।'

এ লড়াই বাঁচার লড়াই—এ লড়াই জিততে হবে।

কলকারখানা বন্ধ রেখে ছুটে এল শ্রমিকরা। গ্রামগ্রামান্তর থেকে ছুটে এল কৃষক মিছিল। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করে ছাত্রছাত্রীরাও ছুটে এল। শহরের বড় রাস্তা মানুষে মানুষে ভরে গেল। মিছিলের কোথায় শুরু কোথায় শেষ বোঝা যায় না।

খাদ্যের দাবিতে, বন্দীমুক্তির দাবিতে শ্লোগান উঠছে ঘন ঘন। দুপুরের খর-রৌদ্রে ঝলমল করছে লাল নিশান। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ে মিছিলের সামনের দিকটা ঢেকে যাচ্ছে।

শিখা কোথায় ছিটকে পড়েছে দেখতে পাচ্ছি না। ওই যে মন্দিরাকে দেখা যাচ্ছে। পাশে অবিনাশের বউদি। ওই ভরাট গলাটা কার? হরিপদদার কি?

কমরেড্‌, জোরে চলুন—

কমরেড্‌, লাইন ভাঙবেন না—

কমরেড্‌, বলুন, এ লড়াই—

আমার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। আবেগে চোখ ফেটে জল আসছে। এত মানুষ! এত মানুষ আছে আমাদের দিকে! এতদিন কোথায় ছিল ওরা! যেদিন শয়তানেরা জগৎদার মাথা ফাটিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল, সেদিন কোথায় ছিল! যেদিন তমালকে খুন করবে বলে ছুরি টেনে বের করেছিল, সেদিন কোথায় ছিল!

ইস্—এই মিছিলে আজ যদি তমাল থাকত! অশোক থাকত, সুব্রত থাকত! এই শহরে এমন মিছিল ওরা যে জীবনে দেখে নি!

হ্যাঁ। আমরা খাদ্য চাই। সস্তাদরে চাল চাই, ডাল চাই, তেল চাই, কাপড় চাই।

আমরা আমাদের প্রিয়বন্ধুদের মুক্তি চাই।

আমরা জগৎবল্লভকে ছিনিয়ে আনতে চাই। সুব্রত, সমীর, একবাল, ইব্রাহিম, মনসুর আলির মুক্তি চাই। অশোক-তমালের উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রত্যাহার চাই।

চাই, চাই, চাই!

না দিলে আমরা তোমাদের শাসনযন্ত্রের চাকা অচল করে দেব। তোমাদের সবকিছু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব। দেখছ না, আমরা আর একা নই? আমরা অনেক মানুষ—

পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মিছিলটা থমকে দাঁড়াল। সামনের দিকে কি ঘটছে স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। হঠাৎ সমস্ত মানুষ আরো তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে শ্লোগান দিয়ে উঠল। তারপর লাইন ভেঙ্গে একটা ত্রস্ত ব্যাকুল ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল।

আমি কোর্টের দিক থেকে অনেকগুলো শব্দ শুনলাম। বাতাসে উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে এল। আমার চোখ জ্বালা করে উঠল।

একটুপরেই মনে হ'ল ওই কোর্টের কাছটায় খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে গেছে ক্রুদ্ধমানুষেরা চারদিক থেকে ইঁট ছুঁড়তে শুরু করেছে। পুলিশ সম্ভবত লাঠি চার্জ করছে। সেই তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধটা আরো বেশী করে ভেসে আসছে!

আমার সমস্ত উত্তেজনা সহসা থিতিয়ে গিয়ে কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। দাদার কথাই সবার আগে মনে পড়ল। ও তো আছে সামনের দিকে। যদি গুলি চালায় পুলিশ? ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। ভয়ে ভাবনায় মুখ কালো হয়ে গেল। আমি মন্দিরাকে ডেকে কিছু বলতে চাইলাম। এমনসময় শিখা এল ছুটতে ছুটতে, 'পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে, এখুনি ফায়ারিং হবে।'

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম, 'শিখা, দাদাকে দেখেছ?'

শিখা হাত ছাড়িয়ে নিল। আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মেয়েরা আর এখানে থাকবেন না। ওই মিউনিসিপ্যাল অফিসটার পেছনে চলে যান। খুব তাড়াতাড়ি যান—'

অবিনাশের বউদি এসে আমার হাত ধরে টানল। আমরা খুব দ্রুত ওইদিকে এগিয়ে গেলাম। শিখা আবার সামনের দিকে ছুটে গেল।

মিউনিসিপ্যাল অফিসের পেছনে যে-রাস্তাটা একটু বেঁকে হাস-পাতালের দিকে গেছে তার মোড়ে সদাশিব ডাক্তারের ডিসপেন্সারি। আমরা ওখানে যেতেই নজরে পড়ল, সদাশিববাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে বকে যাচ্ছেন। তাঁর চারদিকে রোগীরা ভিড় করে আছে। সকলের মুখেই উৎকণ্ঠার ছাপ। মাঝে মাঝে টিয়ার গ্যাসের শেল্ ফাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সবাই চমকে উঠছি। ডাক্তারবাবুও কথা থামিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকছেন। তারপর আবার উত্তেজিত গলায় রোগীদের কি বোঝাতে চাইছেন।

কয়েক মিনিটও পার হ'ল না, একসঙ্গে আরো কিছু লোক গলির

দিকে দৌড়ে এল। তার একটুপরেই হিমানীশ আর সুকুমার। ওরা ধরাধরি করে একটি কিশোরের দেহ বয়ে আনছে। তার গায়ের ঘন কালোরঙ দেখেই বুঝলাম—সাহেব! সাহেবের নাক-মুখ-মাথা দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হিমানীশের সার্ট প্যাণ্ট রক্তে ভিজে গেছে। ফোঁটায় ফোঁটায় টাটকা রক্ত রাস্তার ধুলোবালিতে পড়তে পড়তে আসছে। সাহেবের কোনো জ্ঞান নেই।

আমাদের সামনে আসামাত্র সেই রক্তমাখা বীভৎস মুখটার দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই শিউরে উঠলাম।

সদাশিব-ডাক্তার ওই বুড়োবয়সেও ভারি শরীরটা নিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। তারপর অসম্ভব জোরে চিৎকার করে বললেন, 'কে মারল? এই বাচ্চাটাকে কে মারল এমন করে?'

সুকুমাররা একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে আগুনের মত গনগনে দৃষ্টি মেলে সদাশিবের মুখ দেখল। তারপর তীব্র শ্লেষের সঙ্গে হিমানীশ বলে উঠল, 'আপনি যাদের হয়ে ভোট করেন, সেই মণিশঙ্করদের গান্ধীবাদী পুলিশ—'

ডাক্তারের গৌরবর্ণ মুখখানায় কে যেন কালি ঢেলে দিল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আমরা স্পষ্ট দেখলাম, কিছু একটা বলার চেষ্টায় তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, কিন্তু কথা বেরোচ্ছে না।

কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই ঝুঁকে পড়লেন তিনি। দুই হাতে সাহেবের মাথাটা ধরে কি যেন দেখলেন। তারপর হাত ধরে নাড়ী দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'মাথা সেলাই করতে হবে। আমি পারব না। শীগগির হাসপাতালে নিয়ে যা—'

'সেইখানেই তো যাচ্ছি,' বলতে বলতে হিমানীশ ও সুকুমার সাহেবকে নিয়ে একটা রিক্সার দিকে ছুটে গেল। সদাশিব-ডাক্তার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে দু'হাত মেলে ধরলেন। সাহেবের মাথার রক্তে তাঁর হাত ভিজে উঠেছে। রুদ্ধবাক্ হয়ে একদৃষ্টে তিনি সেই রক্তের ছাপ দেখতে লাগলেন।

ক্রুদ্ধ জনতা সেইদিনই কোর্ট কাছারির কাগজ-পত্রে আগুন ধরিয়ে দিল। মণিশঙ্করের একটা বাস জ্বালিয়ে দিল। পুলিশের লা আরো অনেকের হাত পা ভাঙল, মাথা ফাটল। এই শহরের উপর অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেল।

পরেরদিন সন্ধ্যার মুখে কলকাতা থেকে কি একটা খবর এল।

দাদা একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। আমি কিছু বুঝলাম না। কিন্তু ঘরেও থাকা গেল না। শিখা কিছু জানতে পারে ভেবে ওদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম।

বাইরের ঘরটায় জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল শিখা।

আমি ঘরে ঢুকলাম। ওর কাছে গেলাম। তবু চোখ ফেরাল না। ওর পিঠে হাত রাখতেই প্রবলভাবে চমকে উঠল। আমি ওর মুখ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভয়ঙ্কর শক্ত ঠাণ্ডা মুখ। চোখের পাতাদুটোও বরফে চাপা থেকে যেন ভারি আর শক্ত হয়ে গেছে। দেখে আমার বুকটাও অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

এই কি সেই শিখা যে গতকালও মহিলা সমিতির মিছিল পরিচালনা করেছে? পুলিশ লাঠিচার্জ করছে জেনেও দুরন্ত সাহসে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে? আমার মুখে আতঙ্ক ও স্বার্থপরতার ছায়া দেখে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তীব্রভাবে তাকিয়েছে?

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'শিখা, কি হয়েছে? সবাই এমন ছুটোছুটি করছে কেন?'

খুব স্তিমিত নিরুত্তাপ গলায় শিখা বলল, 'ঠিক জানি না। হয় অশোক না-হয় তমালদা পুলিশের গুলি খেয়েছে।'

'গুলি! কি বলছ শিখা?'

'হ্যাঁ। শহরে গুজব ছড়িয়েছে, গুলি করে পুলিশ ওদের একজনকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেছে।'

'কে বলল ? কে দেখেছে ? কাকে তুলে নিয়ে গেছে ?'

'আর কিছু জানি না। খবর আনতে হরিপদদা কলকাতা গেছেন।'

'তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? চল হরিপদদার বাড়ী যাই—'

দু'জনেই ছাইয়ের মত বিবর্ণ মুখে হরিপদদার বাসার দিকে চললাম। আমরা কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিলাম না। দ্রুততালে হাঁটার সময় আমাদের পা টলছিল। শরীরটা ভারি ঠেকছিল। সন্ধ্যার অস্বচ্ছ অন্ধকারে কাঁচা রাস্তায় বারবার হোঁচট খাচ্ছিলাম।

আমার মন বলছিল, আর কেউ নয় তমালই বিদ্ধ হয়েছে গুলিতে। হয় আহত না হয় নিহত। আর আহত হ'লেই বা বাঁচার সম্ভাবনা কতটুকু ? ওই রক্তাক্ত শরীরটাকে গাড়ীতে টেনে তুলবে পুলিশ। চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে না। এক ফোঁটা তৃষ্ণার জলও দেবে না। মরে গেলে কোথাও নিয়ে টান মেরে ফেলে দেবে। এমন তো হামেশাই করে। 'ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কত হিংস্র—গতকাল সাহেবের রক্তাক্ত মুখটাই তো তা বুঝিয়ে দিয়েছে। এখনও জ্ঞান ফেরে নি ওর। হয়ত মরেই যাবে। ভাবতে ভাবতে আমি শিউরে উঠছিলাম। আমার সমস্ত শরীর বরফ হয়ে মাটির সঙ্গে জমে যাচ্ছিল। হরিপদদার বাসাটাকে কতদূর মনে হচ্ছিল। শিখার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম, ও-ও ঠিক এমনি করেই অশোকের কথা ভাবছিল। ওর বুকেও এমনি ঝড় বইছিল।

নিঃশব্দে হরিপদদার বাসায় পৌঁছলাম। বৌদি আমাদের মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করলেন। তমাল-অশোকের খবর শুনে শিউরে উঠলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'অত ভাবছ কেন তোমরা ? আজকাল অনেকরকম গুজব ছড়ায়। যা শুনেছ সত্যি না-ও হতে পারে। একটু বসো। উনি যখন কলকাতা গেছেন, ঠিক খবরই আনবেন।'

আমরা ঘরে গিয়ে বসতে বৌদি এগিয়ে এসে অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখ দেখলেন। নিঃসন্তান প্রৌঢ় বৌদির দৃষ্টিতে অসম্ভব উৎকণ্ঠার সঙ্গে গভীর মমতার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি আমার হাতটা ধরে আস্তে আস্তে বললেন, 'শিখার খবর তো জানি। নন্দিতা, মনে হচ্ছে তমালকে খুব ভালবাস তুমি?'

শোনামাত্র, এই এতক্ষণ পরে, আমার সমস্ত অবরুদ্ধ আবেগের উৎসমুখ যেন খুলে গেল। সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। সমস্ত লাজলজ্জা ভুলে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। কাঁদতে কাঁদতেই অসুস্থের মত চেঁচিয়ে বললাম, 'না, বৌদি, না! এসব মানুষকে ভালবেসে আমি কি করব!'

শিখা চমকে আমার দিকে তাকাল। আজ আমি ওর কাছেও ধরা পড়ে গেলাম। বৌদি আমার হাতটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে খুব নরম গলায় বললেন, 'ছিঃ নন্দিতা, কাঁদছ কেন? ভালবাসলে তো এসব মানুষকেই ভালবাসতে হয়। এরা বাঁচলে বাঁচার মত বাঁচে। আবার যখন মরে তখন মরেও বেঁচে থাকে। এদের ভালবাসলে ভালবাসা কোনোদিন মরে না নন্দিতা।'

বৌদির গলার সেই গাঢ় গভীর সুরে কি ছিল জানি না—আমি মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম বৌদির চোখ ছল ছল করছে। শিখার চোখে মুখে সেই শ্বাসরুদ্ধ শীতলতার পরিবর্তে নরম কোমল উজ্জ্বলতা। যেন লুপ্ত শ্রী-সাহস ফিরে পাচ্ছে ও। মুখখানা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই দ্রুত বর্ণ-পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে এতদিন পরে যেন একটা পুরনো প্রশ্নের উত্তর পেলাম। অনেকবার জিজ্ঞেস করতে গিয়েও যা জিজ্ঞেস করতে পারিনি, সেই প্রশ্ন—কি দেখে কি বুঝে অশোককে ভালবাসে শিখা। আজ কিছুক্ষণের জন্য সেই বিশ্বাস বুঝি হারিয়ে ফেলেছিল। বৌদি মনে করিয়ে দিতে আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে শিখা।

কিন্তু আমি আমার শক্তি সাহস তেমন করে ফিরে পাচ্ছি না কেন?

হরিপদদা না ফেরা পর্যন্ত আমরা ও-বাড়ীতে থাকলাম। আমাদের অন্যমনস্ক করার জন্য বৌদি নানারকম কথা বলতে লাগলেন। হরিপদদার কথা, তাঁর প্রথম জীবনের কথা।

বিয়ের আসরে পনের টাকা নিয়ে গোলমাল। হাতে পায়ে ধরে কিছুতেই রাখা গেল না বরকর্তাদের। আসর থেকে বর উঠিয়ে নিয়ে গেল। বৌদির বাবা চোখে অন্ধকার দেখলেন। মা একটা পিঁড়ি নিয়ে দুম দুম করে কপালে ঠুকতে লাগলেন। ঠাকুমার কান্নায় পাড়া মাথায় উঠল। এইসময় হরিপদদা এসে বিয়ের প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু জাতে মিল হয় না। আত্মীয়-স্বজন বেঁকে বসল। সমাজের মুরুব্বিরা আপত্তি করল। বাবা চিৎকার করে বললেন, 'তোমাদের জাতের মাথায় ঝাঁটা মারি। তোমাদের সমাজের মুখে লাথি মারি। এই ছেলের সঙ্গে এই লগ্নেই বিয়ে হবে চারুর। পুরুৎ যদি মন্ত্র না পড়ায়, আমি ব্রাহ্মণ, আমিই বই দেখে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দেব ওদের—'

বৌদি বলছিলেন। পুরনো কথা। এ-বাড়ীতে যারা এসেছে তারাই শুনেছে এসব। আমাদেরও অজানা নেই। তবু বৌদি যখন বলেন, প্রত্যেকবারই নতুন কাহিনী বলে মনে হয়। হরিপদদার প্রতি গভীর ভালবাসায় বৌদির প্রৌঢ় মুখ টলটল করে। মনে হয় ভালবাসার একটি গভীর শান্ত দীঘির পাশে আমরা ক্লান্তি জুড়াতে এসেছি।

শেষপর্যন্ত হরিপদদা এলেন।

রাত তখন দশটার কাছাকাছি। হরিপদদার সঙ্গে দাদা। ঘরে ঢুকে দাদা বলল, 'এই যে, তোরা এখানে। আমরা ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আমি আর শিখা নিঃশব্দে তাকালাম।

হরিপদদা সে দৃষ্টির অর্থ বুঝলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'না, কেউ ধরা পড়েনি। তবে তমালের পিঠে গুলি লেগেছে। কমরেড্‌রা ওকে প্রাইভেট নার্সিং হোমে নিয়ে গেছে।'

একটু থেমে আমাদের মুখ দেখে আবার বললেন, 'রাস্তায় মিলিটারি নামিয়েছে আজ। কলকাতা-হাওড়ায় সবশুদ্ধ্ ষোলজন মারা গেছে। অধিকাংশই গ্রামের মানুষ। খাদ্যের দাবিতে শহরে মিছিল করে এসেছিল। অহিংস সরকার খাদ্যের বদলে তাদের গুলি দিয়েছে। সেই গুলি তমালকেও—'

হরিপদদার কথা শেষ হ'ল না। তার আগেই জোরে ব্রেক কষে সাইকেল থামার শব্দ হ'ল। বাইরে থেকে হিমানীশ অস্থির গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'হরিপদদা, শীগ্‌গির আসুন। হাসপাতালে যেতে হবে। সাহেব মারা গেছে—'

গঙ্গা-তীরবর্তী শ্মশানে, একদিন যেখানে সাহেবকে পোড়ানো হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গায় তমালকেও পোড়ানো হ'ল। সাহেব এই শহরের প্রথম শহীদ—সে হিসাবে তমাল দ্বিতীয়। শ্মশানে দাঁড়িয়ে সাহেবের কথা আমাদের প্রত্যেকেরই মনে পড়ছিল।

সেদিন আমরা পুলিশ-মিলিটারির হাত থেকে সাহেবকে বাঁচাতে পারিনি। আজ আমরা সতর্ক ও প্রস্তুত থেকেও ঘাতকের হাত থেকে তমালকে বাঁচাতে পারলাম না। মণিশঙ্কর-জয়শঙ্করদের আক্রমণ বড় ভয়ানক। পুলিশ-মিলিটারির পাশাপাশি আজ ওরা গুপ্তহত্যার পথও বেছে নিয়েছে। এই চক্রান্তের কাছে আমরা সজাগ থেকেও পরাস্ত হ'লাম।

আমাদের স্বেচ্ছাবাহিনী দু'পাশে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করল। জগৎবল্লভবাবু মুষ্টিবদ্ধ হাত কাঁধের উপর তুললেন। বৃদ্ধ সদাশিব ঘাটের উঁচু সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত চিতা-সজ্জার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রায় হাজার মানুষ সমস্ত শ্মশান প্রকম্পিত করে তাদের প্রিয় কমরেড্‌কে শেষ 'লালসেলাম' জানাল।

শিখা আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখল। চিতায় আগুন দেওয়া হ'ল। মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য আগুন ছড়াতে লাগল। আর স্বেচ্ছাবাহিনীর অধিনায়ক অশোকের চোখ আগুনের মত জ্বলতে লাগল।

আমরা কেউ কাঁদলাম না। একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেললাম না।

মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে স্বেচ্ছাবাহিনীর তীক্ষ্ণধার বর্শাফলক কেমন ঝক্‌মক্ করছে একদৃষ্টে তাই দেখতে লাগলাম। সেই উদ্যত আগ্নেয় বর্শামুখ যেন আমাদের ডাক দিয়ে বলছিল, 'কমরেডস্, তৈরি হও! সামনেই লড়াই—'

আমরা রক্তের ভেতর সেই ডাক শুনছিলাম

[কমরেড্ জগৎবল্লভ]

একটু আগেই শ্মশান থেকে ফিরলাম। তমালের সমস্ত শরীরটা পুড়ে ছাই না-হওয়া পর্যন্ত আমরা সবাই শ্মশানে ছিলাম। এখন বেলা প্রায় চারটে। গ্রীষ্মের সূর্য পশ্চিম আকাশে জ্বল্ জ্বল্ করছে। বাতাস এখনও গরম হয়ে আছে।

এই অঞ্চলে আজ হরতাল। নিঃশব্দ সক্ষুব্ধ সর্বাত্মক হরতাল।

এই হরতাল আমাদের ডাকতে হয়নি। কোথাও পোস্টার মারতে হয়নি। পার্টির মাইক বের করে প্রচার করতে হয়নি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্ট্রীট-কর্ণার, কলেকারখানায় গেট্-মিটিং—এসব কিছুরই দরকার পড়েনি।

তবু হরতাল। নিঃশব্দ নিচ্ছিদ্র হরতাল। এমন ঘন নিবিড়, এমন উত্তেজিত উন্মথিত, এমন করুণ শোকাচ্ছন্ন হরতাল এই শহরে আগে কোনোদিন হয়নি।

আমি সারাপথ দেখতে দেখতে এসেছি।

মণিশঙ্কর চৌধুরীর ময়দাকল আর গ্লাস-ফ্যাক্টরির লোহার দরজা তালাবন্ধ। বাসগুলো কিছু গ্যারেজে কিছু কোর্টের বটতলায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। রিক্সার চাকা অচল। দোকানপাট বন্ধ। সরকারি অফিস-আদালতের দরজা খোলার লোক নেই। ইউনিয়ন-অফিসগুলোর মাথায় রক্তপতাকা অর্ধনমিত। পার্টিঅফিসের পতাকাও।

ফেরার পথে রাস্তায় তেমন লোকচলাচল দেখিনি। শুধু এখানে-ওখানে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, অজস্র রাইফেলধারী পুলিশ। তারা

এখানকার নয়—কেন্দ্র থেকে আমদানি করা। হয়ত সদরে মজুত ছিল। কাল রাতে কিংবা ভোরের দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। হয়ত মণিশঙ্করের নির্দেশেই থানার বড়বাবু এই ব্যবস্থা করেছেন। রাষ্ট্রপতির শাসনে মণিশঙ্করবাবুদের লুপ্ত ক্ষমতা ফিরে এসেছে। প্রয়োজনে আরো পুলিশ তিনি আনাতে পারেন।

ওরা মণিশঙ্করের বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। অধর হালদার, গৌর চাটুজ্যেদের বাড়ীও। ওদের কলকারখানা, সিমেণ্ট-লোহা-ধান-গুদামের সামনেও সি-আর-পি মোতায়েন আছে। তাছাড়া রাইফেল উঁচিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে নোয়াপাড়া-ফুলতলির শ্রমিকবস্তীগুলোর উপর। দৃষ্টি রেখেছে সুভাষকলোনী আর বাগ্দীপাড়ার দিকে। ছাত্রদের হোস্টেলগুলোর উপরও কড়া নজর রেখেছে।

কিন্তু না। এখুনি কোনো গণ্ডগোলের আশঙ্কা করছি না। সে একটা সম্ভাবনা ছিল কাল রাত্রে। তমালের খুন হওয়ার খবরটা সারা শহরে যখন ছড়িয়ে পড়ল তখুনি। কিন্তু অনেক কষ্টে সে-অবস্থা আমরা সামলে নিয়েছি।

তখন রাত বারোটার কাছাকাছি। হাটবাজার দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। আমি আর কমরেড্ হরিপদ সাইকেলে করে নোয়াপাড়া থেকে ফিরে আসছিলাম। মুচিপাড়া ডানদিকে রেখে সুভাষকলোনীতে ঢুকবার মুখে কেমন গোলমাল শুনলাম। একটা চাপা ক্রুদ্ধ গোঙানির মত। নদীর জল বেড়ে বন্যা আসার আগে যেমন হয়। আমরা দু'জনেই চমকে উঠে পরস্পরের মুখ দেখলাম।

হরিপদ বললেন, 'মনে হচ্ছে নাইট-শো সিনেমা ভাঙ্গল। কিন্তু হল্লাটা যেন বেশী।'

আমি বললাম, 'না কমরেড্, সিনেমা ভাঙ্গার গোলমাল না এটা। অন্য কিছু হয়েছে।'

সুভাষকলোনীতে ঢুকে দেখলাম কেউ কেউ ব্যস্তভাবে ছুটে যাচ্ছে। বাড়ীঘরের দরজাজানালা খুলে যাচ্ছে। আলোগুলো জ্বলে উঠছে।

সেই চিৎকারটা যেন আরো প্রবল হয়ে উঠছে। তারপর ঘূর্ণিঝড়ের মত গড়িয়ে গড়িয়ে ফুলতলির দিকে চলে যাচ্ছে। আমি খুব মনোযোগে কান পাতলাম। শব্দের স্বরূপ ও গতিপথ বুঝতে চাইলাম। তারপরই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। হ্যাঁ কমরেড্, আমার চল্লিশবছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমাকে অনেককিছু শিখিয়েছে। দূরবর্তী মিছিলের গলার শব্দ, পায়ের শব্দ আমি চিনি। আমি বুঝতে পারি, কোন্‌টা কি অর্থ বহন করে।

আমি হরিপদকে বললাম, 'কোথাও কিছু একটা সংঘর্ষ ঘটেছে। ওই মানুষগুলো আমাদের।'

আর একটু এগিয়ে আমরা সামনে দিয়ে একজনকে ছুটে যেতে দেখলাম। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'কমরেড্, কমরেড্, শুনুন—'

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা চিনতে পারলাম। স্কুলের অবিনাশ। বললাম, 'কি হয়েছে অবিনাশ? ছুটছ কেন?'

একমুহূর্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ উত্তেজিতভাবে বলল, 'জগৎদা! আপনি এখনো শোনেননি? তমালকে ওরা ছুরি মেরেছে।'

'ছুরি মেরেছে! তমালকে! কোথায়? কোথায় ওরা?'—আমরা দু'জনেই একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাস অস্থিরতায় চেঁচিয়ে উঠলাম। অবিনাশ বলল, 'ঠিক জানি না। দেখছি—'

বলেই ও আবার দ্রুতবেগে ছুটে গেল।

আমি হরিপদকে বললাম, 'শীগ্‌গির পার্টিঅফিসে চলুন। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

দু'জনেই যথাসম্ভব জোরে সাইকেল চালানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটুপরে তার উপায় থাকল না। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর লোক দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে রাস্তায় নামছিল। তারপর সেই অদৃশ্য চিৎকারটা লক্ষ করে ছুটে যাচ্ছিল।

আমাদের দেখে অনেকে থমকে দাঁড়াল। আমরা কোনো খবর জানি না শুনে আবার ছুটে গেল। একটা মোড়ের কাছে পৌঁছতে

একা একা একজন মেয়েকে ছুটতে দেখলাম। হরিপদ চিনতে পেরে বললেন, 'শিখা—'

আমি ডাকলাম, 'শিখা, শোন—'

শিখা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল। লাইট-পোস্টের আলোতে আমি ওর চোখমুখ দেখে চিন্তিত হলাম।

শিখা উত্তেজিতভাবে বলল, 'জগৎদা! তমালদাকে ওরা খুন করেছে!'

আমি বললাম, 'কি হয়েছে এখনো জানিনা। কিন্তু তুমি একলা ও-ভাবে ছুটে যেও না।'

হরিপদকে বললাম, 'কমরেড্, আপনি ওকে নিয়ে পার্টিঅফিসে যান। আমি ও-দিকটা দেখে যাচ্ছি।'

আমি জানতাম শিখা তমালকে ভালবাসে। নিজের দাদা সমীরের চেয়েও বেশী ভালবাসে। কিন্তু এই অন্ধকার মধ্যরাত্রে শিখার কোথাও ছুটে যাওয়া উচিত নয়। সত্যি সত্যি ওদিকে কি ঘটেছে, কারা তমালকে আক্রমণ করেছে, কি উদ্দেশ্যে করেছে, ওরা দলে কতজন, কি পরিমাণ সশস্ত্র, বলতে গেলে কিছুই এখনো জানি না। এই অবস্থায় শিখা, তা ও যত সাহসী ডানপিটে মেয়েই হোক, একা একা ছুটে গেলে ভীড়ে-গোলমালে আবার নতুন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। পার্টি-অফিসে থাকলেই ও সব খবর পাবে। হরিপদর হাতে ওকে ছেড়ে দিয়ে আমি আবার সাইকেল চালানোর চেষ্টা করলাম।

তারপর কয়েকমিনিট পার না হতে সমস্ত শহর জেগে উঠল। এলোমেলো চিৎকারগুলো ঘন হয়ে দ্রুততাল শ্লোগানের রূপ নিল। হাজার মানুষের পায়ের শব্দে রাত্রির আকাশ কাঁপতে লাগল। এখানে-ওখানে মশাল জ্বলে উঠল। তারপর মশালগুলো তীরবেগে একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটতে লাগল। আমি কোর্টের কাছাকাছি এসে শুনলাম, কমরেড্রা তমালের দেহ হাসপাতালে বয়ে আনছে।

শেষরাত্রে হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ সরানোর অনুমতি দিল পুলিশ। ওইটুকু সময়ের মধ্যে পোস্টমর্টেম হ'ল। ডাক্তারি-রিপোর্ট তৈরি হ'ল। আমরা শুনলাম রিভলবারের গুলি দিয়ে তমালকে হত্যা করা হয়েছে।

'কে সেই হত্যাকারী ?' অনেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

থানার ও-সি সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বলতে গেল, 'নিশ্চয়ই কোনো এন্টিসোস্যাল....'

সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণগলায় কে যেন ধমকে উঠল, 'ন্যাকা! মণিশঙ্কর-জয়শঙ্করদের বাড়ীটা চেনো না ? মাস গেলে কত মাসোহারা পাও ওখান থেকে ?'

পাশাপাশি আরো একটা গলা, 'চামড়া খুলে নেবার আগে সরে পড় দেখি চাঁদ !'

তারপর অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে, 'হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করো, এখুনি করো, জলদি করো।'

এখুনি পুলিশের সঙ্গে উত্তেজিত জনতার সংঘর্ষ বেঁধে যায় আশঙ্কায় আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ও-সিকে একপাশে সরিয়ে দিলাম। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, 'কমরেড্ শান্ত হোন। তমালকে পার্টিঅফিসে নিয়ে চলুন। হত্যাকারী কে, আমরা জানি। পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করবে না। এদেশের আইন আদালতে ওদের বিচার হবে না। কিন্তু কমরেড্, শহীদের রক্তঋণ আমরা একদিন শোধ করবই—'

সমবেত জনতা আবার গর্জন করল, 'হ্যাঁ, বিচার চাই না, বদলা চাই।'

হাসপাতালের এদিকটা শান্ত হ'ল। কিন্তু অন্যদিকে আবার প্রবল উত্তেজনা। কলকাতার একটা দৈনিক-কাগজের স্থানীয় রিপোর্টার বঙ্কিমবাবুকে ঘিরে ধরেছে সবাই। প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, 'দালাল কোথাকার ! খবর নিয়ে কি করবি তুই ?

ছাপবি তো সেই মিথ্যে কথা! ঘরে বোমা বাঁধতে গিয়ে কেটে মরেছে! জানা আছে সব! কেটে পড় শালা....'

আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে বঙ্কিম যেন ধড়ে প্রাণ পেল। হাত তুলে করুণ গলায় বলল, 'জগৎবাবু, প্লিজ, একটু হেল্‌প্‌ করুন....'

আমি ভিড়ের মানুষদের বললাম, 'কমরেড, আমরা জানি, বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার কাজই হচ্ছে কমিউনিস্টদের কুৎসা করা। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। ওকে রিপোর্ট নিতে দিন—'

ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে আমরা তমালের দেহ পার্টিঅফিসে আনলাম। তমালের সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আপনার জায়গায়।

সুব্রতকে বললাম, 'একটা নতুন রক্তপতাকা এনে শরীরটা ঢেকে দাও।'

সুকুমারকে বললাম, 'ফুলগুলো ঠিকমত সাজিয়ে দাও।'

অশোক স্থিরদৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর চোখ বাঘের মত জ্বলছিল কিন্তু আর কোথাও কোনো উত্তেজনা ছিল না! ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'কমরেড্‌, তোমার স্বেচ্ছা-বাহিনীকে তৈরি হতে বল। তুমিই তাদের নিয়ে যাবে।'

হরিপদকে বললাম, 'আমরা ঠিক আটটায় শ্মশানে রওনা হব। আপনি ব্যবস্থা করুন, কমরেড্‌।'

সবকিছু খুব শান্ত সংযত কণ্ঠে বললাম। গলার স্বর একটুও কাঁপতে দিলাম না। মুখের কঠিনতাকে একটুও শিথিল করলাম না। যেন সমস্ত ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক আর প্রত্যাশিত, যেন এরমধ্যে আঘাত বা বেদনার কিছুই নেই—আমার মুখের রেখায় এইরকম একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে রাখতে চাইলাম। কেননা আমি জানতাম, এই মুহূর্তে আমার এতটুকু ভাবান্তর ঘটলে, ক্রুদ্ধ বিচলিত পার্টি-কমরেডদের সংযত রাখা যাবে না। আক্রমণের মূল লক্ষ থেকে আমরা হয়ত বিচ্যুত হব।

ঠিক আটটায় রক্তপতাকা ও পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত মৃতদেহ একটি ট্রাকের উপর স্থাপন করা হ'ল। উপরে থাকল শিখা ও নন্দিতা, হিমানীশ ও সুকুমার। তাছাড়া আরো অনেকেই থাকল। ট্রাকের সামনে থাকল অর্ধনমিত রক্তপতাকা ও লাঠিবর্শাসহ প্রায় তিনশ সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসৈনিক। ট্রাকের পেছন অংশে দীর্ঘ এক শোক মিছিল। পথ পরিক্রমার সময় মিছিলের কণ্ঠনির্গত বজ্রধ্বনি তমালকে শুধু ভালবাসা অর্পণ করল না, শত্রুকেও হুঁসিয়ারি দিল। সেই মিছিল মণিশঙ্করের বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল, আমার বিশ্বাস, তখন সেই রণহুঙ্কারে ওদের ত্রিতল বাড়ীর ভিৎ থর থর করে কাঁপছিল। সেই কম্পন ওরা হয়ত অনুভব করে নি। কেননা, ইতিহাসের লিখন ওরা তো সহজে পড়তে পারে না!

রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ইউনিয়ন অফিসগুলোর সামনে শববাহী ট্রাক বারবার থামাতে হচ্ছিল। পার্টির সমর্থক ও অনুরাগীরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারা ফুলের মালা তুলে দিচ্ছিল। তারপর নিজেরাও শোকমিছিলের অংশ হয়ে সংযত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শ্লোগান দিয়ে উঠছিল। এইসময় অনেকের মুখেই সাহেবের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। সাহেব এই শহরের প্রথম শহীদ। তাকেও এমনি করে রাস্তা ঘুরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিন পার্টি বড় ছিল না, সাহেবের জন্য ট্রাক যোগাড় হয়নি, ফুলের সমারোহ দেখা যায়নি। শোকমিছিলের সামনে সেদিন বর্শাধারী স্বেচ্ছাবাহিনীও ছিল না। আমরা সবাই তখন হয় জেলে না হয় পলাতক। তবু শহরের বিক্ষুব্ধ মানুষ বুকে ঘৃণার আগুন জ্বেলে এই পথ দিয়েই সেই বালকের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেছে। আকারে সে-মিছিল ছোট ছিল কিন্তু শত্রুর প্রতি ঘৃণার তীব্রতায় বোধ করি খাটো ছিল না।

মিছিলের পাশাপাশি চলতে চলতে সাহেবের মুখখানা মনে পড়ছিল। তমালকে সাহেব বড় ভালবাসত। আমাকেও।

দাহকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

কাল রাতের ছোটোখাটো দু'একটা ঘটনা ছাড়া আর কোনো সংঘর্ষ ঘটেনি। শহর এখনো শান্ত আছে।

কিন্তু আরএকটু পরে, সন্ধ্যার মুখে অবস্থা কি দাঁড়াবে অনুমান করা যাচ্ছে না। শোকের প্রথম আঘাত মানুষকে স্তব্ধ করেছিল। সে স্তব্ধতা একটু একটু করে ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্রমে শোক পবিত্র ক্রোধের রূপ নিচ্ছে। মানুষের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠছে। মুখের পেশী শক্ত হয়ে চোখ জ্বল জ্বল করছে। পার্টির ডাকে আজ সন্ধ্যায় প্রতিবাদ সভা, প্রতিরোধ মিছিল।

এরি মধ্যে গ্রামাঞ্চলে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিক থেকে কৃষকসমিতির সংগঠিত মিছিল আসছে। ক্ষেতমজুর সমিতির নেতৃত্বে আসছে কৃষিমজুরেরা। তারা এসে এই অঞ্চলের শ্রমিকমিছিলের সঙ্গে মিলিত হবে। তার সঙ্গে মিশবে ছাত্র ও যুবসংগঠন। সামনে থাকবে উদ্যত বর্শাফলক হাতে পার্টির স্বেচ্ছাবাহিনী। সবাই মিলেমিশে এই শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে অবস্থা কি দাঁড়াবে বলা যাচ্ছে না। তমাল ওদের প্রিয় কমরেড্। খুব কাছের, খুব ভালবাসার মানুষ। তার হত্যাকারীকে ওরা হয়ত ছেড়ে দেবে না। হয়ত থানা-পুলিশের উপর আক্রমণ হানবে। হয়ত আরো ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবে। আজ, একটুপরে সম্মিলিত জনতার রুদ্ররোষের এই অট্টতরঙ্গ রোধ করবে কে? কোন্ মণিশঙ্কর? কোন্ পুলিশ? কোন্ সি. আর. পি.?

আশোককে দেখতে পাচ্ছি না। শ্মশান থেকে একসঙ্গেই তো ফিরেছিলাম। তারপর কোনদিকে গেল? ওকে নিয়ে বড় দুর্ভাবনা। সাংগঠনিক শক্তি আছে কিন্তু স্থৈর্যের একটু অভাব। বিশেষ করে কাল থেকে ও এমন ভয়ঙ্কর বোবা হয়ে আছে যে দুশ্চিন্তা আরো বেশী হচ্ছে। এই নির্মম মৌনতা ভেঙ্গে ও যখন ফেটে পড়বে তখন কি রূপ নেবে বুঝতে পারছি না।....এই যে কমরেড্, অশোককে একবার ডাকুন। বলুন, আমি ডাকছি—

একটুআগে সদাশিব-ডাক্তার খবর পাঠিয়েছেন, আজকের শোক-সভায় তমাল-সম্পর্কে কিছু বলবেন। সকালে তিনি বোধহয় শ্মশানে গিয়েছিলেন। তাঁকে যেন ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমি এতে আশ্চর্য হচ্ছি না। ছেষট্টি সালের খাদ্য-আন্দোলনের পর থেকে তিনি আমাদের কাছাকাছি সরে আসছিলেন। আর কখনো মণিশঙ্করদের হয়ে ভোট করেননি। আকারে-ইঙ্গিতেও সমর্থন জানাননি। বরং নানারকম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন। আমাদের কাগজেপত্রে সই দিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তনে আমি বা তমাল অবাক হইনি। সম্ভবত অশোক হয়েছিল। কেননা ডাক্তারবাবুর পরস্পরবিরোধী ঝোঁকগুলো ও সহ্য করতে পারত না। সুবিধাবাদী ভণ্ড বলে মন্তব্য করত। আসলে অশোক একটু অসহিষ্ণুও। এক রক্তের হ'লেও তমালের সঙ্গে ওর অনেক তফাৎ। তমালের গভীরতা এখনও ও পায় নি।

সেই কাল থেকে তমালের কথা একটু ভাবতে চাইছি। কিন্তু সময় নেই। মনটাও অশান্ত, অস্থির। মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটা ঝিম-ধরা ভাব। বুকের ডানদিকে ব্যথা।

ক্লান্তি? না, কমরেড্, ক্লান্তি নয়। ষাটের কাছাকাছি বয়স আমার, এখনও তমাল আমার সঙ্গে সমানতালে হাঁটতে পারত না। রোদে রোদে একদুপুর ঘুরলে মুখ শুকিয়ে উঠত। আমি এখনও একটানা বারোঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে দশখানা গ্রাম ঘুরে আসতে পারি—তমাল দু'ঘণ্টা চালিয়েই চা খেতে চায়। অথচ তমাল আর অশোক, বলতে গেলে, আমার ছেলেরই বয়সী। আমি অকৃতদার। দুইভাইকে পার্টিঅফিসে রেখে আজ একযুগেরও উপর হাতেকলমে মানুষ করেছি। ছেলের মত ভালবেসে একটু একটু করে বড় করে তুলেছি—

না, কমরেড। দুঃখ কিসের! দুঃখ কেন!

কমিউনিস্টরা নিহতের জন্য শোক করে না। শোককে শত্রুর প্রতি

ঘৃণায় পরিবর্তিত করে। তারপর ঘৃণাকে ক্রোধের পাথরে শান দিয়ে আক্রমণের শাণিত অস্ত্র করে। সেই অস্ত্র তোলা থাকে তূণীরে। সময় ও সুযোগ এলেই অব্যর্থ লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। আমূল বিদ্ধ করে শত্রুকে।

না কমরেড, এখন আমাদের শোকের সময় নয়। শোক বড় নরম, বড় কোমল। এই কোমলতার আস্বাদ নেব পরে, আরো পরে। যেদিন শ্রেণীশত্রুর সমস্ত দুর্গ ধূলিশায়ী হবে, যেদিন ওদের নিহত শরীর চিতায় তোলার জন্য একটা লোকও অবশিষ্ট থাকবে না—সেদিন নিভৃতে নির্জনে আমরা আমাদের প্রিয়পরিজনের জন্য চোখের জলের দরজা খুলে দেব। তাদের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলব। এখন যে-হাতে অস্ত্র ধরার কথা সে-হাত যদি চোখের জল মুছতে ব্যস্ত থাকে তাহ'লে লড়াই হবে কি দিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোমলতার স্থান নেই—কেননা কোমলতা বড় বেহিসেবি, সে ভুল করে শত্রুকেও ক্ষমা করতে বলে।

আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, গোপন-অন্ধকারে কমিউনিস্টদের হত্যার ঘটনা—এই তো প্রথম নয়। এ তো বহু পুরনো খেলা, পুরনো ইতিহাস। দেশে দেশে কতবার ঘাতকবাহিনী নামানো হয়েছে রাস্তায়—কখনো তারা সরাসরি শোষকশ্রেণীর হয়ে, কখনো বা শোধনবাদ অতি-বিপ্লবীয়ানার মুখোশ পরে কমিউনিস্টদের হত্যার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। একদিন স্বয়ং লেনিনকেও তো ওরা খুন করতে চেয়েছিল!

এই অঞ্চলেও এমন অনেক হয়েছে। আমার দীর্ঘ পার্টিজীবনের অভিজ্ঞতা বহু হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী। সেসব ঘটনার স্মৃতি আমাদের প্রতিমুহূর্তে আরো সতর্ক, আরো সংগ্রামী করে। আক্রমণ ও হত্যায় আমরা ভীত হই না, নির্ভয় হই। শহীদের রক্ত যে ব্যর্থ হয় না, এ সত্য আমাদের মত আর কে জানে? কে বিশ্বাস করে? সেই রক্ত থেকেই তো আমরা শোষণমুক্তির প্রতিজ্ঞা নিই।

আমার দাদার কথা থাক। গ্রামের শিবু মণ্ডল, তিনকড়ি মণ্ডল,

পরাণ মাঝির কথাও থাক। তাদের রক্ত চব্বিশপরগণার মাটি উর্বর করেছে। আমি ভুললেও জেলার গরীবচাষী, ক্ষেতমজুরেরা তাদের কথা চিরদিন মনে রাখবে। আমি বলছি তমালের মা-বাবার কথা।.... কত সাল সেটা? '৪৫ না '৪৬? ঠিক মনে করতে পারছি না। না, স্মৃতি-দুর্বলতার জন্য না। বোধহয় মনটা সামান্য বিচলিত। তাই হিসাবে কেমন গোলমাল হচ্ছে। যুক্ত-বাংলায় তেভাগা-আন্দোলন তখন। জমি আর ফসলের ভাগ নিয়ে মরণপণ লড়াই—

কি বলছেন কমরেড্? আমাদের রিপোর্টার এসেছে? বলুন, আপনারাই বলুন গুছিয়ে। হ্যাঁ, মণিশঙ্করদের নাম করেই বলুন। ওরাই হত্যাকারী। কিছু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আরো সংগ্রহ করব।.... তমালের মা-বাবার কথাও বলবেন কমরেড্। তাদেরও তো খুন করা হয়েছিল। হ্যাঁ, নামে আলাদা হ'লে কি হয়, হত্যাকারীদের শ্রেণী তো একই। আপনি তো সব জানেন, একটু গুছিয়ে বলবেন—

চব্বিশপরগণার কাকদ্বীপ, সন্দেশখালি, চন্দনপিঁড়ি।

কলকাতায় চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হিন্দু আর মুসলমান রক্তের অপচয়ে বৃথাই শক্তিক্ষয় করছে। সন্দেহ অবিশ্বাস কুটিলতার বিষবাষ্প ফেণিয়ে উঠেছে নগর-সভ্যতায়। মরছে সাধারণ দরিদ্র মানুষ। মজা দেখছে শ্রেণীশত্রু শোষণকারীর দল। দাঙ্গা আরো দীর্ঘস্থায়ী করা যায় কিনা গোপনে তার ফন্দি আঁটছে। সমস্ত কলকাতা নিহতের রক্তস্রোত, আহতের আর্তনাদে ভরে উঠেছে।

তারই পাশাপাশি দক্ষিণের সুন্দরবনে সমুদ্রের ঢেউ-ছোঁয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, খেতে-খামারে চলছে রাতদিন আশ্চর্য লড়াই। গরীবকৃষক খেতমজুরের ভাগের লড়াই, মজুরির লড়াই। সেখানে হিন্দু-মুসলমান

পাশাপাশি গা ঘেঁষে কৃষকসমিতির লালনিশানের তলায় একসুরে শপথ নিচ্ছে, 'জান দেব, ধান ছাড়ব না।'

সেই মজুরি-বৃদ্ধি আর তে-ভাগার ডাক গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সংঘবদ্ধ কৃষকবাহিনীর হাতে উঠেছে ধারালো অস্ত্র। চোখে মুখে ফুটেছে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। অত্যাচার আক্রমণের মুখেও এগিয়ে চলেছে সংগ্রাম। গ্রামে গ্রামে শোষণের নিরাপদ প্রাসাদের ভিৎ টলে উঠেছে। কাঁপছে জমিদার আর তার ভাড়াটে গুণ্ডার দল। কাঁপছে গ্রামের সুদখোর মহাজন আর মোল্লা-পুরোহিতেরা।

কলকাতা থেকে স্থল ও জলপথে পুলিশবাহিনী ছুটে আসছে সাহায্যের জন্য। জমিদারের কাছারি-বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছে। তারপর মদে-মাংসে তুষ্ট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কৃষক-মিছিলের উপর। জমিদারের হাতের বন্দুকও তখন গর্জে উঠেছে। পোষা গুণ্ডারা লুপ্তসাহস ফিরে পেয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। ওদের লাঠি-গুলিতে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত একমাটিতে একসঙ্গে ঝরে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-সমিতির প্রতিরোধও তীব্র হয়েছে। আক্রমণের পাশাপাশি প্রতিআক্রমণ শুরু করেছে ওরা। গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলেছে লড়াইয়ের দুর্গ। জমিদারের কাছারি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে লাঠি আর বন্দুক। রক্তের ঋণ রক্ত দিয়ে শোধ করতে চেয়েছে। প্রবল প্রতিরোধের সামনে রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে বেড়মজুর থেকে পালিয়ে গেছে বৃটিশপুলিশের মোটর লঞ্চ!

তমালের বাবা কৃষক ছিল না। খেতমজুরও না।

বাস্তুভিটাটুকু ছাড়া এককাঠা জমিও অবশিষ্ট ছিল না তার। কলকাতা থেকে কম্পাউণ্ডারি শিখে গিয়েছিল। গ্রামে বসে ডাক্তারি করত। নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে পয়সাওলা বাবুরা ডাকত না। জীবিকার তাগিদে গ্রামের ভাগচাষী আর খেতমজুরদের উপর নির্ভর করতে হ'ত। অসুখে-বিসুখে ওরাই আসত তার কাছে। বাড়ীতে

ডেকে নিয়ে যেত। দু'চারগণ্ডা পয়সার সঙ্গে কিছু ধান বা আলু-বেগুন-কুমড়োর ফালি দিত। তাই দিয়ে টেনেটুনে সংসার চলত। গ্রামে তেভাগা-আন্দোলনের জোয়ার ঢেউ তুলতে জমিদারবাড়ী থেকে হুকুম এল, 'ওই ছোটলোকদের অষুদপত্তর দিতে পারবে না তুমি। একবড়ি কুইনাইনও না!'

তমালের বাবা বলল, 'তা কেমন করে হয়? ওরাই তো আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাবুরা তো কখনো ডাকেন না!'

জমিদারের লোক বলল, 'হুকুম না মানলে বাবুরা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না। বুঝে দেখো!'

তমালের বাবা মুখ কালো করে বলল, 'আচ্ছা, দেখব।'

গ্রাম জুড়ে আন্দোলন যত তীব্র হ'ল—জমিদারদের অত্যাচার ততই বীভৎস হ'ল। ভাড়াটে লাঠিয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল বন্দুকধারী পুলিশ। রবিরাম, রতিরাম, অহল্যা, বাতাসীদের রক্তে চব্বিশপরগণার ধানমাঠ সিক্ত হ'ল।

জমিদারবাবুরা সন্দেহ করল, গ্রামের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তমালের বাবার যোগ আছে। তা না হ'লে নিষেধ অমান্য করে ওদের পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে কেন সে? গভীর রাত পর্যন্ত কেন থাকবে খেত মজুরদের ঘরে? ওদের পাণ্ডা শিবরাম-হলধরের সঙ্গেই বা এত মাখামাখি কেন ওর? লোকটা কিছুদিন কলকাতায় ছিল। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তখন হয়ত কিছু যোগাযোগ ঘটেছে। এখন হয়ত গোপনে গোপনে আন্দোলনকারীদের খবরাখবর যুগিয়ে যাচ্ছে।

সে সময় এই সন্দেহটুকুই যথেষ্ট।

একদিন জমিদারের লাঠিয়াল এসে প্রকাশ্য দিবালোকে মাথার খুলি চারভাগ করে ফাটিয়ে দিয়ে গেল। তমালের মা গিয়েছিল বাধা দিতে। একজনের হাতও বুঝি কামড়ে ধরেছিল। লাঠি পড়ল তার মাথাতেও। রুক্ষ চুলের রাশ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আর একবার আঘাত পড়তেই তমালের বাবার পাশে লুটিয়ে পড়ল। আর উঠল না।

সে দৃশ্য তমাল দেখেনি। সে তখন দেড়ক্রোশ দূরের স্কুলে পাঠ মুখস্থ করছে। অশোক দেখেছিল। কিন্তু সে তখন শিশুমাত্র। ছয় সাত বছর বয়স। সে কি কিছু বুঝেছিল ?

অথবা অনেক কিছুই বুঝেছিল হয়ত। এখন সজ্ঞানে মনে করতে পারে না। কিন্তু মনের গভীরে যে মন সেই অবচেতনে নিষ্ঠুর হত্যার দৃশ্যটি জ্বল জ্বল করে। মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়, মোচড় দেয়, ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়।

সেই নির্জ্জান মনের অসম্ভব তাড়নাতেই অশোক বোধহয় এমন অসহিষ্ণু, এমন বেপরোয়া, মারমুখী। আমি অনেকদিন লক্ষ্য করেছি—পার্টির কাগজে কোনো হত্যার সংবাদ বা নিহতের ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ জ্বলে ওঠে, চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। হাতের মুঠো পাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আবিষ্টের মত বিড় বিড় করে ও যেন কি বলতে চায়। চেঁচিয়ে না ডাকলে এ সময় ওর সাড়াই পাওয়া যায় না।

অথচ এসব ক্ষেত্রে তমালের ভাব অন্যরকম। ওর চোখ মুখ জ্বলে ওঠে না, পাথরের মত শক্ত হয়। এমন নিরেট নিভাঁজ শক্ত, মনে হয়, ধারালো ছুরি দিয়েও বুঝি কাটা যাবে না। অল্পকাল চুপচাপ বসে থেকে সংগঠনের কাজে বেরিয়ে পড়ে ও। মধ্যবিত্তপাড়ায় যাওয়ার চেয়ে এইসময় কৃষকদের মাঝখানে ছুটে যেতে ভালবাসে। দু'চার দিন গ্রামে কাটিয়ে আবার ফিরে আসে।

তমালের সঙ্গে অশোকের যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, আমার ধারণা, তার মূল ওই হত্যাকাণ্ডটি দেখা ও না-দেখার মধ্যে নিহিত। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শনই অশোককে এমন উগ্র করেছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মনোযোগী ছাত্র হয়েও এই উগ্রতাকে অনেকদিন কাটিয়ে উঠতে পারেনি অশোক। মাঝে মাঝে আগুনের মত তা জ্বলে উঠতে চায়। যেখানে বহ্ন্যুৎসবের প্রয়োজন নেই সেখানেও মশাল বাড়িয়ে ধরে। সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা না করে অসম্ভব ঝুঁকি

নিয়ে পাল্টা আক্রমণ হানতে চায়, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একাকী ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

ওর এই মানসিক অভিপ্রায়গুলো নকশালবাড়ী-আন্দোলনের কিছু পরে তমাল ও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন পার্টিতে এই ব্যাপারটা একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু তরুণ কমরেড, তারা প্রধানত কলেজের ছাত্র, তাদের কাছে নকশালবাড়ী-খড়িবাড়ীর সীমাবদ্ধ জমিদখলের আন্দোলন অসাধারণ বৈপ্লবিক তাৎপর্য লাভ করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বাদ দিয়ে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার রোমাঞ্চকর পরিকল্পনার কথা ইতস্তত শোনা যাচ্ছে। ট্রেড-ইউনিয়ন-ফ্রণ্ট ও কৃষকফ্রণ্টের ভূমিকা উপেক্ষা করে অস্ত্র সংগ্রহের দ্বারা ঝটিতি মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার আহ্বান কিছু মধ্যবিত্তের রক্তে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। দেয়ালে দেয়ালে রাইফেলের ছবি আঁকা হয়েছে। তার সঙ্গে কমরেড্ মাও সে তুঙের বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে।

বিপ্লবের এই সহজ ও সরলীকৃত পথ আমাদের পার্টি গ্রহণ করেনি। বরং অতিবামপন্থী-বিচ্যুতির এই ঝোঁককে গোড়া থেকেই অস্বীকার করেছে। ফলে পার্টির মধ্যে আরেকবার ভাঙন আসন্ন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া আছেই। কিছুদিনের মধ্যে অশোকের চরিত্রে তা লক্ষ্য করলাম। ও যেন একটু বেশী অস্থির, বেশী ছটফটে হয়ে উঠেছে। মনের আগুন চাপা থাকছে না, সারাক্ষণ চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাকে কিছু বলে না। কিন্তু প্রায়ই শুনি, তমালের সঙ্গে নতুন পথটা নিয়ে তর্ক করে। বুঝতে চায়, বোঝাতে চায়। কখনো তমালের কথায় রেগে ওঠে, ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে। আবার কখনো অসম্ভব গম্ভীর হয়ে চুপচাপ থাকে। দু'একদিন কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই বলে না!

একদিন শুনলাম বিছানায় শুয়ে অশোক বলছে, 'আজ কলকাতায় মোহিতবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

তমাল বলছে, 'ও! তা কি বলল?'

'তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'আচ্ছা।'

'কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল পার্টি-লাইন থেকে মোহিতবাবু সরে যাচ্ছেন।'

'আমিও শুনেছি। পার্টি ওর ওপর নজর রেখেছে।'

'কিন্তু দাদা....'

'বল।'

'মোহিতবাবুর কথাগুলো ভাববার মত।'

'যেমন ?'

'আমাদের দেশে এখন চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।'

'বিপ্লবী পরিস্থিতি কাকে বলে ? কোনো একটা গোষ্ঠী বা কিছু ব্যক্তি মনে করলেই কি তা এসে যায় ? আসলে আমাদের দেশে এখন অর্থনৈতিক সংকট দ্রুত রাজনৈতিক সংকটের রূপ নিচ্ছে। প্রচণ্ড আন্দোলন ও স্ববিরোধিতার চাপে শাসকশ্রেণী টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক কৃষকের শক্তি দ্রুত বাড়ছে। আমাদের উচিত সতর্ক-ভাবে এই সংকটকে ব্যবহার করে গণআন্দোলনকে আরো তীব্র, আরো মারমুখী করা। একে 'বিপ্লবী পরিস্থিতি' আখ্যা দিয়ে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াটা নিছক ছেলেমানুষী ছাড়া কিছু নয়।'

'কিন্তু অস্ত্র তো সংগ্রহ করতে হবে ? রাইফেলই তো শক্তির উৎস !'

'কে বলল ? জনগণই শক্তির উৎস। তারাই ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি। রাইফেল হাতিয়ার মাত্র।'

'তাই কি ?'

'হ্যাঁ, তাই। নইলে ছোট্টদেশ ভিয়েৎনাম আমেরিকার বিরুদ্ধে কি করে টিকে আছে ? জয়লাভ করছে ? সে কি শুধু রাইফেলের জোরে ? না সংগঠিত গণশক্তির জোরে ?'

'শুধু সংগঠনে কি হবে ? হাতে অস্ত্র নিশ্চয়ই চাই। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধও শেখা চাই। এটা তুই অস্বীকার করতে পারিস না।'

'করছি না।'

'তাহ'লে? আমরা কি তা করছি?'

'উপযুক্ত সময়েই করা হবে। সময়ের আগে ঝাঁপ দেওয়ার নামই হঠকারিতা। লেনিন তাকেই বলেছেন 'শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা'।'

'সময় আর কবে হবে? বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি পথ আমরা কবে ছাড়ব?'

'তুই নির্বাচন বয়কটের কথা বলছিস্? বিধানসভা, লোকসভার উপর মানুষের মোহ কি ভেঙ্গে গেছে? এগুলো যে সত্যি সত্যি 'শূয়োরের খোঁয়াড়' টু-পার্সেণ্ট লোকও তা বিশ্বাস করে? খোঁজ নিয়ে দেখ—সাধারণমানুষ উল্টোটাই ভাবে। ওদের ভাবনার সঙ্গে তাল রেখেই ওদের রাজনীতি শেখাতে হবে। বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে ঢুকেই পার্লামেণ্টের অসারতা প্রমাণ করতে হবে। এরমধ্যে এ্যাড্‌ভেঞ্চার না থাকতে পারে কিন্তু এটাই বাস্তব পথ—'

'তোরা সারাজীবন ওই কর। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, রাইফেল নিয়ে ছুটে যাই গ্রামের দিকে। একটার পর একটা জোতদার খতম করি।'

'ওটা সন্ত্রাসবাদ, ব্যক্তিগত হত্যারই রকমফের। ও পথ মার্কসবাদ বিরোধী, শেষপর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার হাতই শক্ত করে। তুই লেনিনের 'বামপন্থী কমিউনিজম্—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' পড়িসনি?'

'পড়েছি।'

'এক পা আগে দুই পা পিছে?'

'পড়েছি, পড়েছি।'

'চটে যাচ্ছিস কেন? আরেকবার জগৎদার কাছে বুঝে নিস। এখন চুপ কর। আমার ঘুম পাচ্ছে—'

বুঝতে পারলাম, তমাল পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। অশোকও চুপচাপ। একটুপরে উঠে পড়ল। কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেল। তারপর মনে হ'ল আলমারি খুলে বই বের করছে। সারারাত

আলো জ্বেলে বইটা শেষ করবে। ওর ওইরকমই অভ্যাস। আমি ওকে ডাকলাম না।

কিন্তু ওর মনের এই নতুন ঝোঁক আর তার প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। ইতিমধ্যে কিছু জঙ্গী কর্মী এই উগ্র রাজনীতির নেশায় মেতে আমাদের পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে অথবা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। অশোকও কি সেই বিচ্যুতির মধ্যে পড়বে ?

এই নিয়ে তমালের সঙ্গে কথা বললাম। তমালকেও বেশ চিন্তিত দেখাল। একসময় বলল, 'মধ্যবিত্ত পাড়া থেকে সরিয়ে ওকে গ্রামের কাজ দিন। তাছাড়া আপনি ওকে কিছুদিন কাছে রাখুন। ওর আরো পড়াশুনা দরকার।'

আমারও তাই মনে হ'ল। এরপর থেকে অশোককে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে লাগলাম। গ্রামের কৃষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত করলাম। বামপন্থী-বিচ্যুতি ও তার করুণ-পরিণামের ইতিহাস পড়ালাম। যে-সমস্ত দেশে বিপ্লব হয়েছে তার রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করলাম। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় তাও দেখালাম। সবশেষে নকশালবাড়ী-আন্দোলন ও তার বিচ্যুতির বিষয়ে অশোককে বললাম, 'নকশালবাড়ীর কৃষকদের জমি ও ফসলের আন্দোলন ছিল ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এই আন্দোলনকে অবিবেচক-নেতৃত্ব হঠকারী পথে নিয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্নভাবে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে 'মুক্তি-সংগ্রাম' শুরু হয়ে গেছে ও 'লাল এলাকা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করতে থাকে। যারা এটা করে তারা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করে। এই দেশের কৃষক ও শ্রমিকের রাজনৈতিক-চেতনার স্তর ও সংগঠনশক্তির কোনো মূল্যই দেয় না। এমন কি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলোকে সংশোধনবাদের ছাপ দিয়ে পুরোপুরি বাতিল করে দিতে চায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর সোভিয়েৎ রাশিয়াকে একই চোখে দেখে।

এইসব মূল্যায়ণের কোনোটাই মার্কসবাদসম্মত নয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফলে ওদের ভ্রান্ত পথ শোষকশ্রেণীর হাতই শক্ত করবে এবং ফ্যাসিস্ট আক্রমণের পথ খুলে দেবে। শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে আমাদের উচিত এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আর তার সঙ্গে দৃঢ় মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা। সংগঠনই হ'ল মূল শক্তি, তার অগ্রবাহিনী হ'ল শ্রমিকশ্রেণী— এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না।'

ক্রমে যুক্তির কাছে অশোক পরাস্ত হ'ল। অকপটে স্বীকারও করল সে কথা।

কিন্তু মানুষ তো কতগুলো তত্ত্বের সমষ্টি নয়। বুদ্ধিবৃত্তির উপরে আছে হৃদয়বৃত্তি। আছে তারুণ্যের উন্মাদনা। যৌবনের উষ্ণ রক্ত-চাঞ্চল্য। তার টান বড় প্রবল। তমালের মত সবাই তাকে সংহত করতে পারে না। আমি লক্ষ্য করলাম, সেই টানটা অশোক কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার দিকে ঝোঁকটা ঠিকই আছে।

দ্বিতীয়দফায় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে আমাদের স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে উঠল। হাতে হাতে ওরা বর্শা বল্লম তুলে নিল। সুগঠিত সারিবদ্ধ সৈন্যদলের মত মার্চ করতে শিখল। গ্রামে গ্রামে শুরু হ'ল বেনাম-জমি আর বে-আইনী ভেড়ী দখলের আন্দোলন। প্রতিরোধের মুখে সে আন্দোলন সশস্ত্র হ'ল। আঘাতের মুখে পাল্টা আঘাত হানল। এ আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত জোতদার-হত্যার সন্ত্রাসবাদ নয়, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই। জোতদারের শোষণের যা মাধ্যম সেই জোত-জমি-ভেড়ী দখল করে তাকে হীনবল মুমূর্ষু করে তোলার সংগ্রাম।

এতদিনে অশোকের অবরুদ্ধ বাসনা মুক্তির পথ খুঁজে পেল। নবগঠিত স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে সে ছুটে গেল গ্রামাঞ্চলে। জমিদখল ভেড়িদখল আন্দোলনের সম্মুখভাগে উদ্যত বর্শা হাতে অশোকের সাহসী মুখ সর্বত্র জ্বল জ্বল করতে লাগল।

এখন এই মহকুমার স্বেচ্ছাবাহিনীতে প্রায় দেড় হাজার কর্মী আছে

কিন্তু অশোকের মত এমন ক্ষিপ্র, চতুর, সাহসী যোদ্ধা আর একটিও নেই। আজ এই অঞ্চলের দেয়ালে দেয়ালে বেশ কিছু রাইফেলের ছবি আঁকা হয়েছে কিন্তু অশোক তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

বলুন কমরেড্!

অশোকের খোঁজ পেয়েছেন? কোথায় সে? ফুলতলির শ্রমিক-মিছিল সংগঠিত করছে? একবাল আছে সঙ্গে?

ঠিক আছে কমরেড্। আজ ওর ছুটি নেই। সারাদিন ওকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন। একা থাকলে শোক ওকে ক্ষিপ্ত করবে। সে সুযোগ দেবেন না।

হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসছে আজ। পায়ে হেঁটে আসছে, ট্রেনে আসছে, নৌকায় আসছে। পার্টির সভ্য সমর্থক দরদী মানুষ। তমালকে তারা বহুকাল থেকে চেনে। বহুকাল ধরে ভালবাসে। আজ এসে দেখতে পাবে না। তবু আসছে। আরো আসবে।

কমরেড্, আর একটুপরে এই শহর জনসমুদ্র হবে!

অথচ ক'বছর আগে এই অঞ্চলে সভা ডাকলে পঁচিশজনের বেশী লোক হ'ত না! মণিশঙ্করদের ভয়ে মিছিল বের করতে পারতাম না। দেয়ালে পোস্টারমারার সঙ্গে সঙ্গে ভোলা-গণশারা এসে ছিঁড়ে ফেলত। পার্টিঅফিসের জন্য কেউ ঘরভাড়া দিত না। রাত হ'লে এই শহরে থাকা নিরাপদ ভাবতাম না।

সারাদিন কাজ করে গ্রামে চলে যেতাম। সেখানে কৃষকসমিতির ঘরে রাত কাটাতাম। কোনো কোনো দিন নিতাই বাগ্দীদের পাড়াতে। ওরা আমাকে আশ্রয় দিত, আহারও দিত।

তারপর একটু একটু করে এই অঞ্চল বাড়তে লাগল। দেশভাগের পর সুভাষকলোনীর পত্তন হ'ল। নতুন বাড়িঘর অফিস-কারখানা দেখা দিল। নতুন নতুন রাস্তাঘাট হ'ল। রিক্সা ও বাসের সংখ্যা পঁচিশ-

গুণ বেড়ে গেল। ফুলতলি নোয়াপাড়ায় শ্রমিক-বস্তী গড়ে উঠল। কলেজ হ'ল, হাসপাতাল হ'ল।

আমার পুরনো সহকর্মীদের একজন মারা গেলেন, অন্যজন রাণী-হাটের জোতদারদের আক্রমণে কর্মক্ষমতা হারালেন। সুভাষকলোনী থেকে কিছু নতুন লোক পাওয়া গেল। বাসকর্মীদের মধ্যে থেকে দু'একজনকে পেলাম। কিন্তু আরো কর্মী দরকার। সারাক্ষণের নিষ্ঠাবান কর্মী।

একদিন প্রদেশ-কমিটির গোপালদা বললেন, 'একটি ভাল ছেলে দিচ্ছি। নিয়ে যাও। হোলটাইমার হয়ে কাজ করবে—'

তমালকে দিলেন আমার হাতে।

বছর ষোল-সতেরোর একটি ছিপছিপে ছেলে। কালো রঙ। রুক্ষ চুল। সবে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে।

গোপালদা বললেন, 'ওর ভাইকেও পাবে। ও এখনো স্কুলে পড়ে। পাশ করলে নিয়ে যেও।' গোপালদাই শোনালেন তমালের মা-বাবার কথা। ওদের মৃত্যুর পর পার্টি দায়িত্ব নিয়েছিল। দুইভাই দুই কমরেডের বাড়ীতে বড় হচ্ছে। লেখাপড়া শিখছে। বললেন, 'তমাল যদি কলেজে পড়তে চায়, পড়িও। ওর বাবা আমাদের পার্টিরই লোক ছিলেন। জমিদার মিথ্যে সন্দেহ করে নি।'

আমি তমালকে নিয়ে এলাম।

তার তিনবছর পরে এল অশোক। পার্টিতে আমরা তিনজন সারাক্ষণের কর্মী হ'লাম।

না, কমরেড্!

তমালের কোনো ছবি নেই আমার কাছে।

গ্রুপ্ ফটো?

না, তাও নেই। আপনি হরিপদর সঙ্গে কথা বলুন। ওদের স্কুলে

থাকতে পারে। অথবা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অবিনাশের কাছে দেখুন। ওদের অফিসেও থাকতে পারে। না, শ্মশানে পার্টির তরফ থেকে আমরা কোনো ছবি তুলি নি। অন্য কেউ তুলেছে কিনা ঠিক লক্ষ করি নি। সুব্রত বলতে পারবে—

হিমানীশ, তুমি একবার শিখার কাছে যাও। বলবে, ঠিক পাঁচটায় মহিলাসমিতির মিছিল বেরুবে। হ্যাঁ, বড়রাস্তা দিয়ে কলেজের মাঠে চলে যাবে।

....কিন্তু স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে অশোক কেন ফুলতলি গেল?

ফুলতলিতে মণিশঙ্করের কলকারখানার অধিকাংশ শ্রমিক বাস করে। অশোক ও তমালের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছে তারা। সব ক'টা ইউনিয়ন দখল করেছে। মজুরি বাড়িয়েছে, বোনাস আদায় করেছে। অশোকের কথা ওরা সবাই শোনে। স্বেচ্ছাবাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের নিয়ে মণিশঙ্করের বাড়ী আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে না তো অশোক?

হতে পারে! ওর পক্ষে অসম্ভব কি আছে? আজ ওর শোকই বেশী, ক্রোধটাও সেই অনুপাতে। যে-কোনো মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলতে পারে।

তমাল আর অশোক—ওদের দুই ভাইয়ের ভালবাসার গভীরতা আমার চেয়ে বেশী কে জানে? শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন, দু'টি বালক বড় হয়েছে দুই কমরেডের বাড়ীতে, দুই অচেনা পরিবেশে। আমি ওদের এখানে এনে একত্রিত করেছিলাম।

বাজারের পেছনে পুরনো পার্টিঅফিসের একটা ঘরে মাদুর বিছিয়ে ওরা থাকত। অন্যটায় আমি। গোড়ার দিকে নিজেরাই রান্না করতাম। তারপর কাজের চাপ বাড়তে থাকায় একজন লোক ঠিক করা হ'ল। প্রায়ই সে কামাই দিত। কিন্তু দুঃস্থ আর বিশ্বাসী বলে আমরা তাকে ছাড়াতে পারতাম না। পুলিশের চরগুলো রাস্তাঘাটে ওকে বিরক্ত করত। পার্টিঅফিসে কারা যাওয়া-আসা করে, কি

কথাবার্তা হয়, কোন্‌দিন কোথায় যাই—জানতে চাইত। দোকানে ডেকে চা খাওয়াত, বিড়ি দিত। কিন্তু মুরারী বোকা সেজে বলত, 'আমি চোখে তেমন দেখতে পাইনে আজ্ঞে, কানেও কম শুনি, কি করে কি জানব!'

কোনোদিন বলত, 'উনুনে তরকারি চাপিয়েছিলাম টিকটিকিবাবু, টগবগ টগবগ করে ফুটছিল। শব্দের জন্য ও-ঘরের মিটিনের কথা শুনতে পাই নি আজ্ঞে!'

একদিন তমাল ওর হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলেছিল, 'ওই টিকটিকিগুলোকে দেবে। বলবে, নামের লিস্ট আছে, গিয়ে গ্রেপ্তার কর!'

আসলে ভোলা-গণশাদের নাম ছিল। তমালের এই ছেলেমানুষির জন্য আমি বোধহয় একটু বকেছিলাম। ওর সামনে যে কঠিন দায়িত্ব, কঠিন সংগ্রাম—তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম।

সেই মুরারী একদিন কাজে আসেনি।

অশোক ভাত নামাতে গিয়েছিল। হাঁড়ি উল্টে সমস্তটাই গড়িয়ে পড়ল পায়ে। দেখতে দেখতে ডানপায়ের পাতা টকটকে লাল হয়ে উঠল। আমি আর তমাল গিয়েছিলাম মৌড়ীগ্রাম। সেখানে মণিশঙ্করের জ্ঞাতি, জোতদার-রামশঙ্করের সঙ্গে কৃষকসমিতির একটা গোলমাল চলছে। সকালে রিপোর্ট এসেছে, কৃষকসমিতির বুধন মণ্ডলকে রামশঙ্করের লোক ধরে নিয়ে গেছে। তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় ডাইরী লিখিয়ে আমরা সেই গ্রামে গিয়েছিলাম। একটু আগে ফিরেছি।

শব্দ শুনে জামাটামা না খুলে তমাল ছুটে গেল, 'এ কি করলি? কে তোকে ভাত রাঁধতে বলেছিল?'

আমি দেখলাম অশোক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দগ্ধপায়ের যন্ত্রণা মুখে সামান্য বিকৃতি এনেছে কিন্তু অকৃতকার্যতার ক্ষোভে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে ওর মুখ। ওর স্বভাবটাই এইরকম, কোনো ব্যর্থতাই সহজভাবে

স্বীকার করতে চায় না। রীতিমত অপমান বোধ করে। বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তোদের দেরি দেখে চাপিয়ে দিয়েছিলাম। নামানোর সময়—'

তমাল বলল, 'খিদে পেয়েছিল, হোটেল থেকে খেয়ে এলেই পারতিস!' বলতে বলতে পায়ের উপর ঝুঁকে পড়ল, 'ইস্, অনেকটা পুড়ে গেছে যে? এখনো দাঁড়িয়ে আছিস চুপ করে?'

'কি করব? এম্বুলেন্স ডেকে কলকাতার মেডিক্যাল হসপিটালে ভর্তি হতে যাব?'

তমাল রেগে গিয়ে বলল, 'ইডিয়টটার কথা শুনুন, জগৎদা!'

আমি তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড় দিয়ে অশোকের পা থেকে জল মুছে নিলাম। শিশি থেকে নারকেল তেল ঢেলে পোড়া জায়গাটুকুতে লাগিয়ে দিলাম। তমালকে বললাম, 'আজ রাতটা থাক। কাল সকালে সদাশিববাবুকে একবার দেখাতে হবে।'

কিন্তু পরেরদিন ডাক্তারের কথা বলতে অশোক গ্রাহ্যই করল না! বলল, 'দিব্যি তো হাঁটতে পারছি! বলুন, কোথায় যেতে হবে!'

ওকে ঘরে থাকতে বলে তমালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাল সন্ধ্যার মুখে বুধনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। একটা মাঠের ধারে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। রামশঙ্করের লোকেরা প্রচণ্ড মেরেছে। সারা শরীর ফুলে উঠেছে। কি-একটা কাগজেও সই করিয়ে নিয়েছে। থানা থেকে ছোট দারোগার যাওয়ার কথা। বুধনের মুখ থেকে ডাইরী নেবেন। তারপর আমরা মামলা করব।

মৌড়ীগ্রাম কৃষকসমিতির অফিসে এসে শুনলাম ছোটদারোগা রামশঙ্করের বাড়ীতে পৌঁছে গেছেন। সেখানে খানাপিনা হচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের কাছে এলেন। বুধনের কথা কিছু শোনার আগেই বলে উঠলেন, 'হারামজাদা পয়লানম্বরের চোর! কাল বাবুদের খামারঘরে হাঁসচুরি করতে ঢুকেছিল। বাবুরাই ডাইরী দিয়েছেন ওর নামে।'

তমাল আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি গাঁয়ের গরীব মানুষ-গুলোর মুখ দেখলাম। ছোটদারোগা মাথায় টুপি আঁটতে আঁটতে বললেন, 'এ যাত্রায় ছেড়ে দিলাম। ফের চুরিচামারি করলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

সাইকেল নিয়ে তিনি চলে গেলেন। দেখা গেল তার ক্যারিয়ারে কিসের একটা বস্তার উপর একছড়া কচিডাব দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে।

রাত্রে ফিরে দেখি অশোকের জ্বর এসেছে। সমস্ত পা ফুলে ঢোল। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। দেখে তমালের মুখ শুকিয়ে গেল। খুব করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল সে।

আশ্চর্য সেই দৃষ্টি!

উৎকণ্ঠা উদ্বেগের সঙ্গে গভীর মমতা যেন গলে গলে নামছে। তার সঙ্গে আমার প্রতি তীক্ষ্ণ অভিযোগ। সেই দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করল। মনে হ'ল, আমার কর্তব্যে কোথাও ত্রুটি হয়েছে। আমার উচিত ছিল সকালেই ডাক্তার দেখানো। অন্তত কিছু ওষুধ এনে রাখা। মৌড়ী-গ্রামের ওই মানুষটার জন্য বিচলিত ছিলাম। এদিকে মনোযোগ দিতে পারি নি। অথচ ওরা এখানে, আমার অভিভাবকত্বে, আমার উপর পরম নির্ভরশীলতায় পার্টির কাজে নিযুক্ত আছে।

তাড়াতাড়ি রিক্সা ডেকে আমি অশোককে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

তারপর একদিন ভালও হ'ল।

কিন্তু আমি লক্ষ করলাম, যে ক'দিন সে হাসপাতালে থাকল, কোনো কাজেই তমালের মন বসল না। শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে চাইল না। একটু পরে পরে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিতে লাগল। সামান্য পা-পোড়া থেকে 'টিটেনাস' হয়ে গিয়েছিল অশোকের। জ্বরের উত্তাপে হাত-পা বেঁকে যাচ্ছিল। দিনদুই ভাল করে জ্ঞানও ফেরেনি।

তারপর একটু একটু করে অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। তখন তমাল আবার গ্রামে যেতে শুরু করল। কিন্তু বিকেলের দিকে তাকে

ধরে রাখা যেত না। ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে হাসপাতালে চলে আসত।

একদিন একটা জরুরী মিটিং ফেলে এভাবে চলে আসায় আমি রাগ করলাম। তারপরেরদিন হাসপাতাল থেকে তমালের সাইকেলটা চুরি হয়ে গেল। এ ব্যাপারে ভোলা-গণশাদের হাত ছিল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু পার্টির খুব ক্ষতি হ'ল। আমাদের অবস্থা তখন ভাল ছিল না। চাঁদাপত্র তেমন আদায় হ'ত না। জেলাকমিটির কাছে প্রায়ই হাত পাততে হ'ত। কলকাতার এক কমরেড্ সাইকেলটা দিয়েছিলেন। সেটাও হারিয়ে বসল!

আমি ফিরে এসে তমালকে খুব বকলাম। ও বলল, 'তালা লাগিয়েছিলাম, ভেঙ্গে নিয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'পুরনো তালা, ভাঙ্গা কিছুই না। তোমার উচিত ছিল পার্টিঅফিসে রেখে যাওয়া।'

তমাল বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

আমি বললাম, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি—এ-শহরে আমাদের অনেক শত্রু। সবসময় তারা আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। সব জেনেশুনেও—'

তমাল লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনি ভাববেন না জগৎদা। কলেজে চাঁদা তুলে একমাসের মধ্যেই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড একটা সাইকেল আমি কিনে নেব।'

কিন্তু তাতে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম না। ভাবনা শুধু সাইকেল নিয়ে নয়। তমাল যে-ভাবে পার্টির কাজকর্ম ও মিটিং উপেক্ষা করে হাসপাতালে ছুটে আসছে—এই ব্যাপারটাই বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলল। ওর এসব আচরণের স্নেহমমতাগত মূল্য যা-ই থাক, রাজনৈতিক দৃষ্টিতে একে প্রবল আত্মকেন্দ্রিকতা মনে হ'ল। মনে হ'ল, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা। কারণ, আর দশটা পার্টির মত আমাদের পার্টি উদারনৈতিক নয়। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। সভ্যপদ গ্রহণের

সময় আমরা মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিই। সকল অবস্থায় পার্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উপর স্থান দেবার প্রতিজ্ঞা করি। কঠোর সংগ্রামের রাস্তায় আমাদের যাত্রাপথ চিহ্নিত। নির্মম নিষ্ঠুর দায়িত্ব আমাদের সামনে। আমরা সকলেই সমাজতান্ত্রিক সমাজসৃষ্টির নিষ্ঠাবান সৈনিক।

বিশেষকরে পার্টি-সংগঠনের প্রথম-পর্যায়ে কমরেড্‌দের দায়িত্ব আরো বেশী। এই অঞ্চলে যেমন, চতুর্দিকে মণিশঙ্কর-রামশঙ্করদের প্রভাব অপরিসীম, আক্রমণের জাল বহুবিস্তৃত। এই উদ্ধত ষড়যন্ত্রের মধ্যে পার্টিকে গড়ে তুলতে হচ্ছে। এই অবস্থায় যারা সারাক্ষণের কর্মী, তারা পার্টি-স্বার্থ ছাড়া আর কিছু কি ভাবতে পারে? তমাল ও অশোক যদি এভাবে প্রতিপদক্ষেপে আত্মকেন্দ্রিক স্নেহ-মমতার টানে পার্টির জরুরী কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে থাকে—তাহ'লে এ-শহরে দৃঢ়-মজবুত সংগঠন আমি কাদের নিয়ে গড়ে তুলব?

এই নিয়ে অনেক ভাবতে হ'ল। অনেক চিন্তা করলাম। প্রদেশ-কমিটির গোপালদার সঙ্গেও কথা হ'ল একদিন। সমস্যাটা বুঝে তিনি বললেন, 'একজনকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দাও।'

আমি বললাম, 'কোথায় পাঠাব?'

গোপালদা বললেন, 'বীরভূমে দিয়ে দাও। ওরা লোক চাইছে।'

আমি বললাম, 'ভেবে দেখি। দু'একদিনের মধ্যেই জানাব।'

কিন্তু ফিরে এসে অশোক ও তমালকে পাশাপাশি দেখে কেন জানি না, ওদের বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছে হ'ল না। মনে হ'ল, এটা একধরণের নিষ্ঠুরতা হবে।

সেইদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম, ওরা একসঙ্গে এখানেই থাকবে। এটা একটা পরীক্ষা। আমার সুদীর্ঘ পার্টিজীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতার পরীক্ষা, পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ওদের উত্তীর্ণ হতে হবে।

কলেজ-শিক্ষা এবং পার্টির কাজকর্মের অবসরে আমি ওদের মার্কস-বাদ-লেনিনবাদ পড়াতে লাগলাম। কখনো জরুরী ক্লাস করার জন্য

কলকাতাতেও পাঠালাম। তাত্ত্বিক-শিক্ষার সঙ্গে গ্রামে-শহরে হাতে-কলমে কাজ করার মধ্যে দিয়ে ওরা বড় হতে লাগল। তারপর একদিন সব অনুমান নির্ভুল করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

আজ আমার সন্দেহ নেই, আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবল টান ওরা কাটিয়ে উঠেছে। পার্টিস্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে স্থান দিতে শিখেছে। অশোকের ক্ষেত্রে তার বড় প্রমাণ—আজকের আচরণ! আশ্চর্য গম্ভীর কণ্ঠে স্বেচ্ছাবাহিনী পরিচালনা করে সে শবানুগমন করেছে। সন্ধ্যার মিটিং-মিছিলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার কর্তব্যে কোথাও ত্রুটি নেই। আর তমালের ক্ষেত্রে প্রমাণ? সে প্রমাণ বাইরে থেকে খুঁজতে হবে কেন! সে তো আমি নিজেই—

ফোন্‌টা ধরুন, কমরেড্‌!

বোধ হয় জেলা-অফিস থেকে এসেছে?

হ্যাঁ, বলুন, পুরোপুরি হরতাল চলছে। আর একটুপরেই শোক-মিছিল বেরুবে। সন্ধ্যা সাতটায় শোকসভা।

হ্যাঁ, শ্রমিকেরা তৈরি হচ্ছে, গ্রামের মানুষ ছুটে আসছে, ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি প্রস্তুত।

অবস্থা ভয়ানক রকমের ঠাণ্ডা। সর্বত্র থমথমে স্তব্ধতা। বড় রকমের কোনো ঝড়ের সঙ্কেত বলেই মনে হচ্ছে!

বলুন কমরেড্‌—এইমাত্র খবর পাওয়া গেল সারাশহরে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। বলুন, আরো তিনট্রাক সি-আর-পি এসে গেছে—

হ্যাঁ, শাসকগোষ্ঠী যত কোনঠাসা হচ্ছে ততই মরিয়া হয়ে উঠছে। নির্বোধের মত পুলিশ-মিলিটারি ডেকে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে গণ-আন্দোলনের জোয়ার ঠেকাতে চাইছে। ওরা মার্কসবাদ পড়েনি। পড়লে জানত, ওদের অত্যাচার আমাদের প্রতিরোধ-শক্তি কত বাড়িয়ে দিচ্ছে। জয় কত সুনিশ্চিত করছে।

একা তমালকে খুন করে ওরা কি করবে? পার্টিতে এখন অনেক তমাল তৈরি হয়ে গেছে। তারা সদা-সতর্ক, সদা-প্রস্তুত। তারা যেমন শহীদ হতে শিখেছে, তেমনি শহীদের রক্তঋণ শোধ করতেও। আজ ওরা ভীত কিন্তু আমরা নির্ভয়—

সেই সাতষট্টির নির্বাচনের পর থেকেই মণিশঙ্করেরা বিবর-সন্ধানী। তারপর থেকে এই অঞ্চলে আর একটাও মিটিং ডাকতে পারে নি, একটাও মিছিল বের করতে পারে নি। তারপর থেকে যা কিছু তৎপরতা গোপনে গোপনে, রাত্রির অন্ধকারে। সম্মুখ-যুদ্ধে নামার সাহস নেই, তাই চোরাগুপ্তা আক্রমণ।

এই শহরে তার প্রথম বলি কমরেড্ তমাল রায়।

ক'দিন থেকে এইরকমই কিছু আমি আশঙ্কা করছিলাম। কিছু কিছু রিপোর্ট'ও আসছিল। কলকাতায় গুপ্তহত্যা শুরু হয়ে গেছে। তিনচারজন কমরেড্ মারাও গেছে। এখন সর্বত্র এইরকমই চলবে। বিদেশী গুপ্তচক্রের সঙ্গে দেশীয় খুনীবাহিনী হাত মিলিয়েছে। এ-দেশের মাটি থেকে কমিউনিস্ট উৎখাত করার নিপুন পরিকল্পনা করেছে। এরপর জেলায় জেলায় তা ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামগুলোও বাদ যাবে না।

আমি তমালের জন্য ভাবিত হয়েছিলাম। কেন জানি না, ওর পিঠে গুলির দগদগে দাগটা চোখে পড়লেই দুর্বল হয়ে পড়তাম। তার উপর এই সেদিন তমালকে লক্ষ করেই কালীতলায় ওরা বোমা ছুঁড়েছিল। শোধনবাদীদের প্ররোচনায় দ্বিতীয় ফ্রন্টমন্ত্রীসভা ভেঙে যাওয়ার আগে ছোটখাটো একটা মিটিং হচ্ছিল সেখানে। বোমাটা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তমালের মাথায় লাগলে খুলি উড়ে যেত।

এসব কারণে ওকে একা কোথাও ছেড়ে দিতে মন চাইত না!

কিন্তু ও তো আর ষোলবছরের সেই কিশোর নেই। পরিণত বয়সের সাহসী সংগ্রামী যুবক। এই অঞ্চলের সমস্ত সংগঠন তাকে দাবি করে। কৃষকসমিতির মিটিংগুলোতে তাকে উপস্থিত থাকতে হয়। শ্রমিক-ইউনিয়নের বিজয়উৎসব তাকে না হ'লে চলে না। পার্টি তার

জীবনকে বহুদূর নিয়ে গেছে। নিজের উপর আজ তার নিজেরই কোনো দাবি নেই।

সেই বোমা-ছোঁড়ার ক'দিন পরে আমি তমালকে একদিন বললাম, 'সন্ধ্যা হয়ে গেলে তুমি একা কোথাও বেরিও না।'

তমাল আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন, জগৎদা ?'

আমি বললাম, 'মনে হয়, তোমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে।'

তমাল হাসল, 'এ আর নতুন কি! দেশে-বিদেশে পার্টি জন্ম নেবার পর থেকেই তো এই চক্রান্ত চলছে।'

আমি বললাম, 'কলকাতায় আমাদের দু'জন কমরেড্ ছুরি-বোমায় আহত হয়েছে। তার মধ্যে একজন মারাও গেছে !'

'এ-ও সেই পুরনো ইতিহাস, জগৎদা !'

'না তমাল, আমি সাধারণভাবে বলছি না, বিশেষ করে বলছি এবং তোমার কথাই বলছি।'

'কেন ?'

'তোমার জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের পার্টির স্বার্থেই।'

'শুধু আমার ?'

'অশোকেরও।'

'আর সুব্রত, হিমানীশ, অলক, শিখা ? অথবা একবাল, বৃন্দাবন, সুকুমার ?' খুব শান্ত স্থিরতার সঙ্গে হাসল তমাল। নরম গলায় বলল, 'আসলে আমাকে আর অশোককে আপনি খুব ভালবাসেন, জগৎদা।'

শোনামাত্র আমি চমকে উঠলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তমালের দিকে। ও তখনও হাসছে; আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। যেন নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে গেলাম। আমার গভীর গোপন কোনো দুর্বলতার স্থানে যেন বড় সূক্ষ্ম বড় নির্মমভাবে আঘাত করল তমাল। নিজের মনের দিকে তাকালাম। সেখানে অতিশয় নরম কোমল অনুভূতির দর্পণে পিতৃমাতৃহীন দুটি কিশোরের শুষ্ক শ্যামবর্ণ মুখ চকিতে ভেসে উঠল। দীর্ঘ ষোলবছর আগে আমিই

ওদের এখানে এনেছিলাম। তারপর স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে কর্তব্যে দীক্ষা দিয়ে একটু একটু করে বড় করেছি। অনেক ঝড়ঝাপটা আঘাতের মধ্য থেকে প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, সুখে-দুঃখে-আনন্দে-বেদনায় তারা আমার দীর্ঘকালের সঙ্গী। আমার বন্ধু, আমার কমরেড্। আমি আজ বৃদ্ধ। কিন্তু ওরা কিশোর থেকে পরিণত যুবক—সাহসে সংগ্রামে প্রাণবন্ত, ভয়হীন নিষ্ঠাবান সৈনিক।

দীর্ঘকাল পরে ওদের উপর আমার স্নেহ কি বন্ধন হয়ে উঠল? আমি কি পার্টিস্বার্থ সঙ্কুচিত করে দুইভাইকে আজ কাছে টেনে রাখতে চাইছি? ওদের জীবনের মূল্য আমার ব্যক্তি-স্নেহের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করতে চাইছি? এরজন্যই কি দুইভাইকে আমি একদিন বিচ্ছিন্ন করতে চাইনি? বয়সের সুযোগ নিয়ে সেই দুর্বলতা আজ বুঝি আমাকেই গ্রাস করল!

আত্মসমালোচনায় আমি দোষ স্বীকার করলাম। তমালের কাছে আমার হার হ'ল। কিন্তু এ হার বড় গৌরবের। বড় আনন্দের। বললাম, 'হ্যাঁ, কমরেড্। আমাদের সুন্দর একটি হৃদয় থাকা উচিত কিন্তু হৃদয়ের দুর্বলতা কখনোই নয়। এইজন্যই অশোকের কাছ থেকে আমি তোমাকে একদিন সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম।....আমি বলছি, তোমরা যারা নেতৃস্থানীয়—তারা সবাই সতর্ক থাকবে, সজাগ থাকবে। শত্রু এখন কোণঠাসা, মরিয়া, যে-কোনো সময় আক্রমণ হানতে পারে—'

বলুন কমরেড্! খবর বলুন!

মৌড়ীগ্রাম-রাণীহাট-চাঁপাডাঙার কৃষকমিছিলগুলো শহরে ঢুকে পড়েছে—

আপনি বলুন, কমরেড্‌!

ছাত্রফেডারেশন, যুবফেডারেশন প্রস্তুত। মহিলা সমিতিও—

আপনি? কমরেড্‌?

উদ্যত বর্শাহাতে ফুলতলি-নোয়াপাড়ার শ্রমিকমিছিল ছুটে আসছে। সঙ্গে অশোকের স্বেচ্ছাবাহিনী—

কমরেড্‌! আর ক'মিনিটের মধ্যে এইশহর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে। এর রাস্তাঘাটে প্রবল রণকোলাহল শুরু হয়ে যাবে। ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা চূর্ণ হবে। উদ্যত রাইফেলের সামনে গড়ে উঠবে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ।

তমালের শোকমিছিল ক্রোধের বহ্নিরূপ নিয়ে দাউ দাউ মশাল হাতে ছুটে আসছে—

পার্টিঅফিসের রেড্‌ফ্ল্যাগটা আনুন!

চলুন, কমরেড, আমরাও বেরিয়ে পড়ি—